পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সাহা প্রবর্ত্তিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

উৎসাহ

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

৫ম বর্ষ।

১৩০৮ অগ্রহায়ণ হইতে ১৩০৯ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত।

সম্পাদক

ভক্তিবিনোদ

উৎসাহপ্রেশ, রাজসাহী।

শ্রীমহিরুদ্দীন সরকার প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা।

বর্ষসূচী।

১৩০৮—১৩০৯।

—০—

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
অনন্ত	শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ	১৭৪
অভিমান	শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মজুমদার	৯৮
অনুতাপ	" দেবকুমার রায় চৌধুরী	১৮৫
অভিসারিকা	" রজনীকান্ত সেন বি-এল্	৯৭
অমরজীবন	" দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	৮৮
আমি—তুমি	" " "	১১৬
আমার ডায়েরি	" রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ	১৮৬
আত্ম সমর্পণ	" মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৯২
আস্তিক ও নাস্তিক মত	" রমদারঞ্জন মিত্র	২৩১
আরতি (সমালোচনা)	" সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ	৩২৯
ইংরাজি শিক্ষিতের হস্তে বঙ্গসাহিত্য…	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ	৩৪৬
উৎসাহের নববর্ষ	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন বি-এল্	১
উৎসাহে সুরেশ	" রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ	২৫
এদিক আর ও দিক	" দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	২০৫
কত কথা	" বিনয়ভূষণ সরকার বি-এ	২১৭
কতস্মৃতি কতদিন কার	" যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ	১৩৮
কৃষ্ণকালী	শ্রীমতী হৈমবতী দেবী	১১
গঞ্জনা	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী	২১৪
গোলাপ কলি	শ্রীমতী কমলিনী দেবী	৫৭
ঘুড়ি	… …	১১০
চাহিনা মরিতে	শ্রীযুক্ত ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫৬
চিনি চম্পা	… …	৪০
চারুশীলা	" যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২১৬

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
জ্যোতিষে বিবর্ত্তনবাদ	শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম, এ, বি-এল	
জন্মোৎসবে	শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ	২০
তুমি	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী	৬
দেববালা	" বিনয়ভূষণ সরকার বি-এ	
দীপালী	" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ	
দ্বিতীয় যুগের নবদ্বীপ	" ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	
দুরাশা	শ্রীমতী সরলাবালা সরকার	৭
নববর্ষের উপহার	শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ সরকার বি-এ	২
পবিত্র সুন্দর	" " "	১৫
পাপ	শ্রীযুক্ত —— বি-এ	১১
পিপাসা	… …	৭
পিপীসা	শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৬
প্রাচীন ভারতে বৈদেশিক বণিক…	শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত	২৩
প্রাচীন ভারতে হিন্দু চিকিৎসক…	" সারদাচরণ সেন	২১
প্রবাস বিদায়	শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ	২৪
প্রবাদ-প্রসঙ্গ	… …	৮৩
মালতী	" কুমুদরঞ্জন মল্লিক	৭
মৃত্যুশয্যায়	" "	২৪
মশ্তান সা	" ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	৩২২
মহাকাল	" রজনীকান্ত সেন বি-এল	২২৫
মাসিক সার সঙ্কলন	… …	২
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা	… …	
মিত্র-কানন	" সুকুমার রায়	৫
মুসলমান প্রভৃতির ভারতাধিকারের হেতু	" রজনীমোহন ঠাকুর	
মেয়েলি বারব্রত	শ্রীমতী হৈমবতী দেবী	২৫১,৩০১
মোগল শাসনকালে ভারতবাসীর অবস্থা	শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত	১২১,১৬০

আলা।

(১/০)

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
…দ	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি-এ	১২৫
…মণীর প্রাণ	শ্রীমতী মৃনালিনী গুপ্তা	২২৮
…লয় ও তাহার সংস্কার…	শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু বি-এ	২৬৮
…জনী (সমালোচনা)	„ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি-এল	৩০৯
…জাবতী	„ দেবকুমার রায় চৌধুরী	২৮৫
…কুল হৃদয়	„ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৭
…র্জন	… …	২৯১
…রী	… …	২৭৩
বংসরের দিন	„ সুরেশচন্দ্র ঘটক এম্, এ	৩২৩
শিশু—নবীনপান্থ	„ „ „	২৬৭
শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব	পণ্ডিত যোগীন্দ্রনাথ ভক্তিরত্ন	৩২৪
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত	শ্রীম— বি-এ	৫৩,৮৪,১১৮
সন্ধ্যা ও প্রভাত	শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	২২২
সহমরণ	… …	১২৭
সুমতির সুমতি	… …	৯৭
সংক্ষিপ্ত সাহিত্য সমালোচনা।		১৭৬,২১০,২৪৮,৩৪৩
সঙ্গ-হারা	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ	৩৪৫
সংযম সামর্থ	„ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	১০৯
হবে কি মিলন	„ প্রেমসুন্দর বসু বি-এ	১২৯
হিন্দু জাতির কামান ব্যবহার	„ রজনীমোহন ঠাকুর	২৩,৯২,১৪৮,১৮২
…দিরের গান	„ রজনীকান্ত সেন বি-এল	৫১
…,নী	পণ্ডিত অনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থ	২৮৬

——*——

পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সাহা প্রবর্ত্তিত ॥

পঞ্চমবর্ষ ॥

অগ্রহায়ণের

উৎসাহ

মাসিক পত্র ও সমালোচন ।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত ॥

উৎসাহ প্রেস, রাজসাহী।

শ্রীমহিরুদ্দীন সরকার প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা ॥

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত

নূতন ভক্তি গ্রন্থ **শ্রীশ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল।** মূল্য ১।৵০ আনা।

(কবিবর হরিচরণ দাস বিরচিত ।)

২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট গুরুদাস বাবুর দোকানে ও

"উৎসাহ" কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

—— • ——

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম :—

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন বি-এল্, শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রজনীমোহন ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ, শ্রীমতী প্রমোদিনী দেবী, শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ, শ্রীমতী মৃণালিনী গুপ্তা ও সম্পাদক।

সূচীপত্র।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।	বিষয়।		পৃষ্ঠা।
উৎসাহের নববর্ষ	...	১	কৃষ্ণকালী	... ...	১৯
মোগল শাসনকালে			সুমতির সুমতি	...	১৭
ভারতবাসীর অবস্থা	...	২	হিন্দুজাতির কামান ব্যবহার		২৩
প্রবাদ-প্রসঙ্গ	...	৭	উৎসাহে সুরেশ	...	২৫
			স্ত্রীকবি-কুঞ্জ	...	৩১

—— • ——

মূল্যপ্রাপ্তি।

৪০২	শ্রীযুক্তা রাণী কুসুমকামিনী দেবী	বলিহার	১॥৵
১৯২	বাবু রজনীমোহন ঠাকুর জমিদার	পাকুড়িয়া	১॥৵
১	" জীবনীনাথ খাঁ "	খাজুরা	১॥৵
২৩০	" প্রমদারঞ্জন লাহিড়ী "	পুঠিয়া	১॥৵
২৫৫	" মোহিনীনাথ শিশি "	জোয়াড়ী	১॥৵
১৪৩	" জ্ঞানদানন্দ সেন বি-এ,	মুর্শিদাবাদ	১॥৵
	" গিরিশচন্দ্র সাহা	বদলগাছী	।৵
৭৩	কবিরাজ সারদাচরণ সেন কবিরত্ন	রাজসাহী	॥৵

ক্রমশঃ।

উৎসাহের নববর্ষ।

অনন্ত কল্লোলাকুল কাল সিন্ধু কূলে
উত্তরিল স্বর্ণ তরি; অব্যাহত-গতি,
অভ্রান্ত-অচল-লক্ষ্য; হের ফুল্ল ফুলে,
তরুণ প্রভাত করে মঙ্গল আরতি,
মধুপ গুঞ্জনে, বন বিহগের গানে,
আরক্ত-অরুণ-দীপে। অজ্ঞাত নগর
হ'তে, দিল সাজাইয়া কেবা সাবধানে,
বিচিত্র বিপুল পণ্য। তারকা নিকর
দিয়া বিধি লিপি লিখি, দিল উড়াইয়া
অপূর্ব্ব পতাকা ওই তরণীর গায়।
সৌম্য ধীর কর্ণধার কহিছে ডাকিয়া,
"সাগর তীর্থের যাত্রী, যাবি যদি আয়",
নবীন "উৎসাহ" ল'য়ে, বুকে বাঁধি' বল;
ভাসাব সোণার তরী চল্ তোরা চল্।

—— • ——

মোগল শাসনকালে ভারতবাসীর অবস্থা।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের পরিচর্য্যাতেই যে দেশ-চলিত ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারক মহাপুরুষগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে দেশ-চলিত ভাষায় রাজপুতনার চারণ গণের হিন্দী গাথা ভিন্ন আর কিছুই রচিত হইয়াছিল না, এবং প্রথম যুগের অধিকাংশ গ্রন্থকারই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কবির ব্যতীত আরও দুইজন অমর কবির আবির্ভাব হইয়াছিল; তাঁহারা উভয়েই বৈষ্ণব ধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন। ইঁহাদের নাম তুলসীদাস ও সুরদাস। চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সকল কলকণ্ঠ গায়ক বঙ্গ দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে মন্ত্র মুগ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রত্যেকেই কৃষ্ণপ্রেমে উৎসৃষ্ট প্রাণ ছিলেন। এই গায়ক কুল মধ্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের আবির্ভাব হইয়াছিল না। তুকারাম ও শ্রীধরই সে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং তাঁহারা উভয়েই বৈষ্ণব ধর্ম্মানুগত ছিলেন।

মোগল বাদশাহগণ প্রজাহিতৈষী শাসন কর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সুশাসন সহজ সাধ্য ছিল না। শাসন সৌকার্য্যার্থ সমগ্র দেশ নানা সুবায় বিভক্ত ছিল। সুবার শাসনকর্ত্তাগণ সুবিধা দেখিলেই স্বাতন্ত্র্য প্রয়াসী হইয়া উঠিতেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক সুবায় স্বাধীনতুল্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তগণের আধিপত্য বদ্ধমূল ছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণ, জাটগণ, শিখগণ এবং ইউরোপীয় বণিকগণ সকলেই স্বাধীনতা প্রয়াসী ছিল। সুতরাং সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র দুরাকাঙ্ক্ষার স্রোত প্রবাহমান ছিল বলিয়া শাসন কার্য্যে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল।

আমরা ইউরোপীয় ভ্রমণকারীগণের সাক্ষ্য হইতে জানিতে পারি যে প্রকৃতি পুঞ্জকে দস্যু ও তস্করের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত ছিল

না। অনেক সময় অত্যাচারী রাজপুরুষগণ প্রজার অর্থ শোষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতেন। পদচ্যুত সৈন্য, ব্যবসায়ী দস্যু ও রাজদ্রোহিগণে দেশ পরিপূর্ণ ছিল। দুর্ব্বলের অর্থ অপহরণ করাই ইহাদের ব্যবসায় ছিল। লোক পীড়া অথবা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে প্রকৃতিপুঞ্জকে রক্ষা করিবার জন্য কি প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না। কিন্তু তৎসম্বন্ধে সুবন্দোবস্তের অভাব ছিল বলিয়াই আমরা অনুমান করি। সিগণর মানুসির প্রদত্ত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে মোগল শাসনকালে অপক্ষপাতি ন্যায় বিচার করিবার ব্যবস্থা ছিল। বিচার প্রণালী সরল ও সহজ ছিল; কোন অভিযোগের মীমাংসায় অতিরিক্ত কাল ক্ষেপণ করা হইত না। পল্লীগ্রামে পঞ্চায়তি প্রথার বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। ইহাতে সুফল, কুফল উভয়ই ফলিত। আইনের দোষে অনেক সময়ে সুশাসনের পথে কণ্টক পড়িত। আইনের ব্যবস্থাগুণে হত্যা অপেক্ষা মদ্যপান অধিক দূষণীয় ছিল। মোসলমান আইনে অপরাধের তিন শ্রেণী ছিল। (১) প্রথম শ্রেণীতে শরীর সম্বন্ধীয় অপরাধ, নরহত্যা এই শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীর অপরাধীকে ফরিয়াদী ইচ্ছা করিলে অর্থ গ্রহণ করিয়া মুক্তিদিতে পারিত। (২) মদ্যপান, ব্যভিচার ও অপহরণ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। প্রথম দুইটি অপরাধ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বিরুদ্ধ বলিয়া তাহাতে আপোসের নিয়ম ছিল না। (৩) তৃতীয় শ্রেণীতে অবশিষ্ট নানা প্রকার অপরাধ স্থান পাইয়াছিল। গর্দ্দভের পৃষ্ঠে পশ্চাৎ দিকে মুখ দিয়া বসিলে আরোহীর যে অপরাধ হইত তাহাও এই শ্রেণীভুক্ত ছিল। কেহ হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইলে,— সে কার্য্য তাহার ইচ্ছাকৃত কি না তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করা হইত না, কিন্তু কি প্রকার অস্ত্র দ্বারা হত্যা কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া অপরাধের গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করা হইত। মোগল আমলে দিল্লীশ্বরগণ খাল খনন ও রাজ পথ নির্ম্মাণ বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন। মোগল শাসনকালে গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রোডটী প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়াই দেশে জনশ্রুতি রহিয়াছে। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে মোগল কৃত রাজপথ ও সেতুর ভগ্নাবশেষ আজ পর্য্যন্তও দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। বের্ণিয়ার সাহেবের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে কৃষি ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্য রাজমহল হইতে

সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত গঙ্গানদীর উভয় পার্শ্বে অসংখ্য কৃত্রিম খাল এবং খালের ধারে জনাকীর্ণ নগর ও পল্লী এবং শস্যশ্যামল ক্ষেত্র বিদ্যমান ছিল।* রাজস্ব সম্বন্ধে মহানুভব আকবর প্রজার হিতজনক ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। হিন্দু রাজত্বকালে ক্ষেত্রের উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ রাজকর স্বরূপ গৃহীত হইত। আকবর তৃতীয়াংশ কর স্বরূপ লইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। অতএব আকবরের আমলে করের হার বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু অন্যদিকে উৎপীড়নের মূল নানা রূপ বাজে কর ও শুল্ক তুলিয়া দিয়া প্রজার হিতসাধন করা হয়। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালেও রাজস্ব সম্বন্ধে আকবর-প্রচলিত প্রথাই স্থিরতর ছিল। আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্বকাল হইতে নানারূপ বিরক্তিজনক কর অবধারিত হইয়া প্রজাপীড়নের সূত্রপাত হইয়াছিল। মোগল শাসনের নানারূপ ত্রুটী সত্ত্বেও ভারতবাসিগণ শস্যশ্যামল ভারতবর্ষে চাষ অথবা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিয়া এক প্রকার সুখেই কাল কর্ত্তন করিত। বিশেষতঃ শাহজাহানের শাসনকালে প্রকৃতিপুঞ্জের ভাগ্যে অভূতপূর্ব্ব শান্তি ও সমৃদ্ধি ঘটিয়াছিল।

মোগল শাসনকালে ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা কিদৃশ ছিল? মোটের উপর তাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল বলিয়াই আমরা অনুমান করি। আমরা এস্থানে আকবরের রাজত্বকালে শ্রমজীবিগণের দৈনিক বেতনের হিসাব প্রদান করিলাম।

সূত্রধর	৵৯ ৩/৫ পাই —	৯ ৩/৫ পাই
রাজ মিস্ত্রী	/৪ ৪/৫ „ —	/২ ২/৫ পাই
বাঁশ কাটক	৯ ৩/৫ „ —	
ঘরামি	/২ ২/৫ „ —	
ভিস্তি	/২ ২/৫ „ —	৯ ৩/৫ পাই

আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে ঐসময়ের প্রধান প্রধান খাদ্য সামগ্রীর

* বাদশাহ নামা পাঠে জানা যায় যে, শাহজাহান বাদশাহের আমলে কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য রাভিনদ হইতে খাল কাটা হইয়াছিল এবং এই খাল কাটার কার্য্য পরিদর্শন জন্য স্বয়ং বাদশাহ লাহোরে গমন করিয়াছিলেন।

মণকরা মূল্যের গড় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

গম	।৯ ৩/৫ পাই	মটরের দাইল	।৯ ৩/৫ পাই
যব	৶২ ২/৫ „	গমের ময়দা (নিকৃষ্ট)	।৵
ভুট্টা	৵৪ ৪/৫ „	মুগের দাইল	।৶২ ২/৫ পাই
সূতী চাউল	॥০	ঘৃত	২॥৵
জিরা (সরু) চাউল	১৲	তৈল	২৲
দুগ্ধ	॥৵০	গুড়	১।৵৪ পাই
পেঁয়াজ	৵২ ৪/৫ পাই	হরিদ্রা	।০
সিলাহাতি কাপড় প্রতি গজ	/০		
কম্বল প্রতিখানা (নিকৃষ্ট)	।০		

একজন ময়দা ভোজী পূর্ণ বয়স্ক শ্রমজীবির সাধারণতঃ যে পরিমাণ মাসিক আহার সামগ্রীর আবশ্যক তাহার একটি হিসাব আমরা এস্থানে প্রদান করিলাম।

জিনিসের নাম		আকবরের সময়ের মূল্য
ময়দা	॥৫	৶৯ পাই
দাইল	/৫	৭ ১/২ „
ঘৃত	/১	৶ ১/২ „
লবণ	/১	২ ৪/৫ „
		।/৭ ৩/৫ পাই

মশলা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র দ্রব্যের মূল্য ধরিয়া আকবরের সময়ে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি মাসিক ছয় আনা ব্যয়ে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। যে পরিবারের জন সংখ্যা পাঁচজনের (নিজে, স্ত্রী ও তিন সন্তান) অধিক ছিল না তাহার ভরণপোষণের জন্য মাসিক পাঁচ সিকা মাত্র খরচ পড়িত। এরূপ পরিবারে একজনমাত্র উপার্জ্জনকারী থাকিলেও কষ্টের কোন কারণ হইত না। কারণ একজন সামান্য শ্রমজীবির (যথা, ভিস্তি) মাসিক আয় ১৸৵০ আনার ন্যূন ছিল না। অতএব সে ব্যক্তি আহার সামগ্রীর মূল্য বাদে কাপড় ও অন্যান্য সাংসারিক খরচ জন্য প্রতিমাসে দশ আনা করিয়া সঞ্চয় করিতে পারিত। তৎকালে দ্রব্যাদি যে রূপ সুলভ ছিল তাহাতে

একজন শ্রমজীবির পক্ষে মাসিক দশ আনা সঞ্চয়ই যথেষ্ট বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

মোগল শাসন সময়ে ভারতীয় শিল্পীকুলের উন্নতির মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইয়াছিল। মোগলের সংস্পর্শে হিন্দুগণ বিলাসপটু হইয়া উঠিয়াছিল এবং এই সময়ে ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্টতর বাণিজ্য বন্ধন সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই দুই কারণে শিল্পীকুলের অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভাস্কো ডিগামা উত্তমাশা অন্তরীপ উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে উপনীত হন। ইহা ভারত ইতিহাসের একটি বিশেষ ঘটনা। এই ঘটনা হইতে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য শতমুখে প্রধাবিত হইয়া শিল্পীকুলকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিল।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে মসলিন ও কালিকো (১) প্রস্তুত হইত; তন্মধ্যে বঙ্গদেশে ও করমণ্ডল উপকূলের উত্তরাংশেই বস্ত্র শিল্পের সমধিক প্রসার ছিল। ঢাকা সুচিক্কণ মসলিন বস্ত্র প্রস্তুতের প্রধান স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। উত্তরসরকার এবং মসলিপত্তনের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ ছিটের কাপড়, কালিকো এবং কিংখাপের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কার্পাস, পশমী ও রেশমী বস্ত্র বয়নে যে সকল শিল্পী নিরত থাকিত তাহাদের অধিকাংশই হিন্দু ছিল। মোগলের অধীনে ইউরোপের বস্ত্র বাণিজ্যের পথ সুপ্রশস্ত হওয়াতে ইহাদের সমৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। একজন মোসলমান ইতিহাসলেখক প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ স্বচ্ছন্দতার এবং তাহাদের রমণীগণের স্বর্ণরৌপ্যালঙ্কারের মনোজ্ঞ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে প্রত্যেক শ্রমজীবির উত্তম শয্যা ও সুদৃশ্য উত্থান ছিল।

সিবাষ্টিন মনিরক নামক একজন পর্য্যটক ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আমরা প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারি। এই সময় বঙ্গদেশ জাত উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রাচ্য দেশের সর্ব্বত্র বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। তিনি বাঙ্গলার তদানীন্তন রাজধানী ঢাকা নগরীকে বহু জনাকীর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উহার জন সংখ্যা দুই লক্ষাধিক ছিল এবং পৃথিবীর সর্ব্বজাতীয়

(১) Stuff made of Cotton, first manufactured at Calicut.

লোক তথায় সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অন্বেষণে উপনীত হইত। তিনি লাহোর হইতে মুলতানে গমন করেন; এই পথের উভয় পার্শ্বস্থ সমগ্রদেশ অমিত ধন ধান্য পূর্ণ এবং নয়নাভিরাম শ্যামল শস্য ক্ষেত্র শোভিত ছিল। পথের উভয় পার্শ্বে বহুসংখ্যক গণ্ডগ্রাম বিদ্যমান ছিল, এই সকল গণ্ডগ্রামে উৎকৃষ্ট পান্থনিবাস মনিরকের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। তিনি সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত ঠাট নগরে একমাস কাল অবস্থান করেন। এই নগর সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিয়া আমরা অবগত হই যে উহা তৎকালে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং উহার চতুঃপার্শ্বে প্রচুর পরিমাণে গোধূম, ধান্য ও কার্পাস জন্মিত। কার্পাস বস্ত্র বয়নে অন্ততঃ দুই সহস্র তাঁত নিযুক্ত থাকিত। এতদ্ব্যতীত রেশমী বস্ত্র এবং রেশমী ফুল ও ঝালরদার উৎকৃষ্ট চর্ম্ম প্রস্তুত হইত।

আগামীবারে সমাপ্য।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

—*—

প্রবাদ-প্রসঙ্গ।

(৩)

ভগবান ভূততাং গত।

(দশচক্রে ভগবান ভূত)

এক রাজার ভগবান শর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ মোসাহেব ছিল। ভগবান রাজাকে এতদূর বশীভূত করিয়াছিল যে, সে যাহা বলিত রাজা ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া তদ্দণ্ডেই তাহা প্রতিপালন করিতেন,— যেন ভগবানই রাজা, প্রকৃত রাজা কেহ নয় অথবা কর্ম্মচারীমাত্র। ক্রমে ক্রমে ভগবানের প্রতাপ এতই বর্দ্ধিত হইল যে, দ্বারোয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া দেওয়ানজি

পর্য্যন্ত এমন কি স্বয়ং রাণীও উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। অতঃপর সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, বৈদ্য রাজসমীপে উপনীত হইয়া জ্ঞাপন করিবে যে, ভগবান সহসা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া কাল কবলে কবলিত হইয়াছে। যুক্তি স্থির করিয়া প্রধান কর্ম্মচারী প্রতিহারী এবং অন্যান্য যাবতীয় রাজ-ভৃত্যকে আজ্ঞাকরিলেন যে, ভগবান যেন রাজপ্রসাদে প্রবেশ করিতে এবং কোন প্রকারে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইতে না পারে। সকলেই ভগবানের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ব্যথিত-ক্লিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং কেহই তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিল না। অনন্তর কয়েকদিবস ভগবানকে দেখিতে না পাইয়া, রাজা তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বৈদ্য এবং অপর সকলে তাঁহাকে ভগবানের মৃত্যুর কথা জানাইয়া শোক প্রকাশ করিল। এদিকে ভগবান রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিবার জন্য প্রত্যহ দুইবেলা দৌবারিকের পাদসংবাহনে প্রবৃত্ত হইল। প্রহরীরাও তাহাকে হাতে পাইয়া তাহার উপর চোক্ ঘুরাইতে এবং সতেজ বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে লাগিল।

যাহা হউক ভগবান রাজদর্শনের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল, একদিন সুযোগও মিলিল। সে শুনিতে পাইল রাজা নগর পরিদর্শনে বহির্গত হইয়াছেন। কিন্তু পথে দাঁড়াইয়া রাজাকে তাহার দুর্দ্দশার কথা বলা সহজ নয় (কারণ রাজানুচরগণ পূর্ব্ব হইতেই তাহাকে দুরান্তরিত করিতে সচেষ্ট ছিল,) বিবেচনা করিয়া ভগবান পথপার্শ্বস্থিত একটি উচ্চ বৃক্ষশিরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাজা তরুমূলে উপনীত হইবামাত্র, ভগবান উচ্চৈঃস্বরে নিজ দুঃখ কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিল। রাজা ভগবানের পুনঃ আবির্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পারিষদগণ রাজাকে বুঝাইল যে, ভগবান মরিয়া ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজাও সেই কৈফিয়তে তুষ্ট হইয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। তখন ভগবান সখেদে বলিতে লাগিল,—

চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যঃ
নসেব্যঃ কেবলং নৃপঃ।
অহো চক্রস্য মাহাত্ম্যাৎ
ভগবান ভূততাং গতঃ॥

হায়! দশে কি না করিতে পারে? বীরশ্রেষ্ঠ অভিমন্যু সপ্তরথীর হাতে

প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। অবশেষে ক্ষুদ্র আমি, আমিও দশচক্রে ভূত হইলাম!

গোদের উপর বিষ ফোড়া।

পর্ব্বতরাজ পুত্র মলয়কেতু চাণক্যের কুটিল নীতিজালে বিভ্রান্ত হইয়া অমাত্য রাক্ষসকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া, একে একে সমস্ত দোষের উল্লেখ পূর্ব্বক যখন বলিলেন,—

তীব্র বিষ সুবিষম, বিষকন্যা করিয়া প্রয়োগ
বিশ্বস্ত পিতায় তুমি করিলে নিধন।
গৌরবের মন্ত্রীপদে, শত্রুসনে দিয়াএবে যোগ
বেচিতেছ আমা-সবে মাংসের মতন॥(১)

তখন রাক্ষস মনে মনে চিন্তা করিল,— একেত মহারাজের অলঙ্কার বিক্রয়, মুদ্রা দান প্রভৃতি অপরাধে দোষী বিবেচিত হইয়াছি, তদুপরি মহারাজের বধের নেতা বলিয়া কুমারের মনে সংস্কার জন্মিয়াছে। এযে দেখি গণ্ডের উপর বিস্ফোট।

তাৎপর্য্য এই যে, গণ্ডই একে যন্ত্রণা দায়ক তাহার উপর বিষফোড়া;— মহা অনিষ্টকর এবং পীড়াদায়ক। সুতরাং আমার দায়ের উপর দায় উপস্থিত।

যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ।

কুরুক্ষেত্র সমরে ভীষ্মদেব বলিয়াছিলেন,—

জয়োস্তু পাণ্ডু পুত্রানাং যেষাং পক্ষেজনার্দ্দনঃ।
যতঃ কৃষ্ণ স্ততোধর্ম্মো যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ॥(২)

পাণ্ডু পুত্রদিগের পক্ষে জনার্দ্দন আছেন, তাঁহাদেরই জয় হউক। কারণ যেখানে কৃষ্ণ সেইখানেই ধর্ম্ম এবং যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয় দেখিতে পাইবে।

(১) মুদ্রা-রাক্ষস। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত।
(২) মহাভারত।

যুদ্ধ যাত্রাকালে কুরু মাতৃপদে প্রণাম করিলে, মাতা আশীর্ব্বাদ করেন যে,—"তোমার শত্রু ক্ষয় প্রাপ্ত হউক।" তদুত্তরে গান্ধারী বলিয়াছিলেন,—

"যতোধর্ম্ম স্ততোজয়।"

যতোকৃষ্ণ স্ততোজয়ঃ।

উক্ত সমর প্রসঙ্গেই সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন,—

যত্রধর্ম্ম দ্যুতিঃ কান্তির্যত্রহ্রী শ্রীস্তথামতিঃ।
যতোধর্ম্ম স্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণ স্ততোজয়ঃ ॥(৩)

যেখানে ধর্ম্ম থাকেন, সেখানেই শোভা, কান্তি, লজ্জা, শ্রী, বুদ্ধি সকলি থাকেন এবং ধর্ম্ম থাকেন বলিয়া কৃষ্ণও তথায় বিরাজ করেন এবং সে হেতুই জয় হইয়া থাকে।

কাঠ পাথরে বিশেষ কি ?

সমান গুণবাচক দুইটি পদার্থের তুলনা করিতে হইলে লোকে বলিয়া থাকে, "কাঠ পাথরে বিশেষ কি ?" এই প্রবাদের সৃষ্টি কর্ত্তা কে তাহা নির্ণয় করা কঠিন, অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন। আমরা নিম্নলিখিত ঘটনাটি পাঠকগণের গোচরীভূত করিতেছি।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ রসসাগরকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল,—"কাঠ পাথরে বিশেষ কি ?"

রসসাগর তাঁহার অসাধারণ বুৎপত্তি বলে উত্তর দিয়াছিলেন,—

রামচন্দ্রের বনবাসকালে তাঁহার পদরেণুস্পর্শে পাষাণিভূতা অহল্যা মানবী হইয়াছিলেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া অনেকেই বিস্মৃত হইয়াছিল। কিয়দ্দিবস পর রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যের নদী অতিক্রম করিবার মানসে এক পারাণির নৌকায় আরোহণ করিলে, মাঝি বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে তাঁহার মুখপানে দৃষ্টিপাত করিয়া সত্বরে বলিয়াছিল,—

মানুষী করণ রেণু রস্তিতে পাদয়োরিতি কথা প্রথীয়সী।
স্খলয়ামি তব পাদপঙ্কজ, নাথ দারুদৃষ দস্তকাভিদা ॥

(৩) মহাভারত।

আমাদের কোন কবি ইহার অনুবাদ করিয়াছেন;—

"আমার চাল না চলো, ঢেঁকি না কুলো
পরের বাড়ী হবিষ্যি।
আমার নাই লক্ষ্মী দীন দুঃখী,
কতক গুলিন শিষ্যি।
তোমার ঠেকলে পা, ঘুচাব না
না (নৌকা) হ'য়ে যাবে মলিষ্যি;
আমি ঘাটে থাকি, বুদ্ধি রাখি,
"কাঠ পাথরে বিশেষ কি ?"

কৃষ্ণকালী।*

শুন সবে পুণ্য ভাবে এক নিবেদন বলি;
যেন মত গোকুলেতে কৃষ্ণ হ'য়েছেন কালী
কিশোরী, প্রেমে মত্ত, শ্যামে তত্ত্ব,
বৃন্দা কহে আসি,
হেন কালে কদম্বতলা বাজলো মোহন বাঁশী।
কিশোরী, আকুল হ'য়ে চল্‌লো ধেয়ে,
কৃষ্ণ দরশনে;
সূর্য্য পূজার, ছল করিয়ে সর্ব্ব সখী সনে।
নটবর, মনোহর

* রাজসাহী "সাহিত্য-সমিতির" প্রথম অধিবেশনে সমিতি-পালাদিক শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল কর্ত্তৃক গঠিত।

বাঁকা কদম তলে,
ব্রজাঙ্গনা মন ভুলাইছে চেয়ে আঁখি ঠারে।
শ্যামকে পেয়ে, আচ্ছা হ'য়ে
দৈব ঘটের দোষ,
যাথান থেকে তত্ত্ব পেয়ে
এলেন আয়ান ঘোষণী
মাকে জিজ্ঞাসিছেন, কোথা গিয়াছেন,
বৃকভানু কুমারী,
কেন গো মাতা কওনা কথা,
মন ক'রেছ ভারি।
জটিলা, বল্‌ছে বাণী, কলঙ্কিনী,
নাই কো কুলের ভয়,
নন্দের বেটা সঙ্গে লেঠা,
সর্ব্ব লোকে কয়।
সেত, রাখাল কানাই, গুণ কিছু নাই,
তাই গিয়াছে ব'লে,
সুর্য্য পূজার ছল করিয়ে আজ গিয়াছে বিহানে।
কালিকা জলকে যায়, দাঁড়িয়ে রয়
কাক্ না করে সাথে,
পায়ের উপর পা থুয়ে মুরলী দেখে হাতে।
বামে নয়ন বাঁকা চূড়া বাঁকা
যেন কালিকা-শশী,
কটি ছড়া পীত ধড়া,
সদাই পড়ে খসি।
ময়ুরের পুচ্ছ উড়ে, ভ্রমর পড়ে,
মধু করে পান,
বাঁশীর স্বরে গান করিয়ে বলে রাধা প্রাণ।
আখায় তুলিয়ে ক্ষীর, কালিকার মন নয়কো স্থির,

চায় অন্য পাণে,
কত বা রাঁধে চুল না বাঁধে
চায় অন্য পাণে॥
জল ফেলিয়ে জলকে যায়,
সেবা কেমন মেয়ে,
কি জল ভরিতে যায় বিধু মুখী চায়
কানে কদম ফুল, চক্ষু ঢুল ঢুল
রমণী ভুলায়।
অলক ছটা অঙ্গে মাখা
গুঞ্জা বাড়ী যায়।
হাতে তার মোহন বাঁশী, ইন্দু হাঁসি,
আঁখি ঢুলু ঢুলু,
নানা জাতি বেশ করেছে পরে বন ফুল।
দাদা, কহিব কত সহিব আর তোমার বৌয়ের লীলা,
এ ত্রিজগতের মধ্যে সতী জটিলা।
সতী জটিলা কুটীলমনিতা শুনিতে নারী,
তিন কুল হাসাল দাদা রাধিকা সুন্দরী।
কুলে দিয়ে কালি তিন অঞ্জলি
লাজের মাথা খেয়ে
শ্যামের বামে রাই দাঁড়িয়েছে তুমি দেখ গা যেয়ে।
আয়ান বলে আমার কুলে
রাখ্‌লো যেমন খোঁটা
দেখ্‌বো আচ্ছা, কেমন সাচ্ছা
নন্দ ঘোষের ব্যাটা।
মার্‌বো লড়ীর, গোকুল ছাড়ি,
কাল পালায়ে যাবে
সাদ করেছে নন্দের ব্যাটা মাখন লুটে খাবে।
দিবসে নিত্য এসে বাজায় বাঁশী ঘর নষ্ট করে,

ননী চোরা মহোৎ মারা
পালায় ফিরে ডরে।
কাশীনাথ কিসের তরে, বাঁচাও মোরে;
প্রাণ যায় তো ভাল,
সরম ভরম লাজ লজ্জা সকলি আমার গেল।
আজ গোঠে করছে ঘাটে
গোপির বসন চুরি,
কাল গোকুলে নাগাল পেলে ভাঙ্গবো ভাঁরিভুঁরি।
নাদ্‌না লাঠি হাতে করি বাক্স টানে কাঁধে,
কুটিলা বল্‌ছে দাদা আচ্ছা দাদা,
কৃষ্ণরাধা আচ্ছা প'ল ফাঁদে।
মার মার শব্দ তার কাঁপে কমলিনী,
শ্যামের তরে বিনয় করে
বল্‌ছে বিনোদিনী।
শ্যাম রায় উপায় বল আয়ান আ'ল,
রক্ষা নাহি আর,
মরণ তরণ, অভয় চরণ
তাই করেছি সার।
সহজে দুষ্টপতি শঙ্কা অতি,
প্রাণ কাঁপে তো ডরে,
সম্মুখে হাসি দেখ্‌তে পেলে না জানি কি করে।
কেঁদনা কেঁদনা ওপ্রাণকিশোরী,
তোমার লেগে হব রাধে হব হরের নারী।
তোমার লেগে হব রাধে হব মহেশ্বরী,
আমার হৃদয় রাখ শ্রীরস মঞ্জরী।
তোমায় কে মারিবে, কে ধরিবে
কে দিবে গালি
এই সময় কদম তলায়,

আমি হব কালী।
আয়ান তো কালীর ভক্ত হ'য়ে শক্ত
করিল আসি পূজা,
ফেলে বাঁশী, নিলেন অসি
দেখ্‌ছে বামা ছন্দ,
ভুবন আলো, কর্‌ছে ভালো,
দেখে লাগে ধন্দ।
মোহন চূড়াছিল, মুকুট হ'ল
মুণ্ড মালা গলে
খড়্গ হাতে, খাপর তাতে
রণ জয় জয় করে।
মায়ের সোণার নূপুর পায়ে।
তার কঙ্কন চাঁপকলী কটিতে ঘুঁগুর বাজে,
মায়ের নখের মাঝে আঙ্গুর সাজে
যোড় বিজুলীর ছটা,
নবীন মেঘে চন্দ্রোদয় নক্ষত্রের ঘটা।
বিচিত্র কেশের বেণী ভুজঙ্গিনী,
পড়্‌ছে পদতলে,
অসুর মালা গলায়, জিহ্বা অধিক ঝুলে।
শ্যামচাঁদ হ'লেন কালী, দেখ্‌তে ভালি,
কানে জবা ফুল
গুণ্ গুণ্ রব করিয়ে ফিরে অলি কুল।
শ্যামা মা শমনি তরী, বিপদ হরি,
জয় শিব শঙ্করী,
শমন দূতী আস্‌বে নিতে রাখ্‌বে কেমন করি।
আয়ানি বলে আমি পাপী মূঢ়মতি ত্রাণকরি ত্রিগুণে।
ভবের মাঝে অভয় দিলাম আমি
নিত্য এসে কর্‌বে পূজা জগত জননী।

এতগুলা স্তব করি গেল সর্ব্বজন
যশোদা তত্ত্বপেয়ে এলো ধেয়ে
কেল্ কদম্ব তলে,
দিগম্বরী মহেশ্বরী,
কার ভাবে এখানে।
মা আমার এই নিবেদন রাখ।
দিনে রাত্রে কংশের দূত ফিরে রাত্রি দিনে।
দৃষ্টি কর্য়ে, রক্ষা করে
আমায় দিতে হবে,
তারা নামের গুণ মহিমা এবার বুঝা যাবে।
ভাণ্ডি বনে গো চারণে
কেবা কোথায় রবে
কৃষ্ণ বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার হবে।
ব্রজের রামানন্দ বলে, রাধাকৃষ্ণের নাম নিয়ে যেন মরে।
ব্রজের ধন্য লতা কমল পাতা
ধন্য বৃন্দাবন,
ধন্য ধন্য রাধা কৃষ্ণের নিকুঞ্জে মিলন।

—*—

সুমতির সুমতি।

অল্প বয়সে পিতৃমাতৃ হীন হইয়াছিলাম। ঠাকুর দাদার এক পালিতা বিধবা কন্যা (যিনি সম্বন্ধে আমার পিসিমা) ব্যতীত এই দুঃসময়ে আমাকে সময়মত দুটী অন্নজল দিবার এবং ঘরগৃহস্থালী দেখিবার আর দ্বিতীয় লোক কেহ ছিল না। আমার গৃহস্থালীও যেমন তেমন ছিল না। পিতা সখীন্ ধরণের লোক ছিলেন, যাহা দু চক্ষে দেখিতেন তাহাই ধরে আনিয়া পুরিতেন। অবস্থাও নিতান্ত মন্দ ছিল না। ঠাকুর দাদার আমলে তখনও দেশে সাহেব সুবার এত রেশমকুঠী কলকারখানা ছিল না। তিনি নিজে সূতা কাটিয়া মাথায় বহিয়া হাটে রেশম বেচিয়া স্বীয় অধ্যবসায় বলে লক্ষ্মীর কৃপায় লক্ষপতি হইয়াছিলেন। এখনকার অবস্থা তত ভাল না হক্, যাহা ছিল তাহাতেই দিন কাটিয়া যাইত। বলিতে কি গ্রামে আমাদেরই বুনেদি ঘর। পিশিমার মুখে শুনিয়াছি, যখন বাবা কলিকাতা হইতে আমাদের ঐ বড় ঘড়িটা ক্রয় করিয়া লইয়া আসেন (বলা বাহুল্য ইহাই আমাদের গ্রামের সর্ব্বপ্রথম ঘড়ি), তখন দলে দলে লোক ঘড়ি দেখিবার জন্য আমাদের বাড়ী আসিত। দেখিয়া যাইবার সময় ধর্ম্মের ঘড়ি বলিয়া প্রত্যেকে গড় হইয়া এক একটি প্রণাম করিয়া যাইত। এমনি করিয়া কলিকাতা বাজারের অর্দ্ধেক জিনিষ আমাদের গৃহে শুভাগমন পূর্ব্বক প্রতিবেশী মহলের বিপুল বিস্ময় উৎপাদন ও অত্যন্ত মনাকর্ষণ করিয়াছিল।

করিলে কি হইবে? যত্নাভাবে সেগুলি মাটী হইতেছে। একা পিশিমা কত করিবেন? আর আমি? আমার কথা ছাড়িয়া দাও। বাল্যকাল হইতেই একটি নিদারুণ ব্যাধি আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল,— আমি কবিতা লিখিতে শিখিয়াছিলাম। এই ব্যাধি চির দিনই আমাকে এই সকল গার্হস্থ কর্ত্তব্যে ঔদাসিন্য প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দিয়াছিল। ধর্ম্মঘড়ির দারুময় শ্রীচরণে প্রণত হওয়া অপেক্ষা সেই কমলদলাসীনা বীনাবাহু শুভ্রদেবীর পুণ্যপাদপদ্মে প্রণাম করিতেই সমধিক অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

নিশির নীরব নিথর গাম্ভীর্য্য, শশীর সুবিমল চন্দ্রিমা-সুধা, উষার শীতল শিশির সম্পাত, সান্ধ্য গগণের বিচিত্র নীলিমা, নব প্রস্ফুটিত কুসুম-সৌরভ— আমার অন্তর-রাজ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে নবনব গৃহ রচনা করিয়া তুলিত।

এইরূপে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল,— একরকম সুখেই কাটিয়া গেল। এমন সময় হঠাৎ পিশিমার কাল হইল। নির্জ্জন জীবন নির্জ্জনতর হইতে চলিল। এখন আর শুধু কাব্য লিখিয়া পেট ভরে না। পৃথিবীতে তণ্ডুল নামক দ্রব্য, দ্রবীভূত করিতে যে অসাধারণ গন্ধক্রিয়ার প্রয়োজন সর্ব্বপ্রথম এই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম। কবিতা লিখিবার অপেক্ষা সে ব্যাপার কোন ক্রমে সহজ বলিয়া বোধ হইল না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিবাহকরাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইল। নিজের ঘটকালি নিজে করিয়া কলিকাতার জনৈক আঢ্য মহাজনের ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিলাম;— সে আজ তিন বৎসরের কথা।

(২)

মানুষ এক ভাবিয়া কাজ করে— আর একটা হইয়া পড়ে। সুখের লাগিয়া ঘর বাঁধিলে কি তাহা একা ব্রহ্মাকেই থাইতে হয়? পত্নী সুমতিবালা যখন একডালা রূপ লইয়া আমার আঁধার ঘর আলো করিল তখন মনে করিলাম, এতদিনে যোগ্যবরের যোগ্যলক্ষ্মী মিলিল। কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ! তাই বলিয়া সুমতির যে কোন গুণ ছিল না তাহা নয়। সুমতি রূপবতী যুবতী, বুটবডী মিলন্ধা, কোকিলকণ্ঠা, কারুকার্য্য-কুশলা, নভেলপাঠরতা, বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী ইতি শেষ। এবং আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি কামিনীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহা অপেক্ষা অধিক গুণশালিনী হইবার কোন আবশ্যকতা নাই।

কলিকাতার বধূদিগের গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য কার্য্য যে কি তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু পাড়াগায়ের সকলভদ্রকুলবধূদিগকেও বাসনমাজা, ধানভানা, গোবর গোলা হাঁড়ি ধোওয়া,— সবকাজই করিতে হয়। বিশেষতঃ যাহারা গৃহের একমাত্র গৃহিনী, তাহাদিগকে কোন্ কার্য্য না করিতে হয়? আমার এমনি একটি দশভূজা গৃহিনীর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমার কপালদোষে

সুমতিবালার গোবরাতঙ্ক হইতে চুণখয়েরাতঙ্ক পর্য্যন্ত অনেকগুলি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি ছিল, তাহার ফলে আমার বাড়ী দাসদাসীতে পূর্ণ হইয়া গেল। সুমতির কৃপায় আমার ক্ষুদ্র কুটীরে বরুণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী এমন কি মা ষষ্ঠী প্রভৃতি নানাবিধ দেবদেবী প্রায়শঃই শুভাগমন করিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীকে কেহ কখনো আমার বাড়ীর ত্রিসীমানায় পদার্পণ করিতে দেখেন নাই।

(৩)

সুমতিবালার রূপ ছিল, যৌবন ছিল, বিদ্যা ছিল— একটু গরব না থাকিবে কেন? তাহার ফলে সে প্রথম স্বামীগৃহে আসিয়া কতকগুলি ভুল বুঝিয়াছিল। তাহার বিশ্বাস তাহার স্বামীটি একটি নিরেট গণ্ডমুর্খ, এবং বেচারি স্বীকৃত থাকিলে সে তাহাকে কিছু ইংরাজী ও আধুনিক শিক্ষিত ভদ্রসমাজের উপযোগী যৎকিঞ্চিৎ কর্ত্তাবিহীন বাঙ্গালা শিক্ষাদিতে প্রস্তুত। বিশেষতঃ তাহার ন্যায় শিক্ষিতার হাজব্যাণ্ড যে একটি চতুর্দ্দশী কবিতাও রচনা করিতে অক্ষম ইহা দুঃখের বিষয়। কিন্তু তাহার ছাত্রটী এমনি গর্দ্দভ যে সে কোন দিনই এই শিক্ষয়িত্রী মহাশয়ার শরণাপন্ন হইল না।

সুমতিবালার কবিতা লিখিবার একখানি খাতা ছিল, তাহাতে শুধু ভুল ফুল, হৃদয় নিদয়, অনন্ত বসন্ত প্রভৃতি মিলের ছড়াছড়ি। অধিকাংশ কবিতাই যে রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে সিঁদদিয়া রচনা করিতে হইয়াছে, তাহা বেশ টের পাওয়া যায়। কিন্তু প্রত্যেকটির নিম্নে শ্রীমতী সুমতীবালা দেবীর নাম স্পষ্টাক্ষরে স্বাক্ষরিত রহিয়াছে।

এক একদিন সুমতি তাহার খাতাখানি লইয়া আসিয়া আমাকে শুনাইতে বসিত। মধ্যে মধ্যে দুই একটা কঠিন স্থানের ব্যাখ্যা করিয়া, আমি বুঝিতে পারিয়াছি কি না জিজ্ঞাসা করিত, আমি নিতান্ত ভক্ত শ্রোতার ন্যায়, কান পাতিয়া বিস্মৃত ভাবে সকলগুলি শুনিয়া যাইতাম। কবিতা দ্বারা আমাকে এইরূপে বিস্ময়াভিভূত করিয়া সুমতি আপনার কবিতা রচনা সার্থক মনে করিত। এতদ্ভিন্ন তাহার কবিতার আর সদ্ব্যবহার হইত না। তবে সময় সময় দুইএকটি কবিতা কলিকাতার কোন মাসিকপত্রের কার্য্যালয়ে প্রকাশ জন্য নাকি প্রেরণ করিত,— কিন্তু সেগুলিকে তাহাদের ম্যানাস্কৃপ্ট জন্ম হইতে

দেহান্তরিত হইতে কোন দিন আমি প্রত্যক্ষ করি নাই।

সুমতিবালার এই ভুলবিশ্বাসগুলি আমি কোন দিন ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিতাম না। বরং তাহার এইরূপ অক্ষম স্পর্দ্ধা দেখিয়া আমি বিস্তর আমোদ অনুভব করিতাম।

(৪)

বাড়ীর প্রায় সকলঘরগুলিই সুমতির নিকট অবারিত ছিল,— কেবল একটি ঘরে তাহার বড় একটা প্রবেশাধিকার ছিল না। সেই ঘরটিতে বসিয়া আমি কবিতা লিখিতাম ও অধ্যয়নাদি করিতাম। আপনার কাজ সারিয়া তালাচাবি আঁটিয়া বহির হইতাম। কবিতা লিখিবার সময় হঠাৎ দুই একদিন সুমতি যে ঘরে যাইত না, তাহা নহে। কিন্তু আমি তৎপূর্ব্বেই কম্পিত হস্তে কবিতার খাতা ও আবশ্যকীয় কাগজ পত্রগুলি সরাইয়া ফেলিয়া পার্শ্বস্থিত সোফায় কপট নিদ্রায় এমনি অচেতন হইয়া পড়িতাম, যে সে কোন ক্রমেই আমাকে মা সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিত না।

একদিন অপরাহ্নে ঘরে বসিয়া সেলী হইতে একটি কবিতা অনুবাদ করিতেছি। আজ অনেকগুলি কাজ, একখানি গীতি কবিতাগ্রন্থ প্রেসে দিয়াছিলাম, তাহার প্রুফ আসিয়া টেবিলের উপর পড়িয়া আছে। সেগুলি দেখিয়া অদ্যই ডাকে কলিকাতা পাঠাইতে হইবে। তাড়াতাড়িতে কবিতাটীর অনুবাদেও তত সাফল্য হইতেছে না। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল চাকর ঘরে বাতি দিয়া গেল।

এমন সময় বাহিরে জনৈক বন্ধুর ডাক পড়িল। ব্যস্ততায় কাগজপত্রগুলি গোপন করিবার সময় পাইলাম না। বন্ধুর অনুরোধ রক্ষার্থ তখনই সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইলাম। বাড়িতে ফিরিয়া দেখি আমার সেই ঘরের ভিতর চেয়ারে বসিয়া সুমতি আমার কাগজপত্রগুলি খুব মনোযোগের সহিত নাড়াচাড়া করিতেছে। দেখিয়া ত আমার চক্ষুস্থির! কি করিব?— হঠাৎ ঘরের মধ্যে না গিয়া বাহিরে আত্ম গোপন করিয়া সুমতির কার্য্য দেখিতে লাগিলাম।

সুমতি কিছুই ছাড়ে নাই। আমার অন্নপ্রাশনের কবিতাগুলি শুদ্ধ টানিয়া বাহির করিয়াছে। কোনটার দুই এক লাইন পড়িতেছে আর

টপাটপ্ পাতা উল্টাইতেছে। ড্রয়ারের মধ্যে বাইরন, মিল্টন, সেলি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি মণীষীদিগের গ্রন্থাবলী লুকানছিল,— সেগুলিও তাহার হস্ত হইতে নিস্তার পায় নাই। কি আশ্চর্য্য প্রত্যেক পুস্তকেই তাহার গণ্ডমূর্খ স্বামীর নাম লেখা। সুমতিবালার বিস্ময়ের আর অবধি নাই।

গ্রন্থগুলি নাড়িতে নাড়িতে লেটার পেপারে লিখিত একটি কবিতা দেখিয়া সুমতির মুখ শুকাইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে কাগজখানি তুলিয়া লইয়া কম্পিত হস্তে প্রদীপের নিকট ধরিল। আমি দূর হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে সেটী "সে আমার হ'ল না" ইতি শীর্ষক একটি প্রেম কবিতা। তাহার তলে শ্রীমতী সুমতিবালা দেবী বলিয়া লেখিকার নাম স্বাক্ষর আছে এবং শিরোভাগে বিভিন্ন হস্তাক্ষরে "অমনোনীত" ও তন্নিম্নে সম্পাদক বলিয়া সুমতিবালার স্বামী বেচারির নাম স্বাক্ষর!! সুমতি আরও ধীরে ধীরে আরও কম্পিত হস্তে কবিতাটী প্রদীপের শিখার উপর ধরিল। কাগজখানি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহার পর টেবিল হইতে অমৃতাক্ষর ছন্দে আমার একখানি নব রচিত পৌরাণিক কাব্যের খাতা হাতে লইয়া পড়িতে পড়িতে মৃদুগতিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে রাত্রিতে সুমতি আমার সহিত বাক্যালাপ করিল না। তাহার সেই বিষাদক্লিষ্ট ব্যথিত মুখখানি দেখিয়া আমার বোধ হইল যেন একটি গভীর চিন্তা তাহার সর্ব্ব অন্তঃকরণকে কি এক নবভাবে গঠিত করিয়া তুলিতেছে।

আমি একটু রহস্য করিবার জন্য তাহার তপ্তগণ্ডে একটি চুম্বন করিয়া বলিলাম:—"সুমতি আজ তোমায় ভার ভার দেখিতেছি যে? তোমার হস্‌ব্যাণ্ড বেচারী শারীরিক ভাল আছে তো?" সুমতি আঁধার অধরের কোণে একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া "যাও" বলিয়া নিদ্রিত খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া দুধ খাওয়াইতে বসিল।

খোকাকে দুধ খাওয়ান সুমতির এই সর্ব্বপ্রথম। আমি অবাক্ হইলাম।

(৫)

পরদিন গার্হস্থ্য ব্যাপারে এক অভিনব পরিবর্ত্তন ঘটিল। এক বাসন মাজা ঝি ব্যতীত বামনঠাকুর, ঘরের ঝি, ধাই, চাকর প্রভৃতি সকলকেই সুমতি নিজে জওয়াব দিয়াছে। পাড়ার একটা মুচি ডাকিয়া সুমতি তাহার

'লেডিস্' জোড়া দান করিয়া ফেলিল। বডি, গাউন প্রভৃতি আর খুঁজিয়া পাইলাম না;— বোধ হয় সেগুলি চুল্লির মধ্যে দিয়া আমার জন্য মুগের ডাল রাঁধা হইয়াছে। কেন না সেইদিন আমার সুমতি স্বয়ং অন্নপূর্ণা দেবী।

সেই দিন হইতে সুগতির সুমতি হইল,— সেই দিন হইতে সুমতি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, রন্ধনে দ্রৌপদী, পতিব্রতায় সাবিত্রী,— আর চাই কি? এমন পরিবর্ত্তন কি মানুষের হয়? পাড়ার মেয়েরা কাণাকাণি করিতে লাগিল "বিবিয়াগী, ক্ষেপলো নাকি?" আমার কপালে যে এমন ক্ষেপী মিলিবে তাহা তো স্বপ্নেও ভাবি নাই।

* * * * *

সেবার আমার জন্মদিনে সুমতির সাধ হইল আমাকে একটু ধুমধাম করিয়া খাওয়ায়। সকালে উঠিয়া আয়োজন,— নটার পূর্ব্বেই সাত ব্যঞ্জন ভাত। দ্রৌপদী কি আর গাছে ধরে? দুঃখের বিষয় উষ্ণ তৈলের ছিটা লাগিয়া তাহার বাম মণিবন্ধখানি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। তাহা দেখিয়াও আমার একটু সুখ বোধ হইল। আহারে বসিয়া "সুখতানিটা" ৪।৫ বার চাহিয়া খাইয়া প্রায় নিঃশেষ করিলাম। সুমতি হাতের ফোসায় ফুঁ দিতে দিতে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"সুখতানিটা" কেমন হয়েছে"। উত্তর করিলাম— খুব ভাল। তুমি এমন রান্না শিখ্‌লে কোথেকে তাই ভাব্‌চি। ছেলে বেলায় পিশিমার মুখে শুনিতাম কবি কালীদাসকে যখন ইন্দ্র নিমন্ত্রণ ক'রে স্বর্গে লয়ে গিয়াছিলেন, তখন শচী দেবী নাকি এই 'সুখতানি' কালীদাসকে প্রথম খাওয়ান। কালীদাস সে লোভ ভুলিতে পারিলেন না,— মর্ত্তে ফিরিয়া আসিয়া তাহার বহুল প্রচার করিলেন। তুমি কালীদাসের কেহ হও নাকি?

সুমতিবালা হাসিয়া বলিল,—"হ্যাঁ, আমি কালীদাসের ছেলের মা।"

—*—

হিন্দু জাতির কামান ব্যবহার।

অধিকাংশ সিদ্ধান্তই সর্ব্ববাদী সম্মত রূপে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা নাই সত্য, কিন্তু সমাজ মধ্যে গণ্য, ও সম্মাননীয় ব্যক্তির প্রতিবাদচ্ছলে মত প্রকাশ, বড়ই দুঃসাহসের কাজ। তথাপি কর্ত্তব্যানুরোধে, প্রসিদ্ধ বড় লোকের ধারণার বিরুদ্ধেও, সময় সময় কিছু বলা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। নিজের মন্তব্য যদি সমাজের অহিতকর না হয়, পরন্তু অসত্য দুষ্ট নহে বলিয়া বিশ্বাস থাকে, তবে তাহা সাধারণ্যে প্রচারে হানির আশঙ্কা দেখি না। মূলতঃ উপযুক্ত বিশ্বাস বশেই, বক্ষ্যমান প্রস্তাবের অবতারণা করা গেল।

"মনুষ্য জাতি, অতি আদিম অবস্থায়, লোষ্ট্র, প্রস্তর ইত্যাদি নিক্ষেপ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিত। জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তাহা ক্রম পর্য্যায়ে, প্রথমে প্রস্তরাস্ত্র, তৎপর ব্রঞ্জাস্ত্র, অনন্তর লৌহাস্ত্র, অর্থাৎ কৃপাণ, ধনুঃ শর, গদা, বর্ষা, কুঠার প্রভৃতির নির্ম্মাণ কৌশল শিখিয়াছে, এবং তৎসমুদয়কে যুদ্ধোপকরণ স্বরূপ গণ্য করিয়াছে। এই ভাবে চলিয়া, তারা অতি অল্পদিন হইল, বারুদ চূর্ণকের আবিষ্কার পুরঃসর, অল্পদিন অগ্র পশ্চাৎ ভাবে, বন্দুক ও কামান প্রস্তুতে দক্ষ হইয়াছে; প্রত্যুত সংগ্রাম বিদ্যাকে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সহচর করিয়াছে।" পুরাতত্ত্ব ও সমাজ তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মণ্ডলীর, এইরূপ সিদ্ধান্ত; পক্ষান্তরে এই নির্দ্ধারণের প্রতিকূলে, এপর্য্যন্ত যুক্তিমূলক কোনও প্রতিবাদ উপস্থিত হয় নাই।

যা হ'ক, অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, হিন্দু জাতি দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া সাধিত হয় নাই; এবং আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কার কালও অতি আধুনিক। অপর পক্ষে, কিন্তু আমাদের সম্মান ভাজন কয়েকজন প্রখ্যাত বঙ্গীয় লেখিকা ও লেখক, হিন্দু জাতিকেই, আগ্নেয়াস্ত্রের, বিশেষতঃ কামানের আবিষ্কর্ত্তা প্রমান করিতে বদ্ধ পরিকর। হিন্দু জাতি, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় উন্নতিকর কার্য্যের অগ্রণী এ কথা শুনিতে এ হতভাগ্য অভিশপ্ত বংশধরদের কর্ণে বড়ই মধুর লাগে; এবং তার প্রচারেও যথেষ্ট গৌরব অনুভব করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, ঠিক এই জন্যই

সম্ভবতঃ যোগ্যতম হিন্দু লেখকগণ, হিন্দু পিতৃপুরুষদের কামানের আবিষ্কারক সাব্যস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদের মতবাদের উপর উচ্চ সম্মান জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সত্য নির্ণয়ানুরোধে, বিপরীত মত সমর্থনে বাধ্য হইলাম।

বঙ্গীয় মহিলাকুলরত্ন সম্মাননীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী, তাঁহার প্রণীত "দীপনির্ব্বাণ" নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকায়,— রাজপুত সম্প্রদায়ের কামান পরিচালন সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ নিম্নলিখিতানুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠকবর্গের বোধ সৌকর্য্যার্থ এস্থলে তাহা অবিকল তুলিয়া দিলাম।—"পৃথ্বী রাজের সময়ে, হিন্দুদিগের মধ্যে কামান ব্যবহার যে প্রচলিত ছিল, ইহা অনেকেই কাল্পনিক মনে করিতে পারেন। এবং আমার কোনও আত্মীয়, ইহা নিতান্তই কাল্পনিক মনে করিয়া, ঐ বিষয়ে প্রথমে নানা তর্ক, বিতর্ক করেন। কিন্তু পরে যখন তিনি, প্রমাণ পাইলেন যে, যথার্থই অনেক পুরাকাল হইতে, আমাদের মধ্যে কামান প্রচলিত আছে, তখন তাঁহার সে সন্দেহ দূর হইল এবং পাছে তাঁহার মত অন্যকেহ ইহা কাল্পনিক মনে করেন, সেই আশঙ্কায় তিনি ভূমিকা মধ্যে কামান ব্যবহার বিষয়টি, কিছু বিশেষ রূপে বিবৃত করিয়া লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধেই এইস্থলে কামান সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতে হইল। কোন কোন ইংরেজ ইতিহাসলেখকেরা বলেন যে, বাবরের সময় হইতে এদেশে প্রথম কামান ব্যবহার হয়। তাহার পূর্ব্ব হইতে যে এদেশে কামান প্রচলিত ছিল, তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না। বিশেষতঃ ইউরোপে কিম্বা ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কামান প্রচলিত ছিল না, সুতরাং তাহার শত শত বৎসর পূর্ব্বে যে হিন্দুরা কামান নির্ম্মাণ বা ব্যবহার করিতে জানিত, ইহা বিদেশী মণ্ডলে সহজেই বিশ্বাস হইবার নহে। সাধারণ মত এই যে ১৩৩৬ কিম্বা ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে প্রথম কামান ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের পর ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে ইহা এখন একপ্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, তাহার অগ্রে ১৩১২ খৃষ্টাব্দে প্রথম মুরগণ স্পেনে এক প্রকার কামান ব্যবহার করিয়াছিল। মুরগণ যে আরবদিগের কর্ত্তৃক অস্ত্র বিদ্যায় দীক্ষিত হইয়াছিল, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত এবং অধুনা যেরূপ প্রমাণ

পাওয়া যাইতেছে যে আরবেরা ভারতবর্ষ হ'তে চিকিৎসা বিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, গণিত ও শাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা করিয়া ছিল, তাহাতে বোধ হয় যে, কামান ব্যবহারও তাহারা ভারতবর্ষ হইতে, শিক্ষা করিয়া পরে ইউরোপে প্রচলিত করিয়'ছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীরজনীমোহন ঠাকুর।

উৎসাহে সুরেশ।*

উৎসাহের চতুর্থ বর্ষ সমাপ্ত হইয়াছে। একদিন কোন বিজ্ঞ সমালোচক যাহা দেখিয়া তাচ্ছিল্যের সুরে বলিয়াছিলেন "আমরা এ শুষ্কতৃণদল চাহিনা"— কে তখন জানিত যে সেই ঘৃণিত শুষ্কতৃণই আবার এতকাল বাঁচিয়া থাকিবে! চারিবৎসর— এতকাল বৈকি? বৎসরে কি কালের মাপ হয়— ভাবে ও অভাবেই কালের মাপ। তাই সাহিত্যজগতে উৎসাহের চারি বৎসরের অস্তিত্ব বড় কম নহে!

কিন্তু উৎসাহকে যে ছাতে করিয়া গড়িয়াছিল— সে আজ নাই: তাহার স্মৃতির উন্নত স্তম্ভস্বরূপ "উৎসাহ" আছে, সে নাই। সে ফুটি ফুটি করিয়াও ফুটিল না, না ফুটিয়াই ঝরিয়া গেল। সে থাকিলে হয়ত উৎসাহের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি হইত। এখন অল্পাধিক সাধ্য আছে, সাধনা নাই— ন্যূনাধিক শক্তি আছে, প্রাণ নাই। কিন্তু তখন সাধনা ছিল, সাধ্য ছিল না—প্রাণছিল, শক্তির বিকাশ তখনও সম্পূর্ণ হইয়াছিল না। সে আজ অনেক দিনের কথা।

উৎসাহ যখন প্রথমে হস্তলিখিত পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হইত তখন সুরেশ বঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠ কবির কবিতাকণা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিতে একস্থানে লিখিয়াছিল "আমরা কয়েকটী ছাত্র মিলিয়া "উৎসাহ" নামে একখানি মাসিকপত্র বাহির করিতে মনস্থ করিয়াছি। কাগজ

---

* এই প্রবন্ধটী সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করা উচিত ছিল, কিন্তু বিলম্বে হস্তগত হওয়ায় শেষে সন্নিবেশিত হইল। সম্পাদক।

আপাততঃ ইহাতে লিখিত হইয়া অপ্রকাশিত ভাবে থাকিবে, কেননা ইহাতে এমন ছেলেও লিখিবে যাহারা কেবল এই প্রথম লেখনী ব্যবহার করিবে অর্থাৎ কাগজ খানিতে তাহারা শিক্ষানবিশি করিবে; পরে যদি সময় হয় আপনাদের আশীর্ব্বাদে ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে "উৎসাহ" নিজপথে অগ্রসর হইবে।" এই পত্রেরই অন্য স্থানে ছিল 'উৎসাহ অবশ্য বৃক্ষে পরিণত হইবে, ফল উৎপন্ন করিয়া সাহিত্যকে উপহার দিতে পারিবে।" সে আজ সাত বৎসরের কথা। সেই পত্রের একখানিঅনকল অদ্যাপীও আছে। যখন এই পত্রখানি লেখা হইয়াছিল তখন কয়জন মনে করিয়াছিল যে কয়েকজন অজ্ঞ স্কুলের ছাত্র দ্বারা পরিচালিত একখানি হস্ত লিখিত ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকার কলেবর একদিন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, নিখিলনাথ, জলধর প্রভৃতি সাহিত্য-মহারথীদিগের প্রবন্ধ কুসুম সমাচ্ছন্ন হইয়া অলঙ্কৃত হইবে। কিন্তু কালে তাহাই হইল। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে একটি সামান্য ঘটনা হইতেই একটি বৃহৎ কার্য্যের সূত্রপাত হয়। উৎসাহেরও তাহাই হইয়াছিল। সুরেশ যে উৎসাহের উন্নতি দেখিয়া যাইতে পারিয়াছে ইহাই উৎসাহের সৌভাগ্য।

উৎসাহের সেই শৈশবাবস্থায়, উৎসাহ যখন হস্তলিখিত হইয়া বাহির হইত— তখন শ্রীযুক্ত মতিলাল বিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন, শ্রীযুক্ত ভবাণীগোবিন্দ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি "উৎসাহে" লিখিতেন। কিন্তু এই সকল প্রবন্ধ সংগ্রহ করা এবং সংগ্রহান্তে পরিষ্কার রূপে নকল করিয়া পুস্তকাকারে বাহির করিবার ভার সুরেশের উপরেই ছিল। সুরেশকে সে জন্য অনেক পরিশ্রম করিতে হইত— সময়ও অনেক নষ্ট হইত; তখন তাহার পাঠ্যাবস্থা। উৎসাহের বাল্যাবস্থায় সুরেশ উৎসাহের জন্য যে কি করিয়াছিল, অত কথা বলিবার স্থান সম্পাদক মহাশয় আমাকে দেন নাই। তাই সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে সুরেশই তখন উৎসাহের প্রবর্ত্তক— সুরেশই তাহার পরিচালক এবং সুরেশই তাহার একমাত্র জীবন ছিল। সুরেশের কাব্যপ্রিয় বন্ধুগণও তাহাকে এবিষয়ে যথোচিত সাহায্য করিত।

১৩০৩ সালের ২৭শে মাঘ "উৎসাহ" মুদ্রিত করিবার কল্পনা হয়। সেই

দিন হইতেই সুরেশ মুদ্রণ কার্য্যের জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তখন অর্থের অভাব— সাহায্যের অভাব— সহানুভূতির অভাব। সে সময় উৎসাহ ভিন্ন এখানে 'বিষাদ', 'কিশলয়', 'মিষ্ঠেকড়া' প্রভৃতি আরও কয়েক-খানি মাসিক পত্র হস্তলিখিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছিল। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার সেই সমস্ত লইয়া "সাহিত্য" পত্রিকায় 'গুপ্ত সাহিত্যালোচনা' ইতি শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিতে চাহিয়াছিলেন। প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল কিনা জানি না।

উৎসাহ যখন মুদ্রিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল সেই সময় শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবু উৎসাহের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া একটি সমালোচনা লিখিয়া-ছিলেন। তাঁহার "হস্তলিখিত মাসিক পত্র" শীর্ষক প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়— সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। সেই প্রবন্ধ উৎসাহ সম্বন্ধেই লিখিত হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই সুরেশচন্দ্র অক্ষয় বাবুর সহিত উৎসাহ সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রকার পরামর্শ করিত। হয়ত অক্ষয় বাবুর মত একজন বিজ্ঞ সাহিত্যসেবীর আন্তরিক সহানুভূতি ও সাহায্য না পাইলে "উৎসাহ" সাহিত্য জগতে পরিচিত হইবার সুযোগ কখনই পাইত না।

"উৎসাহ" মুদ্রিত করিতে যে অর্থ আবশ্যক সুরেশ তখন তাহারই চেষ্টায় চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বেড়াইত। সুরেশের দিনলিপির যে ছিন্ন অংশ আমি দেখিয়াছি তাহারই একস্থানে লেখা আছে—"প্রাতঃকালে উৎসাহের জন্য বাহির হইলাম। ইহাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। সুতরাং ইহাকে সজীব রাখিবার জন্য আমার আপ্রাণ চেষ্টা ব্যয়িত হইতেছে। ফলাফল অদৃষ্ট!"

অর্থ সংগ্রহ না হইলে যে মাসিকপত্র সজীব রাখিবার চেষ্টা কতদূর আয়াস সাধ্য তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। তাহাতে আবার তখন পর্য্যন্ত উৎসাহের মুক্তিদর্শন অনেকের অদৃষ্টেই ঘটিয়াছিল না। তাই তখন অনেকেই চাঁদা দিতে রাজি হইত না। সকলেই বলিত 'কাগজ না দেখিলে চাঁদা দিতে পারি না'। তাই বড় দুঃখ করিয়া সুরেশ একদিন তাহার দিনলিপিতে লিখিয়াছিল—"প্রাতঃকালে টাকা আদায়ের জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া

মরিলাম। কেহ কিন্তু মুখ তুলিয়াও চাহিল না। হায়! আমি যে কার্য্যে জীবন তুলিয়া দিয়াছি, সে কার্য্যে কি একটা লোকও একটা টাকা ফেলিয়া দিতে পারে না— সৎকার্য্যের পথ কি এতই কণ্টকময়!!" বাঙ্গালীর সহানুভূতি সর্ব্বদাই এইরূপ! যখনই সেই সহানুভূতির সহিত অর্থের সংশ্রব তখনই বাঙ্গালী পলায়ন করে। সুতরাং সুরেশের বাসনা পূর্ণ করিবার পথে যে এরূপ পাষাণোপম বাধা আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা নূতন কথা নহে। কিন্তু সুরেশ বাধা অতিক্রম করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। উৎসাহকেই সুরেশ তাহার জীবনের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য স্বরূপ বিবেচনা করিয়াছিল। কর্ত্তব্য প্রতিপালনই ধর্ম্ম।

"যাবৎ শরীরং সুদৃঢ়ং যাবৎ সন্তীন্দ্রিয়াণি চ।
তাবদেব কর্ত্তব্যং পুরুষৈর্হি ব্রতং সদা॥"

তাই সুরেশ প্রাণপণ করিয়াও উৎসাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল। কিন্তু আজ কাল নবোত্থিত মাসিক পত্রিকাগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতই সন্দেহ হয় যে অন্ততঃ কিছুদিন না দেখিয়া কোন একখানি নবীন পত্রের গ্রাহক হইতে সাহস হয় না। তাই স্থানীয় ভদ্র লোকদিগের নিকটে প্রতিদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সুরেশ কোন দিন বা ভগ্ন মনে, কোনদিন বা কিছু সংগ্রহ করিয়া ক্লান্তদেহে গৃহে ফিরিত। সেই সময় সুরেশের কয়েকজন বন্ধু স্থানান্তরে ছিলেন। তাঁহাদিগের যত্নে অন্য স্থান হইতেও মধ্যে মধ্যে দুই চারি জন করিয়া উৎসাহের গ্রাহক হইতে লাগিল। গ্রাহক হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া সুরেশ দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা প্রভৃতি স্থানের বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রদিগের নিকট পত্রাদিও লিখিয়াছিল— এতদ্ভিন্ন নানা স্থানে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনও প্রচারিত হইয়াছিল। ধীরে ধীরে অর্থ সংগ্রহ হইতে লাগিল।

অর্থের সঙ্গে সঙ্গে লেখক সংগ্রহ। ইহাও অর্থ সংগ্রহের ন্যায়ই কষ্ট সাধ্য। যাঁহারা প্রবন্ধ লিখিয়া মূল্য গ্রহণ করেন তাঁহাদিগের নিকট যাইবার সাধ্য সুরেশের ছিল না। যাঁহারা প্রবন্ধের মূল্য গ্রহণ করেন না, সাহিত্যসেবাই যাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সুরেশ তাঁহাদিগের নিকট পত্রাদি লিখিতে লাগিল। এই সময়ে শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবুর সাহায্য বড় উপকারী হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মিথিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির নিকট পত্রাদি লেখা হইল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু, জলধর বাবু প্রভৃতির নিকট পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছিল। স্থানীয় লেখকদিগের সহানুভূতি হইতেও সুরেশ বঞ্চিত হইয়াছিল না।

কিন্তু এই সময়েই শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় উৎসাহের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিলেন। তাহার পর সুরেশও আর কখন দীনেন্দ্র বাবুর নিকট প্রবন্ধ চাহে নাই— তিনিও এপর্য্যন্ত কখন উৎসাহে লেখেন নাই, বরং সুযোগ হইলেই তীব্র ভাষায় উৎসাহের সমালোচনা করিয়াছেন। এই বিদ্বেষের মূলে যে কি ছিল তাহা আমরা জানি না। সুরেশের দিনলিপিতে এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা লেখা আছে। কথাগুলি দীনেন্দ্র বাবুর নিকট বড় অপ্রিয় ও তিক্ত হইবে বলিয়া আমরা তাহা উদ্ধৃত করা ভাল মনে করি না।

সে যাহা হউক, সুরেশের অমানুষিক পরিশ্রমে ১৩০৩ সালের ২৯ চৈত্র উৎসাহের প্রথম ফর্ম্মা রাজসাহীর বাণী যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। উৎসাহের প্রথম খণ্ড বাহির হইবার পূর্ব্ব কয়েকদিন সুরেশ প্রায় সকল সময়েই ছাপাখানায় থাকিয়া তত্ত্বাবধান করিত। এত পরিশ্রমের পর ১৩০৪ সালের ১৭ই বৈশাখ উৎসাহ সাহিত্য জগতে দেখা দিল। সুরেশের সে দিন অপার আনন্দ। নিজের ডায়েরীতে সুরেশ লিখিয়াছিল "অদ্য উৎসাহ শেষ হইল। ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা বাহির হইল। কল্য হইতে বিলি হইবে। অদ্য সমস্তদিন নিজে পরিশ্রম করিয়া কাগজ বাহির করিলাম।" সুরেশই উৎসাহের সম্পাদক হইয়াছিল।

"উৎসাহ" বাহির হইবার কিছুদিন পরেই অর্থাৎ ১৩০৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'হিন্দুরঞ্জিকায়' উৎসাহের একটি তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হইল; সম্পাদকীয় নহে— সমালোচনাটী 'প্রেরিত'। যিনিই সেই সমালোচক হউন না কেন, তিনি নিতান্ত অভদ্র ভাবে বিদ্রূপ করিয়া সমালোচনা করিয়াছিলেন। কালক্রমে সমালোচকের নাম গোপন রহিল না। কিন্তু সুরেশ সেই সমালোচনার প্রত্যুত্তর দিতে ঘৃণা বোধ করায় সমালোচক মহাশয় অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। তাহার পর ১৩ই জ্যৈষ্ঠের 'হিন্দুরঞ্জিকায়'

হিন্দুরঞ্জিকা সম্পাদক উৎসাহের সমালোচনা করেন। সে সমালোচনায় পূর্ব্ব সমালোচনার প্রতিবাদ এবং উৎসাহের বিস্তর প্রশংসাও ছিল।

সকল কার্য্যেরই প্রারম্ভ বড় আয়াস সাধ্য। কিন্তু একবার আরম্ভ করিতে পারিলে আরব্ধ কার্য্য অনেকটা সহজ ও সরল হইয়া আসে। অক্ষয় বাবুর পরামর্শক্রমে "উৎসাহ" চলিতে লাগিল। সুরেশ প্রাণপণ যত্ন করিয়া উৎসাহকে উন্নত করিতেছিল। কিন্তু মফঃস্বলে মুদ্রা যন্ত্রের যেরূপ বন্দোবস্ত তাহাতে সুচারুরূপে মাসিক পত্রিকা পরিচালনা একরূপ অসম্ভব। তাই সময়মত কাগজ বাহির হইতে পারে না— ছাপাও তেমন হয় না।

সুরেশ উৎসাহমুদ্রণ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া ফর্ম্মা কম্পোজ করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। তাই সে যতদিন জীবিত ছিল ততদিন প্রেসে লোক না থাকিলেও নিজেই সকল কার্য্য করিত। এমন ঘটনা সুরেশের জীবনে অনেকদিন ঘটিয়াছিল। সুরেশের ডায়েরী হইতে আমি একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি "এবার উৎসাহের জন্য বড়ই খাটিতে হইল! Printer প্রভৃতির জ্বর— আমিই এবার একাধারে Editor, Publisher, Manager, Printer, Compositor এবং Peon— যাক্, তবুও যদি কাগজখানা চলে।" এমন করিয়া বুঝি আর কোন সম্পাদক সংবাদপত্র পরিচালনা করেন না— উৎসাহও আর কখন এমন একজন সম্পাদক পাইবে না। উৎসাহের জন্য সুরেশের যেমন প্রাণপণ ভালবাসা ছিল, যদি তেমনি তাহার অর্থবল থাকিত তাহা হইলে হয়ত উৎসাহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। কারণ প্রবন্ধের দৈন্য উৎসাহের কোন দিনই নাই এবং যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা একখানি উচ্চ শ্রেণীর মাসিকপত্রের যোগ্য। উৎসাহের একমাত্র অভাব শোভা। বাহিক শোভাও সৌন্দর্য্য অর্থসাপেক্ষ। উৎসাহের কেবল তাহারই অভাব। উৎসাহের কাগজ ভাল নহে, ছাপা ভাল নহে— উৎসাহে চিত্র নাই, চিত্রে মাসিক সাহিত্য সমালোচিত হয় না— কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের প্রথিতনামা লেখকদিগের প্রবন্ধ উৎসাহে থাকে। ইহাই উৎসাহের গৌরবের বিষয়।

সুরেশ জীবিত থাকিতেই উৎসাহের জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়াছিল। যন্ত্রটী ছোট। এখন তাহাতেই কোন প্রকারে উৎসাহের কার্য্য হইতেছে।

সেই যন্ত্রের দোষেই আজকাল উৎসাহের মুদ্রণকার্য্য তত ভাল হয় না।

যাহা হউক, সুরেশের বড় যত্নের "উৎসাহ" গ্রাহক, লেখক এবং পাঠকদিগের অনুগ্রহে যে আজ পর্য্যন্তও চলিতেছে ইহা বড়ই সুখের কথা। আমরা সুরেশকে স্মরণ করিবার জন্য উৎসাহের দীর্ঘজীবন কামনা করি। "উৎসাহ" জন্মগ্রহণ করিয়া রাজসাহীতে সাহিত্যালোচনার পথ অনেকটা সরল করিয়াছে— স্থানীয় এবং বৈদেশিক নবীন লেখকদিগের পরিচিত হইবার পথও একটু সুগম হইয়াছে। কারণ প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে "উৎসাহ" লেখকের নামের দিকে চাহে না— কেবল প্রবন্ধই দেখিয়া থাকে। উৎসাহে আর একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। অন্যান্য অনেক মাসিক যেমন পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব এবং গালাগালি বহন করিয়া থাকে— উৎসাহ তাহা করে না বরং সেরূপ করাকে ঘৃণার্হ বলিয়া মনে করে। বর্ত্তমান নিন্দাবাদের যুগে ইহা একটি কম কথা নহে— অথচ আবশ্যক হইলে উৎসাহ সত্য কথা কহিতে ভয় করে না।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

——*——

শ্রীকবি-কুঞ্জ।

সেফালিকা।

উষায় বরষি অশ্রু
শিশিরের জলে
কি খেদে ঝরিয়া পড়
ধরা-পদতলে!
ত্রিদিব-বালিকা,
অয়ি সেফালিকা!
কেন জেগেছিলে, বল,
রজনীর শেষে
শুভ্র স্নাত নিরমল

বিধবার বেশে!
মুখে নাই ভাষা,
নাই কোন আশা!
যুঁই বেলা বিকসিয়া,
নয়ন জুড়ায়;
তুলি সবে প্রিয় জনে
যতনে সাজায়!
প্রণয়-প[illegible]
[illegible] উপহার!

তোমারি সনে না আলো
করুণ আঁখিতে!
সরমে লুকাতে যাও
ধূলায় মাটিতে!
বিহীন-গরিমা,
তব মধুরিমা!
আমি ত তোমারে ল'য়ে
ভরি মোর ডালা;
আনমনে গাঁথি বসে
তোর চারু মালা!
জাগে কত স্মৃতি
তোরে হেরি নিতি!
হৃদয়-ঈশ্বরী, ওলো
সঙ্গিনী আমার,
ভালবাসি ওই রূপ
লাজে সুকুমার!
সরলা বালিকা,
তুই সেফালিকা!

শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ।

অঞ্জলি।

অসীম করুণাতব
হে বিভু করুণাময়!
তোমারি এ ভবনাট্য,
তোমারি এ অভিনয়।
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
নিরখি তোমারি ছায়া,
বিতরিছে সর্ব্ব জীবে
সম ভাবে তব দয়া।
তোমারি কৃপায় নাথ,
গাছে গাছে ফোটে ফুল,
তোমারি আজ্ঞায় নদী,
ব'য়ে যায় কুল কুল,
তোমারি আদেশে শশী
করিয়া কিরণ দান,
সু[illegible] গো চির
[illegible]ন তাহাতেই [illegible] প্রাণ।
না চাহিতে দাও প্রভু!
যখন যা প্রয়োজন—
সদাই ভাবগো কিসে,
সুখে রবে জীবগণ।
ভাবিলে করুণা তব
ভক্তিরসে সিক্ত প্রাণ,
সংসার ভুলিয়া ছুটে
ওপদে লভিতে স্থান।
পূজিতে বড়ই সাধ—
কি দিয়ে তোমায় পূজি?
তোমারি সৃজিত বিশ্বে,
তোমারি কুসুম রাজি;—
আমারত কিছু নাই
কি দিব তোমায়, স্বামি?
তোমারি "প্রদত্ত" সব—
তোমারি—তোমারি আমি॥

শ্রীমতী [illegible] গুপ্তা।

For favor of Kind Review & Exchange

স্বর্গলোকগত সুরেশচন্দ্র সাহা প্রবর্ত্তিত।

পঞ্চমবর্ষ।

পৌষের

উৎসাহ

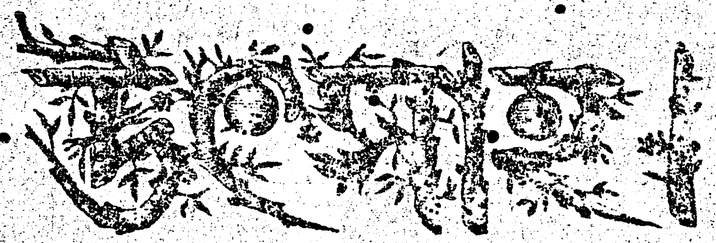

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত।

উৎসাহ প্রেশ, রাজসাহী।

শ্রীমহিরুদ্দীন সরকার প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥• টাকা। [illegible] উপহার! [illegible] আনা।

সূচীপত্র।

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
দেববালা ...	শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ সরকার বি-এ, ...	৩৩
মোগল শাসনকালে ভারত-বাসীর অবস্থা ...	শ্রীযুক্ত রামপাণ গুপ্ত ...	৩৪
চিনি চম্পা ...	... ...	৪০
বাঁশির গান ...	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন বি-এ, ...	৫১
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতম্	শ্রীস——— বি-এ, ...	৫৩
গোলাপ কলি ...	শ্রীমতী কমলিনী দেবী ...	৫৭
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা	... ...	৫৮
চিত্রকানন ...	শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় ...	৬১

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত

নূতন ভক্তি গ্রন্থ **শ্রীশ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল।** মূল্য ১৷৷৵০ আনা।

(কবিবর হরিচরণ দাস বিরচিত।)

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গুরুদাস বাবুর দোকানে ও

"উৎসাহ" কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

একখানি পত্র।

"প্রভাত চিন্তা", "নিশীথচিন্তা" প্রভৃতি বহুগ্রন্থ প্রণেতা, সাহিত্য সংস্কারক শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সম্পাদককে লিখিয়াছেন :— "* * * আপনি যে 'অদ্বৈত মঙ্গল' প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। অদ্বৈত মঙ্গল অতি পুরাতন ও সুপরিচিত গ্রন্থ। শুনিয়াছি, বহু দিন হইল, উহা একবার মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু কি কারণে জানি না, উহা প্রকাশিত হইতে পারে নাই। * * * অদ্বৈত মঙ্গল অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক।"

উৎসাহ।

৫ম বর্ষ। } পৌষ; ১৩০৮। { ২য় সংখ্যা।

দেববালা।

শান্তিময় ত্রিদিবের আনন্দ আবাসে
নন্দন বিটপী যেথা ফুল্ল ফল ফুলে
মন্দাকিনী মনোসাধে বহে কূলে কূলে
অনিন্দ্যসুন্দরী নাকি দেববালা বসে।

দেববালা, মন্দাকিনী, নন্দন কানন—
স্বপন রঞ্জিত ছায়া কবির কল্পনা
কোথায় কেমনে আছে কেহ তা জানে না
সে শোভা মাধুরী কভু হেরেনি নয়ন।

আমি জানি আমাদের সংসার বসতি,
অগণন দেববালা হেথায় বিহরে,
স্বরগ বিমল কান্তি করুণার ভাতি
নিতি এ আঁধার ধরা আলোকিত করে।

বিপন্নের পার্শ্বে যেই রমণী-মূরতি
সেই সত্য দেববালা মর্ত্ত ভূমি'পরে॥

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

মোগল শাসনকালে ভারতবাসীর অবস্থা।

(৩)

মন্দিস লো নামক একজন জর্ম্মাণ ভ্রমণকারী ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই সময়ে ব্রোচ নগর জনাকীর্ণ ছিল; ইহার অধিকাংশ অধিবাসীই তন্তুব্যবসায়ী ছিল এবং তাহারা গুজরাট প্রদেশে উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র বয়ন করিত। তিনি ব্রোচ হইতে আহমদাবাদ গমন করিবার সময় পথিমধ্যে ব্রোদারা নামক আর একটি তন্তুবায় ও চিত্রকর পূর্ণ নগরে উপনীত হন। তিনি আহমদাবাদের বৈভব ও সৌষ্ঠব দেখিয়া চমৎকৃত হন। এই নগরের অধিকাংশ শিল্পীই কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। জর্ম্মাণ পর্য্যটক কাম্বেকে প্রসিদ্ধ সুরাট নগর অপেক্ষাও বৃহৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; তথায় বিপুল বাণিজ্য-স্রোত প্রবাহিত ছিল। মোগলের রাজধানী লোক-বিশ্রুত আগ্রানগরী আয়তনে ইস্পাহান অপেক্ষা দ্বিগুণ ছিল। সমস্ত নগরী সুদৃশ্য ও সুপ্রশস্ত রাজপথমালায় পরিশোভিত ছিল। পণ্যবীথিকা সমূহের দ্রব্যভাণ্ড বিক্রয়ার্থ দর্শকগণের সমক্ষে পরিদৃশ্যমান রাখিবার জন্য কোন কোন সুপ্রশস্ত রাজ পথপার্শ্বে খিলান নির্ম্মিত ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুবিখ্যাত বের্ণিয়ার সাহেব কিয়ৎকালের জন্য এদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি জন সাধারণের ঐশ্বর্য্যের বর্ণনাকালে আপনার লেখনি সঙ্কুচিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও একস্থানে ভারতবর্ষকে অতলস্পর্শ গহ্বরের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, সমগ্র ইউরোপের স্বর্ণ রৌপ্যরাশি বাণিজ্য-স্রোতে বহমান হইয়া এই গহ্বরে পতিত হইতেছে। তিনি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন যে ওমরাহগণের, এমন কি সামান্য সৈনিক পুরুষগণের পরিচ্ছদের শোভা বর্দ্ধন জন্য বহুমূল্য রত্ন ব্যবহৃত হইত, দরিদ্র লোকের স্ত্রীকন্যাও স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার আচরণ করিত। বের্ণিয়ারের আগমনকালে এদেশের শিল্প ব্যবসায়িগণ শাল, গালিচা, রেশম ও তুলার কাপড় এবং জরী, সুবর্ণ ও রৌপ্য খচিত বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিত।

বিদেশজাত যে সকল দ্রব্য বিক্রয় জন্য ভারতবর্ষে আমদানি হইত বের্ণিয়ার সাহেব তাহার এক তালিকা প্রদান করিয়াছেন।

দেশের নাম,	দ্রব্যের নাম,
ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশ	সীসক
পারসী দেশ	কাপড়
তাতার, আরব্য ও পারস্য দেশ	অশ্ব
বুখারা ও অন্যান্য স্থান	আঙ্গুর, বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, আরাকাট, আপেল প্রভৃতি।
মালদ্বীপ	কড়ি
মিশর দেশ	গণ্ডারের শৃঙ্গ, হস্তীদন্ত ও ক্রীতদাস
চীনদেশ	মৃগনাভি ও কাচের বাসন।
সিংহলদ্বীপ	হস্তী, নানারূপ মশল্লা ও মুক্তা

বের্ণিয়ার সাহেব ভারতবর্ষকে ফলশস্যপূর্ণ বহুজনাকীর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদেশকে মিশর দেশ অপেক্ষাও উর্ব্বর বলিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে ধান্য প্রভৃতি আহার্য্য শস্য ব্যতীত রেশম, তুলা, নীল ও চিনি প্রভৃতি বাণিজ্য দ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং ভারতবাসিগণের বিদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইত না জন্য দেশের অর্থ দেশেই থাকিত। বের্ণিয়ার সাহেব লিখিয়াছেন যে বঙ্গ দেশের উৎপন্ন ধান্য দ্বারা স্বদেশের আহারের সংস্থান হইয়া অন্যান্য দেশের ভরণপোষণের কার্য্যও নির্ব্বাহিত হইত এবং সর্ব্বত্রই মৎস্য মাংস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত।

মোসলমান রাজত্বকালে কি শাসন, কি সৈনিক, উভয় বিভাগেই হিন্দুগণ বিশিষ্ট রূপে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহারা সর্ব্বদা জ্ঞায়িত্ব পূর্ণ কার্য্যের ভার লাভ করিতেন। তাঁহারা সেনাপতি, শাসন-কর্ত্তা ও মন্ত্রি পদে নিয়োজিত হইতেন। গোলকুণ্ডার চতুর্থ নরপতি ইব্রাহিম, সেগদেব নামক একজন হিন্দুকে প্রধান অমাত্যের পদ প্রদান করিয়াছিলেন। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ আদিলের রাজত্বকালে হেমচন্দ্র (হিমু) নামক দিল্লীর একজন দোকানদার ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া রাজকার্য্যে সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠেন।

ফরকসিয়র, রফিউদ্দজারত; রফিদ্দৌলা ও মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে রতনচাঁদ নামক একজন দোকানদার সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় উজীরের সহকারী পদ লাভ করিয়াছিলেন, সমগ্র হিন্দু স্থানে তাঁহার অনন্ত ক্ষমতা ও প্রতাপ ছিল। রাজা অজিত সিংহও তাঁহার যত্নেই আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক পুনঃ প্রবর্ত্তিত ঘৃণ্য জিজিয়াকর রহিত হইয়াছিল। সায়ের উস মুতক্ষরিন লেখক লিখিয়াছেন, "এমন কি ধর্ম্ম ও বিচার সম্বন্ধীয় কার্য্যেও তিনি এরূপ ভাবে হস্তক্ষেপ করিতেন যে তাহাতে তৎ সম্পর্কীয় রাজকর্ম্মচারিগণ সম্পূর্ণ ক্ষমতা হীন হইয়াছিল। এই হিন্দুর সম্মতি ব্যতীত কেহ কোন নগরের কাজির পদও লাভ করিতে পারিতেন না।"

বঙ্গদেশের সুবাদার সুজা খাঁর আমলে রাজা আলম চাঁদ ও জগৎ শেঠ রাজকার্য্যে অতুল প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। এমনকি তিনি মৃত্যুকালে পুত্র সরফরাজ খাঁকে এই দুইজন হিন্দুর মন্ত্রণামত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন। আলীবর্দ্দী খাঁ বঙ্গের শাসন কর্ত্তৃপদ অধিকার করিয়া রাজা জানকীরামকে প্রধান অমাত্যের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গোলাম হোসেন খাঁ লিখিয়াছেন যে জানকীরাম প্রতিভাশালী রাজকর্ম্মচারী এবং সুবাদারের অন্তরঙ্গগণ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও কর্ম্মঠ ছিলেন।

মহারাজ মোহনলাল সিরাজদ্দৌলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে দুর্ল্লভরাম ও রামনারায়ণ বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

আইন-ই আকবরী গ্রন্থে আবুল ফজল আকবরের সময়ের বিশিষ্ট রাজ পুরুষগণের একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন। এই তালিকায় নিম্নলিখিত হিন্দু কর্ম্মচারিগণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

পাঁচহাজারী সেনাপতি।

১। রাজা বিহারীমল।

২। রাজা ভগবান দাস।

৩। রাজা মানসিংহ। রাজা মানসিংহ কিয়ৎকালের জন্য বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন। আকবর অবশেষে তাঁহাকে সাত হাজারী সেনাপতির পদ প্রদান করেন। তাঁহাকে এইপদ প্রদান করিবার পূর্ব্বে

রাজকুমার এবং রাজার অন্তরঙ্গ কুটুম্বগণ ব্যতীত আর কেহ কখনও পাঁচ হাজারের অতিরিক্ত সেনার নায়কত্ব প্রাপ্ত হন নাই। অতএব আকবর তাঁহাকে সাতহাজারী সেনাপতি করিয়া সমস্ত মোসলমান কর্ম্মচারীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করিয়াছিলেন।

চার হাজারী সেনাপতি।

৪। রাজা তোডরমল। তোডরমল রাজস্ব নীতি বিশারদ সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার সাহায্যেই আকবর অভিনব রাজস্ব বিধান প্রচলিত করিতে পারিয়াছিলেন। তোডরমলের যত্নেই পারসীর পরিবর্ত্তে হিন্দীভাষায় বিচার কার্য্য সম্পাদন করিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

৫। রায় রায়সিংহ। জাহাঙ্গীর বাদশাহ ইঁহাকে পাঁচ হাজারী সেনাপতির পদ প্রদান করিয়াছিলেন।

আড়াই হাজারী সেনাপতি।

৬। জগন্নাথ।

দুই হাজারী সেনাপতি।

৭। রাজা বীরবল। ইনি আকবর বাদশাহের একান্ত প্রিয়পাত্র ও চির সহচর ছিলেন। তিনি ইঁহাকে রায় কবি উপাধি প্রদান করেন।

৮। রাজা রামচন্দ্র বগলা। ৯। রায় কল্যাণমল। ১০। রায় সুরজন।

দেড় হাজারী সেনাপতি।

১১। রায় দুর্গা। ১২। মধুসিংহ।

সাড়ে বারশতী সেনাপতি।

১৩। রায় সল দুর তরি (?)।

এক হাজারী সেনাপতি।

১৪। রূপসি (সিংহ?) বৈরাগী। ১৫। অযোধ্যাসিংহ। ১৬। জগমল। ১৭। জগৎ সিংহ। ১৮। রাজা রাজসিংহ। ১৯। রায় ভোজ।

সাত শতী সেনাপতি।

২০। রায় তুপার দাস। ২১। মেদিনী রায়। ২২। বারু।

পাঁচ শতী সেনীপতি।

২৩। পরমানন্দ। ২৪। জগমল। ২৫। রাওলভীম। ২৬। রামদাস।

২৭। দুর্জ্জন সিংহ। ২৮। শিওল সিংহ। ২৯। রামচাঁদ। ৩০। রাজা মুকুটমল। ৩১। রাজা রাম চাঁদ। ৩২। রাম চাঁদ। ৩৩। দুলপত।

চার শতী সেনাপতি।

৩৪। সুখৎ সিংহ। ৩৫। রাম মনোহর। ৩৬। রামচাঁদ। ৩৭। বক্ত।

সারে তিন শতী।

৩৮। তুলসীদাস। ৩৯। কৃষ্ণদাস। ৪০। মানসিংহ। ৪১। বিল-বিধর। ৪২। কিষণদাস। ৪৩। নীলকণ্ঠ।

আড়াই শতী সেনাপতি।

৪৪। রায় রামদাস চেওয়ান।

দুই শতী সেনাপতি।

মোট ৮ জন।

আকবরের সময়ে মোট ৪১৬ জন সেনাপতি ছিলেন। অতএব হিন্দু সেনাপতির সংখ্যা শতকরা তেরজন ছিল। ইঁহারা সকলেই দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তোডরমল রাজস্ব মন্ত্রীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন। একমাত্র রাজকুমারগণের জন্যই যে সকল পদ চিহ্নিত ছিল তাহাও রাজা মানসিংহকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

মোগল বাদশাহগণ হিন্দু রাজকন্যাদিগকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিতেন। কোন কোন মোগল বাদশাহ হিন্দু রাজমহিষীর গর্ভজাত ছিলেন। আকবর হিন্দু মহিষীগণের প্রীতির জন্য যজ্ঞ করিতেন বলিয়া আইন-ই আকবরীগ্রন্থে লিখিত আছে। আকবরের দুইজন মহিষী হিন্দু ছিলেন। তদীয় পুত্র জাহাঙ্গীর হিন্দু মহিষীর গর্ভজাত ছিলেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহের মহিষীর সংখ্যা দশজন ছিল; তন্মধ্যে অন্যূন ছয় জন হিন্দুকুলজাত ছিলেন। তদীয় পুত্র শাহজাহান হিন্দু মহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার ধমনীতে মোসলমানের অপেক্ষা হিন্দুর রক্তই অধিক প্রবাহমান ছিল।

ভারতবর্ষীয় মোসলমানগণ ক্রমশঃ হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা এসলামধর্ম্মের প্রচারে ক্রমশঃ নিরুৎসাহ হইয়াছিল। আকবরের রাজত্বের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া শাহজাহানের রাজ্য চ্যুতি পর্য্যন্ত

মোগল সাম্রাজ্যের গৌরবরবি মধ্যাহ্ন আকাশে সমুদিত ছিল। আকবর এবং তদীয় প্রধান পারিষদদ্বয় (ফৈজী ও আবুল ফজল) বহুল পরিমাণে হিন্দু রাজপুরুষগণ দ্বারা পরিচালিত হইতেন। তাঁহার সময়ে হিন্দু মহিষীদের এতদূর প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল যে তিনি পেঁয়াজ, রসুন ও শ্মশ্রু পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুর ন্যায় থাকিতেন। বদায়ুনি লিখিয়াছেন যে আকবর হিন্দু জনসাধারণের সন্তোষ বিধান জন্য রাজদরবারে পরিবর্ত্তিত আকারে হিন্দুর আচার ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছিলেন। তোডরমল বীরবল, মান সিংহ এবং হিন্দুভাবাপন্ন ফৈজী এবং আবুল ফজলই আকবরের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টাতেই মোগল সাম্রাজ্য উদার ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছিল। হিন্দুজাতি সম্বন্ধে আকবরের উদার নীতি জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান বাদশাহের রাজত্বকালেও অব্যাহত ছিল। শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্ম সম্বন্ধে আকবরের পন্থাবলম্বী ছিলেন। তিনি হিন্দু ও এসলাম ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়া একখণ্ড পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে তাঁহার যত্নে ও চেষ্টায় পঞ্চাশখানি উপনিষদ পারস্য ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। আলমগীর নামার লেখক একস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে দারা রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে এসলাম ধর্ম্মের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইত। আওরঙ্গজেব গোঁড়া মোসলমান ছিলেন। তাঁহার হিন্দু বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল ছিল। অতএব তাঁহারা সাম্রাজ্যের অধিকার লইয়া যে দ্বন্দে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা হিন্দুপ্রীতি ও হিন্দু বিদ্বেষের বিবাদ রূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এই বিবাদে হিন্দু বিদ্বেষরই জয় লাভ হইয়াছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের অভাবের পরেই হিন্দু প্রীতি মূলক শাসন প্রণালীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। যদিচ আওরঙ্গজেব হিন্দুর প্রতি একান্ত বিদ্বেষ পরায়ণ ছিলেন তথাপি তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগে রাজা জয়সিংহ ও মহারাজ যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি হিন্দু সেনাপতিগণ দায়িত্বপূর্ণ বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। মোগল শাসনকালে হিন্দুর রাজকার্য্যে উচ্চাধিকার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফলতঃ সিগনর মানুসী স্বচক্ষে মোগলের সূক্ষ্ম ও বহুদূর বিচারী শাসন প্রণালী দেখিয়া যথার্থই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে "They (the institutions

of the Moghul Empire) have not been represented as free from defect, but exhibiting, rather a state in which barbarism is so qualified by the equity which pervades the administration as to render "the Government of the Moghûl Empire little inferior to that of any other nation."

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

চিনি চম্পা।

সুরপুর একটি পল্লীগ্রাম। পবিত্র সলিলা ভাগীরথী তাহার পাদদেশ বিধৌত করিয়া উন্মত্ত উল্লাসে উচ্ছ্বাসিত হইয়া অস্ফুট সকরুণ ঝঙ্কারব পূর্ব্বক দূরাগত বীণাধ্বনির ন্যায় গ্রামবাসীর কর্ণে অমৃত সিঞ্চণ করিতে করিতে চির প্রেমিক সাগরকে আলিঙ্গন ও সম্ভাষণার্থে উল্লসিত হৃদয়ে বিপুল প্রবাহে প্রধাবিত হইতেছে।

সুরপুর গ্রামের এক প্রান্তে লোক পবিত্রকারিণী জাহ্নবীর দক্ষিণ পার্শ্বে একটি পর্ণ কুটির ছিল। কুটিরে মনুষ্যের সংখ্যা তিনটি। ষষ্ঠী বৎসর বয়স্ক তারিণীচরণ ও তাহার দগ্ধ-হৃদয়ে শান্তিবারি নিক্ষেপকারী চতুর্দ্দশ বয়স্ক একপুত্র চিনি এবং তদকনিষ্ঠ এক কন্যা— চম্পা। বৃদ্ধ বয়সের সন্তান বলিয়া তারিণী পুত্রের নাম চিনি রাখেন।

চম্পা চিনির পাঁচ বৎসরের ছোট। এখন তাহার বয়স দ্বাদশ বৎসর। তাহার দুই বৎসর বয়ক্রমকালে যখন 'মা' 'বাপা' প্রভৃতি স্নেহের ডাকগুলি মুখ ফুটিয়া বাহির হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময়ে তাহার মা, তাহার মা বলিবার সাধ চিরদিনের তরে শান্ত করিয়া স্বামীর চরণে মস্তক রাখিয়া অতীত জীবনের অপরাধ উল্লেখ পূর্ব্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিতে করিতে সেই অনাবিষ্কৃত চিরান্ধকারময় মৃত্যুর রাজ্যে যাত্রা করে। তারিণীচরণ পত্নী

বিয়োগ তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত ফেন-পুঞ্জের ন্যায় মথিত-ক্লিষ্ট হইলেও চম্পার মুখ-পানে চাহিয়া পুনরায় সংসার করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি সে কন্যার লালন পালনে রত হন।

চম্পার বিবাহের বয়স হইয়াছে। এখন আর সে শৈশবের খেলা ধূলা করে না। গা থেকে কাপড় ফেলিতে লজ্জা বোধ করে, একা পথে ঘাটে পুরুষ দেখিলে ভয়ে গা ভারি ভারি হয়। এখন সে বৃক্ষমূলে, শিশুবৃন্দের ঊর্ব্বর কল্পনা সাহায্যে নির্ম্মিত কর্দ্দমময় কালীমূর্ত্তি প্রস্ফুটিত বন্য ফুল দ্বারা মন্ত্রহীন অর্চ্চনা করিতে দেখিলে, চঞ্চল হৃদয়ে দৌড়াইয়া গিয়া তাহাতে যোগ দিতে ইচ্ছা করে না। চাঁপায় এখন সবই নূতন।

তারিণীচরণ নিঃসহায়,— অস্থ ভক্তঃ তনুরক্ষা। জীবন সংগ্রামের সহস্র সংঘর্ষে বায়ু তাড়িত ধূলি পটলের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া কন্যা পুত্রের ক্ষুধার অন্ন-মুষ্টির জন্য ললাটের স্বেদ বিন্দু ক্ষরণ করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিত তদ্দ্বারা দু'বেলা পেট ভরিয়া খাওয়ার পর অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকিত। সুতরাং কন্যা বিবাহের উপযুক্তা দেখিয়া সে একেবারে আত্মহারা হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাকে বেশী দিন সে চিন্তায় ক্লিষ্ট হইতে হইল না। সেই দুঃখীর পরম দেবতা কাল তাহাকে অচিরেই এ দুঃখময় সংসার হইতে অপসারিত করিল। তাহার বেদনা মথিত-যাতনা-ক্লিষ্ট ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভগ্ন জীবন-তরণী উত্তাল তরঙ্গমালা সমাকুল ভব সাগর পরপারে যাইয়া জানি না শান্ত হইল কি না?

বালক চিনি কিন্তু অকূল পাথারে পতিত হইয়া দুঃখের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। সে যেন এক নিদারুণ, দুশ্ছেদ্য কার্য্য কারণ শৃঙ্খলার নির্ম্মম বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এক লক্ষ্য শূন্য, উদ্দেশ্য শূন্য, বিরাম শূন্য, প্রাহেলিকা ময় মহাশূন্য যাত্রায় ভাসিয়া চলিতে লাগিল।

অপূর্ব্ব চিনির সহপাঠী, সমবয়স্ক ও পরম সুহৃদ। অপূর্ব্ব দারিদ্র্যের তীব্র কষাঘাত হইতে রক্ষা পাইলেও খুব বড় লোক ছিলেন না। চিনির সহিত তাহার বড় সদ্ভাব। উভয়ে একত্র পাঠ করিত, ভ্রমণ করিত ও

আহ্বান করিত। সময় সময় অপূর্ব্ব চিনির বাড়ীতে এক আধ নিশি অতিবাহিতও করিত। তাহারা যেন এক আত্মা এক প্রাণ। চম্পাকে অপূর্ব্ব বড় ভাল বাসিত। প্রস্ফুটিত শুভ্র সেফালিকা পুষ্পের মধ্যে যেমন একটা পবিত্রতার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, চম্পার বদন মণ্ডলে অপূর্ব্ব সেই রূপ এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য দেখিতে পাইত।

যেখানে ভোলা প্রাণের খোলা প্রবাহ, যেখানে আকাঙ্ক্ষা, উত্তেজনা, লালসার মদির নেশা কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত করে না, যেখানে কোন প্রকার লাভের সম্ভাবনা নাই, সেখানে যে প্রণয় তাহাই প্রকৃত ভালবাসা। অপূর্ব্ব প্রতিদান প্রাপ্তির আশা না করিয়াই চম্পাকে ভাল বাসিয়াছিল।

(২)

আজ বাসন্তী পূর্ণিমা। যখন নবোদিত পূর্ণচন্দ্র আনন্দ উচ্ছ্বাসের কল-তরঙ্গে উদ্বেলিত হৃদয়ে উদার-আকাশ-পটে ভাসিয়া যাইতেছিল, সুশীতল পরিমলসঙ্কুল-নির্ম্মল মলয়ানিল দ্বারে দ্বারে কুসুম সুরভি বহন করিয়া বেড়াইতেছিল, যখন বিমান বিহারী বিহগবর্গের বিনোদ কলরব ভাব পীড়িত উপভোগ-বিহ্বল উচ্ছল প্রেমিক হৃদয়ের প্রকাশ বেদনা উন্মাদিনী ভাষায় উত্তেজিত করিতেছিল, যখন পৃথিবীর পরিশ্রান্ত স্বর সান্ধ্য-নিরবতার ক্রোড়ে, শান্তির অঙ্কে ক্রমশঃ মিলাইয়া আসিতেছিল, সেই সময় এক লজ্জাবতী লতা একটি সহকার তরুকে আশ্রয় করিল। যেন দুইটি বন কুসুম এক সূত্রে গ্রথিত হইল,— উদ্বেগপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূরিত একটি নূতন তরঙ্গ সেই কোমল আর একটি তরঙ্গের সহিত স্বীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিল।

অনাথের বন্ধু ভগবান। যাহার সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, আত্মীয় নাই এমন কি আপনার বলিতে এ সংসারে কেহই নাই তাহার একমাত্র ভরসা ভগবান। চিনি অপূর্ব্বের নিকট ভগিনীর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া এ কষ্ট হইতে উদ্ধারের উপায় করিতে অনুরোধ করে। অপূর্ব্ব বন্ধুর কাতর অনুনয়ে নিজেই চম্পাকে বিবাহ করিলেন। বৃদ্ধা মাতা ভিন্ন অপূর্ব্বের সংসারে আত্মীয় বলিতে আর কেহ ছিল না।

* * *

ছয় মাস হইল চম্পার বিবাহ হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ সময় চম্পা

পিত্রালয়েই অতিবাহিত করিয়াছে। অদ্য শ্বশুরালয় হইতে তাহাকে লইতে আসিয়াছে। ঘরে যাহা কিছু ভাল জিনিষ ছিল চিনি তদ্দ্বারাই প্রিয় ভগিনীকে বিভূষিতা করিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে চম্পাকে বলিল,—

"চম্পা! মনে যেন থাকে আজ থেকে, তুমি নিজের ঘর করিতে চলিলে। তোমাকে আজ হইতে পরের জন্য ভাবিতে হইবে, কাম-কলুষময় পৃথিবীর ভোগবিলাসিতা হইতে সম্পূর্ণ দূরে অবস্থান করিয়া গুরুজনের সেবায় নিযুক্ত রহিতে হইবে। স্বামীর অনুগতা হইয়া থাকিবে। জানিও স্ত্রী লোকের স্বামীই পরম দেবতা।"

চম্পা নীরবে ভ্রাতৃ চরণে প্রণিপাত হইল। প্রণাম করিবার সময় দর-বিগলিত ধারায় শোকাশ্রু তাহার সুকোমল গণ্ডস্থল বহিয়া চিনির চরণে গড়িয়া পড়িল। তাহার পর— তাহার ক্ষুদ্র জীবনের সারাংশ, প্রাণের আশা আকাঙ্ক্ষা, নবীন বাসনা কামনা, চির জন্মের তরে তাহার পৈতৃক বাস্তু ভিটার পর্ণকুটিরের নিভৃত অন্তরালে রাখিয়া, হতাশ পরাণে দাদার মুখ পানে চাহিতে চাহিতে পালকীতে উঠিল। চিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। পরে সে একটি সুদীর্ঘ দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ গৃহে ফিরিয়া আসিল। আগ্নেয়গিরি যেমন তাহার অভ্যন্তরস্থিত ভূভাগকে ভস্মীভূত করিয়া অকস্মাৎ প্রচণ্ড বেগে বিনির্গত হয়, তাহার সে নিশ্বাসও বোধ করি তাহার হৃদয়ের অস্থি মজ্জাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া অনন্তে বিলীন হইয়া গেল। চিনি শূন্য গৃহে শূন্য হৃদয়ে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

(৩)

এ সংসারে সুখ বড় একটা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তথাপি কেবল দুঃখের রাজ্যও দেখিতে পাওয়া যায় না। এক যায় অন্য আসে— দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ, অমানিশার পর পূর্ণিমা। তবে দুঃখ অধিক স্থায়ী, সুখ বিদ্যুত প্রভার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। যে কারণে তোমার হৃদয়ে আনন্দ সুধা বর্ষিত হইতেছে, যে কারণে তোমার কর্ণে সুখের সঙ্গীত, সন্তোষের সুর, তৃপ্তির তান, মনের রাগিণী প্রবেশ করিতেছে, ঠিক সেই কারণে, অন্যত্র অপরকে বিষ দহনে দগ্ধ করিতেছে, অন্তর্দ্দাহের অলক্ষ্য চুল্লিতে তাহার অস্থি, শিরা, মেদ ভস্মীভূত করিতেছে। ইহাই জগৎপাতার বিধান,

ইহাই পৃথিবীর নিয়ম।

চম্পা শ্বশুর বাড়ীতে আছে। সে প্রাণপণে বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিয়াছে, তাঁহাকে কিছুই করিতে হয় না। চম্পাই তাঁহাকে স্নানের বারি, আহার্য্য প্রভৃতি যাহা যাহা প্রয়োজন সমস্তই চাহিবার পূর্ব্বে হাজির করিয়া দেয়। বৃদ্ধা শেষ জীবনে মনোমত পুত্রবধু পাইয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। পুত্রবধুর প্রশংসা আর তাঁহার মুখে ধরে না। কিন্তু চম্পার প্রাণ যেন অস্থির, সে যেন কাহাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।

বিবাহের পর চম্পার সহিত অপূর্ব্বের একদিনও দেখা হয় নাই। বিবাহের অল্প দিবস পর অপূর্ব্ব লেখা পড়া পরিত্যাগ করিয়া চাকুরি করিতে কলিকাতায় যান। চম্পাকে বাড়ীতে আনিয়া অপূর্ব্বের মাতা পুত্রকে সংবাদ প্রেরণ করেন কিন্তু অবকাশ না পাওয়ায় সে আসিতে পারে না।

* * *

বড় দিনের অবকাশে অপূর্ব্ব আজ বাড়ি আসিয়াছে। তিনি পাড়া-গেঁয়ে লোক, তত শিক্ষিত নন, সেই জন্য চোখের মাথা খাইয়া দিবসে চম্পার সহিত দেখা করিতে পারিলেন না। সূর্য্য নয়ন নিমীলিত করিলেন, সন্ধ্যা সতী দেখা দিলেন, দেখিতে দেখিতে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল। বাড়ীর সকলে নৈশ ভোজন শেষ করিয়া শয়ন করিল। কেবল অপূর্ব্ব এখনও বৈঠকখানায় বসিয়া ভাবিতেছেন।

আর চম্পা কি করিতেছে? চম্পা কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। গৃহের এককোণে একটি ছোট টেবিল, তদুপরি কতকগুলি পুস্তক ও একটি আলো জলিতেছে। দেওয়ালের গায়ে তিনখানা চিত্রপট বিলম্বিত। একখানি নল দময়ন্তীর চিত্র। একবস্ত্রের অর্দ্ধেক নল পরিধান করিয়া বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন, অপরার্দ্ধ দ্বারা শোকবিহ্বলা অনিন্দ্যসুন্দরী দময়ন্তী কোন প্রকারে লজ্জা নিবারণ পূর্ব্বক পতিপদপ্রান্তে তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে নিদ্রাভিভূত। নলের দক্ষিণ হস্তে একখানি অপরিষ্কৃত তরবারি—বস্ত্রদ্বিখণ্ডিত করিতেছেন। অদূরে একটি হরিণ শিশু একবার তৎপ্রতি এবং পরক্ষণে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে,—যেন সে প্রহরীতে নিযুক্ত। চম্পা চিত্রখানি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া অর্দ্ধ অস্ফুট স্বরে বলিল,—"ছিঃ

পুরুষ কি কঠিন!"

আর একখানিতে একটি নদীর চিত্র। নদীর উপর সেতু। অনুপম রূপলাবণ্যবতী একটি স্ত্রীলোক সেই সেতুর উপর হইতে একটি পুরুষকে নদীমধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। তাহার বামহস্তে একটি প্রস্ফুটিত কমল। পুরুষ সন্তরণে অনভ্যস্ত, আকণ্ঠমজ্জিত হইয়া করযোড়ে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, কিন্তু সেই চামুণ্ডা তৎপ্রতি ভ্রূকুটি ভঙ্গি করিয়া যেন বলিতেছে,—"তুলবইত?" এ চিত্রখানে চিত্রকরের লিপিকৌশল অতুলনীয়। চম্পা লজ্জায় মুখ নীচু করিল।

আর একখানির চিত্র অতি ভীষণ, দেখিলেই শরীর কণ্টকিত হয়। চম্পা দেখিল— আলুলায়িতকুন্তলা, লোলজিহ্বা বিবসনা একনারী রক্তমূর্ত্তিতে সমরক্ষেত্রে অসিহস্তে করিয়া পেই পেই নৃত্য করিতেছেন। দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া সম্মুখে যাহাকে পাইতেছেন, তাহারই মস্তক স্কন্ধ হইতে নিপাতিত করিয়া গলে পরিতেছেন। মুণ্ডমালায় শোণিতস্রোতে তাঁহার আস্তন বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। চম্পা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল।

এমন সময় অপূর্ব্ব মৃদুপাদবিক্ষেপে গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার অর্গল বদ্ধ করিলেন। কপাট রুদ্ধ করার শব্দে সুকুমারী চম্পা আরও শিহরিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ ফিরিল। ফিরিয়া কি দেখিল? সে যাহা দেখিল তাহাতে তাহার মস্তক আর ঊর্দ্ধে উঠিল না। লজ্জায় কেমনতর হইয়া গেল। আবক্ষ অবগুণ্ঠন লম্বিত করিয়া গৃহের এক কোণে দণ্ডায়মানা রহিল।

অপূর্ব্ব অগ্রসর হইয়া সস্নেহে তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক শয্যায় আনিয়া উপবেশন করিল। পরে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া বলিল,—"এত লজ্জা কিসের?"

চম্পা কোন কথা বলিতে পারিল না। অপূর্ব্বের হস্ত হইতে স্বীয় হস্ত টানিয়া লইয়া লজ্জারক্তিম বদন অবগুণ্ঠনে আবৃত করিল। অপূর্ব্ব তাহাকে আধা দিয়া বলিলেন,—"কেন, আমার সহিত কি কথা কহিবে না? আমি এত কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি?"

চম্পা একবার ভাবিল বলি যে, নাথ! তুমি ত কোন অপরাধ কর নাই, তবে করিতেও পার না। যত দোষ আমার। কিন্তু তখনই লজ্জা

আসিয়া তাহার সে সংকল্প স্থানান্তরিত করিল। বলি, বলি, করিয়া তাহার আর বলা হইল না। কথা প্রাণ ফুটিয়া বাহির হইল কিন্তু মুখ ফুটিয়া বাহির হইতে পারিল না। তাহার সহিত কথা বলিব? ছিঃ—বড় লজ্জা করে। তিনি যে আমার স্বামী—সাক্ষাৎ দেবতা।

চম্পাকে নীরব দেখিয়া অপূর্ব্ব তাহার সুকোমল অধর টিপিয়া, টানিয়া বক্ষে স্থাপন করিলেন। পরে ব্রীড়াবিনম্রমুখী চম্পার রক্তিম গণ্ডযুগে চুম্বন দিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। চম্পা ও সর্ব্বশরীর বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি কথা সম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া একপার্শ্বে শুইয়া পড়িল। তাহার আর কথা বলা হইল না।

(৪)

"বড় জ্বালা—প্রাণ—যায়, একটু জল দাও—" অতি ক্ষীণ কণ্ঠে অপূর্ব্ব এই কথাগুলি বলিলেন। পার্শ্বে উপবিষ্টা চম্পা অশ্রু মুছিতে মুছিতে এক ঝিনুক জল তাঁহার শুষ্ককণ্ঠে ঢালিয়া দিল। জল সমস্ত তাঁহার মুখে প্রবেশ করিল না, দুই পাশ দিয়া খানিকটা গড়াইয়া পড়িল।

আজ দশ দিবস হইল অপূর্ব্ব বাড়ী আসিয়াছেন। যে দিবস আইসেন সেই দিবস রাত্রেই তাঁহার ভয়ানক জ্বর হয়। দুই দিবস সংজ্ঞাশূন্য হইয়া থাকেন। তাহার পর এই প্রথম কথা—"বড়—জ্বালা—প্রাণ—যায়,—একটু জল দাও—"। কথা শুনিয়া চম্পার বুকের ভিতর যেন কেমন করিতে লাগিল,—বুক যেন খিল ধরিল। শরীরে যেন সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল,—মাথা ঘুরিতে লাগিল। অতি কষ্টে সে আত্ম-সংযম করিল। তাহার সুন্দর ললাটে চিন্তার চিহ্ন অঙ্কিত হইল, যেন মধ্যাহ্ন-সৌরকর সমুজ্জ্বল উভয়তট বিপ্লাবিনী ভাগিরথী বক্ষে প্রতিফলিত সদৃশ একখানি কালমেঘের ছায়া আসিয়া পড়িল।

একজন গ্রাম্য চিকিৎসক প্রত্যহ আসিয়া অপূর্ব্বকে দেখিতেন, আজিও আসিলেন। অদ্য রোগীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখশ্রী পরিম্লান হইল। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু না বলিয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় গোপনে একজন প্রতিবেশীকে বলিয়া গেলেন—"আজ দুপুর

পার পায় কিনা সন্দেহ। তোমরা একটু নিকটেই থেকো।"

দেখিতে দেখিতে অপূর্ব্বের মুখে মৃত্যুর ছায়া পতিত হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া চম্পার মুখ পানে একবার চাহিলেন। চম্পা সে দৃষ্টিতে শিহরিয়া উঠিল। এখন তাহার লজ্জা অপসারিত হইল। ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল,—চারি চক্ষু মিলন হইল।

অপূর্ব্ব কাতর স্বরে বলিলেন,—"চম্পা, কেন আমার সহিত তোমার বিবাহ হইয়াছিল? আমার সহিত বিবাহ না হইলে বোধ হয় তুমি সুখী হইতে পারিতে? আর বাঁচিব না,—সময় হইয়া আসিয়াছে। একটি কথা তোমাকে বলিব, চাঁপা, শুনিবে কি—রাখিবে কি?"

চম্পা নিরুত্তর।

অপূর্ব্ব চম্পার হস্ত ধারণ করিলেন। আবার বলিতে লাগিলেন,—

"মা থাকিলেন, তাঁহাকে অযত্ন করিও না। যদি পরকাল থাকে তবে সেই শান্তি ধামে নিশ্চয়ই আমার সহিত মিলিত হইবে। কথা বলছনা কেন? একবার কথা বল। এখন না বলিলে আর ত সময় পাইবে না! সময় ঘনিয়ে আসছে!"

চম্পার কথা বলিতে বড় লজ্জা হইল। এখনও লজ্জা? স্বামী—দেবতা, মৃত্যু শয্যায় তবুও লজ্জা?

অপূর্ব্ব পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

না-না-আসি, আমাকে সঙ্গে করে-নিয়ে যাও—, আমি সে-পথ—চি-নি—না!—আমি আর-দেরি ক-র-ব না!

চম্পা বুঝিল স্বামী প্রলাপ বকিতেছেন। এমনে তাহার সাহস হইল, চক্ষের জল শুকাইল। সে অনিমেষ নয়নে স্বামীর মৃত্যু দেখিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে অপূর্ব্ব পুনরায় বলিলেন,—

"তবে--চম্পা--বিদায়-দা--ও, আ—র—কে—ন————।"

লজ্জার বাঁধ আর টিকিল না। চম্পা বলিল—

"গেলে—আমাকে ফেলে গেলে? যাও তবে,—এখন আর বারণ করি না। আশীর্ব্বাদ করিও যেন পরজন্মে তোমাকেই স্বামী পাইয়া সুখী—।"

আর বলিতে পারিল না। চম্পার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। ভীরন

চিৎকার করিয়া চম্পা মূর্চ্ছিতা হইল।

চিৎকার শ্রবণ করিয়া তাহার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় অপূর্ব্ব আর একবার চক্ষু মেলিল,—সেই শেষ চাওয়া। চাহিয়া বলিল,—

"মা,—পা—য়ে—র—ধু—লা—দা—ও—।"

আর কথা সরিল না। সুখ স্বপ্নের শেষ স্মৃতিটুকুর ন্যায়, বিশুষ্ক সুরভি-প্রসূনের মৃদু সৌরভ টুকুর ন্যায়, প্রসন্নদেবতার স্নেহমাখা শুভ দৃষ্টির ন্যায়, মাতার মুখ দেখিতে দেখিতে ধীরে অতি ধীরে তাহার জ্যোতিহীন চক্ষু বন্ধ হইল আর খুলিল না, অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল;

হায় চম্পা! শৈশবে মাতৃ বিয়োগ, তাহার পর পিতৃ বিয়োগ। সে শোক সম্বরণ করিতে না করিতে যৌবন প্রারম্ভে এই ভীষণ শোক! হায় বিধাতা! চম্পার জীবন কি কেবল দুর্ব্বিষহ অভিসম্পাতের সমাহারে সংগঠিত?

(৫)

চম্পার কপাল ভাঙ্গিয়াছে—ভাঙ্গিয়াও তাহার নিস্তার নাই। এখন সে শাশুড়ীর বিষদৃষ্টিতে পড়িল। 'বাঘিনী' শাশুড়ি সর্ব্বদাই তাড়না করিয়া বলিত—"পোড়ার মুখী, আঁটকুড়িকে ঘরে এনে আমার শান্তি নাই। বছর না ফিরিতেই রাক্ষসী আগে সোয়ামীকে খেয়ে বস্‌লো। অভর পেট,—মানুষ নাহ'লে তৃপ্তি হয়না। বাপ মাকে খেয়েও কি পেট ভরেছিলনা?" ইত্যাদি

চম্পা স্বামীর অন্তিম প্রার্থণা,—"মা থাকলেন, তাঁহাকে অযত্ন করিওনা" মনে করিয়া নীরবে শাশুড়ীর বাক্যবাণ সহ্য করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেও তাহার ক্রোধের উপশম হইলনা। তিনি পুত্রবধূকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। হায় বঙ্গকুলবিধবা! তোমাদের অশ্রু মুছাইতে একটী প্রাণীও অগ্রসর হয়না! সকলেই স্বীয় স্বার্থসাধনে তৎপর।

সকলেরই একটা সীমা আছে,—সহিষ্ণুতারও সীমা আছে। শাশুড়ীর অত্যাচারে প্রপীড়িতা হইয়া চম্পার সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। শৈশবে মাতার শোক, পরে পিতার শোক, তাহার পর উন্মেষিত যৌবনে স্বামীর শোকে তাহার হৃদয়ে যে আগুন জ্বলিতেছিল, শাশুড়ীর নিষ্ঠুর অত্যাচারে সে আগুন শতগুণে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল,— অগ্নিতে ইন্ধন প্রক্ষিপ্ত হইল।

"পুত্র মরিয়াছে,— তা'র বৌ কেন থাকে? সেও মরুক্ আমার হাড় ঠাণ্ডা হউক,— চিহ্ন বিলুপ্ত হউক"— এই বলিয়া শাশুড়ী একদা পুত্রবধূকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিল। সদ্য-প্রফুল্ল-মধুগর্ভ অনাঘ্রাত কুসুম-কলিকার ন্যায় চম্পা অশ্রুনীরে বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে করিতে অতি অনিচ্ছার সহিত স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়াভিমুখে প্রস্থান করিল। কেহ ধরিল না, কেহ নিবারণ করিল না! তাহার ধরিবার বলিবার লোক বুঝি এসংসারে কেহই নাই? তাঁহার সেই প্রেম গভীরতা, নৈরাশ্য কাতরতা, বেদনা-চর্চ্চিত ক্ষুদ্র হৃদয়ের হাহাকার ধ্বনি শুনিয়া সহানুভূতির একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিবারও বুঝি কেহ ছিল না?

চিনি স্নেহময়ী ভগিনীর এতাদৃশ ভাগ্য বিপর্য্যয়ে শোকে উন্মত্ত হইলেও, সে প্রাণ বাঁধিতে শিখিয়াছিল। সুতরাং তাহার প্রাণে এক অভিনব ব্যাকুলতা উপস্থিত হইল মাত্র।

* * * *

চম্পা এখন পিতৃগৃহে। তাহার ব্যর্থজীবনের প্রেম ভালবাসা, আপনার ক্ষুদ্র বুকটুকুর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া চম্পা কালাতিপাত করিতে লাগিল, অতীত জীবনের বিষাদ-মন্থর রোমন্থন দ্বারা দিন যাপন করিতে লাগিল। কিন্তু বিধাতা বুঝি তাহার এসুখটুকুও সহিতে পারিলেন না! কিছু দিবস যাইতে না যাইতে, সেই কুলীশপ্রতিম দুঃখ রাশি ভস্মাচ্ছাদিত হইতে না হইতেই, পরদোষান্বেষী কুটিল প্রতিবেশীগণ তাহার নির্ম্মল চরিত্রে বিষম সন্দিহান হইল। ঐ দেখ মেয়েরা সন্ধ্যার সময় মাজায় কলসী লইয়া জল আনিতে যাইতেছে। যাও, একবার তাহাদের পাশে। কি শুনিতে পাইবে? চম্পার চরিত্র সম্বন্ধে সমালোচনা! যেন এক একজন সতী সাবিত্রী বা সীতা। এই প্রকারে হাটে, ঘাটে, পথে চারিদিকে চম্পার কুৎসা রটিতে লাগিল। কেহই কিন্তু প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করিল না।

কত সহ্য হয়। চম্পা আর পারিল না। সকলের চেয়ে তাহার চরিত্রের নিন্দা অসহনীয় হইয়া উঠিল। একদা সে সন্ধ্যার পর চিনির নিকট বসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—

দাদা! মানুষ মরিয়া কোথায় যায়?

স্বর্গে।

মা, বাবা সকলেই কি স্বর্গে গিয়াছেন?

হুঁ।

আমরাও জীবনান্তে সেখানে যাইব?

হাঁ, বোন্, আমরাও যাইব।

তবে আমরা আমাদের আপনার জনকে পুনরায় সেথায় পাইব?

পাইব বৈ কি?

আচ্ছা দাদা, আমরা যেমন তাঁহাদের জন্ত ভাবি, তাঁহারাও কি তেমনি আমাদের জন্ত ভাবেন?

না বোন্, সেখানে গেলে ভাবনা থাকে না। সেখানে সব শান্তিময়।—এই বলিয়া চিনি চোক্ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া গেল। চম্পাও একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাগীরথী অভিমুখে অগ্রসর হইল। তীরে উপনীত হইয়া চম্পা গঙ্গাকে উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। পরে জলে নামিল। আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া চম্পা সুনির্ম্মল অমৃত ধারা সদৃশ জাহ্নবী-সলিল অঞ্জলী ভরিয়া পান করিল। বুঝি তাহার মর্ম্মভেদী পিপাসার সুতীব্র জ্বালা প্রশমিত হইল না। তাই সে একবার কাঁদিল,—"দাদা" বলিয়া একবার কাঁদিল। তাহার পর— তাহার পর ডুবিল, ডুবিয়া সেই অপরিচিত অক্ষয় প্রেমময় বিধাতার অনন্ত বিস্তৃত প্রেমরাজ্যে,—যেখানে বাসনা প্রতারিত হয় না, ধনগর্ব্ব, ধনপিপাসা, আত্মশ্লাঘা, ভিক্ষুকের অবশ বাহুর দৃঢ় আলিঙ্গন-বদ্ধ হৃদয়ের ধন কাড়িয়া লয়না, নৈরাশ্যের তীব্র বিলাপে যেখানকার গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ হয় না, চম্পা সেই অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে চলিয়া গেল। হিন্দু পরঙ্গনার অপূর্ব্ব চম্পা, রমণী জীবনের গৌরবের চম্পা, সতীত্বের পূত অশ্রুমাখা চম্পা, স্বর্গের চম্পা স্বর্গে চলিয়া গেল!

ঠিক সেই সময়ে তীরস্থিত এক আম্রবৃক্ষ হইতে একটি পাখী ডাকিল,—"বৌ কথা কও?" কই কেহইত কথা কহিল না। কেবল প্রতিধ্বনি গন্ধবহ মলয়পবনে সঞ্চালিত হইয়া সুনীল সাগর চুম্বী রজত-রশ্মি-বিধৌত

সুপ্ত অনন্ত গগনের সুদূর নিভৃত প্রান্তে ভাসিয়া ভাসিয়া থামিয়া গেল।

* * * *

চম্পার মৃত্যুর পর চিনিকে আর কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই। সুতরাং এইখানেই "আমার কথাটি ফুরালো, নটে গাছটি মুড়ালো।"

হাসির গান।

হরি বল্‌রে মন আমার;
নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত অবতার!
(এমন) বেঁয়াড়া মৌতাতের মাত্রা চড়িয়ে দিলে কে?
দশ বছরের ডেঁপো ছেলে চস্‌মা ধরেছে!
(এখন) টেঁড়ি নইলে চুলের গোড়ায় বায়না মলয় হাওয়া;
(আর) রমজান চাচার হোটেল ভিন্ন হয়না যাদুর খাওয়া
হরি বল্‌রে—ইত্যাদি।

চব্বিশ ঘণ্টা চুরুট নইলে পাপ করে আই ঢাই!
(আর) এক পেয়ালা গরম চা তো ভোরে উঠেই চাই!
'কমোড' ভিন্ন হয়না কোষ্ঠ, 'বাথরুম' ভিন্ন স্নান;
(সাহেবের) ঘুসী ভিন্ন বিফল নাসা, চাকরী ভিন্ন প্রাণ;
হরি বল্‌রে—ইত্যাদি।

(একটু) চুট্‌কী ভিন্ন যায়না সময়, মদ নইলে বিরহ;
'ফুট্‌বল' ভিন্ন হাড় পাকেনা, হয়না কষ্টসহ,
(গজটেক্) কালো ফিতে নইলে পায়না পোড়ার চ'খে কান্না;
(একটু) পলাণ্ডুর সদ্‌গন্ধ ভিন্ন হয়না মাংস রান্না।
হরি বল্‌রে—ইত্যাদি।

মাসিক পত্র আর কাটেনা 'ছোট গল্প' ছাড়া;
সাপ্তাহিক টে ভাল,চলে গাল্ দিলে বেঁয়াড়া।
(একটু) সাহেব-ঘেঁসা না হ'লে আর হয়না পদোন্নতি;
(অত) সত্যাসত্য দেখ্‌লে এখন আর চলে না ওকালতি।
হরি বল্‌রে—ইত্যাদি।

আদালতের কার্য্যে কেবল আমলাদের দাও খোসা,
ভাল কাপড় গয়না ভিন্ন যায়না গিন্নির গোসা!
(একবার) বিলেত ঘুরে না এলে ভাই ঘোচেনা গো জন্ম;
(আর) গিন্নির ঝাঁটা নইলে শক্ত হয়না পৃষ্ঠের চর্ম্ম!
হরি বল্‌রে—ইত্যাদি।

(একটু) "এটা ওটা সেটা" ছাড়া জমে না যে মজা,
(একটি) সেবা দাসী নইলে আর তো হয়না কৃষ্ণ ভজা।
ছেলে পিলে হ'লেই এখন গিন্নি হ'য়ে যান্ 'রদ্',
(এখন) জ্বর ছাড়েনা বিনে একটু টাট্‌কা "চিকেন্ ব্রথ্"!
হরি বল্‌রে—ইত্যাদি।

বারাঙ্গনা নইলে আর যে হয়না 'থিয়েটার'
'এণ্ড কোম্পানি' নাম না দিলে দোকান চলাই ভার।
(এখন) কল, ফুল, অলি, চাঁদ, মলয়া ভিন্ন হয় না পদ্য;
(দে'খো) কোনও ব্যাপারে, বশ পাবেনা বিনে একটু মদ্য
হরি বল্‌রে—ইত্যাদি।

ভাল হে, চৈতন্য গোসাঞী জিজ্ঞাসি এক কথা;
(আবার) কৃষ্ণ অবতারে প্রভু গোধন পাবেন কোথা?
(আর) গৌর অবতারে গোসাঞী কিসে ছাইবে খোল?
মৌতাতী এই কান্তের মনে, সেই বেধেছে গোল!
হরি বল্‌রে—ইত্যাদি।

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

———*———

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতম্।

[পণ্ডিত দর্শন]

আজ রথযাত্রা। পঞ্চদশবর্ষ অতীত হইল। সকালে প্রভু কলিকাতায় ঈশানের বাড়ী নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। ঠন্‌ঠনিয়ায় ঈশানের ভদ্রাসন-বাটী। সেখানে প্রভু শুনিলেন যে, পণ্ডিত শশধর অনতিদূরে কলেজ ষ্ট্রীটে চাটুর্য্যেদের বাড়ী রহিয়াছেন। পণ্ডিতকে দেখিবার তাঁহার ভারি ইচ্ছা। বৈকালে পণ্ডিতের বাড়ী যাইবেন, স্থির হইল।

প্রায় বেলা চারিটার সময় ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। প্রভুর অতি কোমলাঙ্গ। অতি সন্তর্পণে দেহ রক্ষা হইত। তাই পথে চলিতে কষ্ট হয়—অল্পদূরও প্রায় গাড়ী না হ'লে যাইতে পারেন না। গাড়ীতে উঠিয়াই ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইলেন। তখন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষাকাল; আকাশে মেঘ; পথে কাদা। ভক্তেরা গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে যাইতেছেন। তাঁহারা পথে দেখিলেন, রথযাত্রা উপলক্ষে ছেলেরা তাল-পাতার ভেপু বাজাইতেছে।

গাড়ী বাটীর সম্মুখে উপনীত হইল। দ্বারদেশে গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

উপরে যাইবার সিঁড়ি। তৎপরে বৈঠকখানা। উপরে উঠিয়াই প্রভু দেখিলেন যে, শশধর তাঁহাকে অভ্যার্থনা করিতে আসিতেছেন। পণ্ডিতকে দেখিয়া বোধ হইল যে তিনি যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর বলিলে বলা যায়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

নরেন্দ্র, রাখাল, রাম, মাষ্টার ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা উপস্থিত ছিলেন। হাজরাও প্রভুর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী হইতে আসিয়াছিলেন। পণ্ডিতকে দেখিতে দেখিতে প্রভু ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই অবস্থায় হাসিতে হসিতে পণ্ডিতের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, বেশ! বেশ! পরে পণ্ডিতকে বলিলেন, আচ্ছা তুমি কি রকম লেক্‌চার দাও?

শশধর। মহাশয় আমি শাস্ত্রের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করি।

(কলিতে ভক্তিযোগ—কর্ম্মযোগ নহে)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। শাস্ত্রে যে সকল

কর্ম্মের কথা আছে, তার সময় কৈ? আজকালকার জ্বরে দশমূল পাচন চলে না। দশমূল পাচন দিতে গেলে রোগী এদিকে হয়ে যায়। আজকাল ফিবার মিক্শ্চার।

(কলিযুগ ও বর্ণাশ্রমাচার)

কর্ম্ম করতে যদি বল তো নেজামুড়ো বাদ দিয়ে বলবে। আমি লোকদের বলি, তোমাদের 'আপোধন্যন্তা' ওসব অত বলতে হবে না। তোমাদের গায়ত্রী জপ্‌লেই হবে। কর্ম্মের কথা যদি একান্ত বল, তবে ঈশানের মত কর্ম্মী দুই এক জনকে বলতে পার।

(বিষয়ী লোক ও লেক্‌চার)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। হাজার লেক্‌চার দাও, বিষয়ী লোকদের কিছু করতে পারবে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে তো দেয়ালের কিছু হবে না। তরোয়ালের চোট মারলে কুমীরের কি হবে?

সাধুর কমণ্ডলু [তুম্বা] চার ধাম করে আসে, কিন্তু যেমন তেতো তেমনি তেতো। তাই বলি, তোমার লেক্‌চারে বিষয়ী লোকদের বড় কিছু হচ্ছে না।

তবে, তুমি ক্রমে ক্রমে জানতে পারবে। বাছুর একেবারে দাঁড়াতে পারে না। মাঝে মাঝে পড়ে যায়, আবার দাঁড়ায়;— তবে তো দাঁড়াতে ও চলতে শিখে।

(নবানুরাগ ও বিচার)

তুমি ভক্তদের ও বিষয়ী লোকদের চিন্তে পার না। তা সে তোমার দোষ নয়। প্রথম ঝড় উঠলে কোন্‌টা তেঁতুল গাছ, বোঝা যায় না।

(কর্ম্মত্যাগ ও ঈশ্বরলাভ)

এ কথা সত্য, ঈশ্বরলাভ না হ'লে কেউ একেবারে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না। সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কত দিন? যতদিন না ঈশ্বরের ধ্যানে অশ্রু আর পুলক হয়। একবার 'ওঁ রাম' বলতে যদি চক্ষে জল আসে, তা'হ'লে নিশ্চয় জেনো যে তোমার কর্ম্ম শেষ হয়েছে। আর সন্ধ্যাদি কর্ম্ম করতে হবে না।

ফল হইলেই ফুল পড়ে যায়। ভক্তি ফল; কর্ম্ম—ফুল।

গৃহস্থের বউ, পেটে ছেলে হ'লে বেশী কর্ম্ম করিতে পারে না। খাশুড়ী দিন দিন তার কর্ম্ম কমিয়ে দেয়। দশমাসে পড়লে, খাশুড়ী প্রায় কর্ম্ম করিতে দেয় না। ছেলে হ'লে ঐটীকে নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে, আর কর্ম্ম করিতে হয় না।

(যোগ ও সমাধি)

সন্ধ্যা, গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী, প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়।

যেমন ঘণ্টার শব্দ টং ট-অ-ম্। যোগী নাদভেদ করে পর ব্রহ্মে লয় হন। সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদিকর্ম্মের লয় হয়। এই রকমে জ্ঞানীদের কর্ম্ম-ত্যাগ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সমাধির কথা বলিতে বলিতে ভাবান্তর হইল! তাঁহার চন্দ্র মুখ হইতে স্বর্গীয় জ্যোতি বহির্গত হইতে লাগিল। আর বাহ্যজ্ঞান নাই। মুখে একটি কথা নাই। নেত্র স্থির। নিশ্চয়ই জগন্মাতাকে দর্শন করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বালকের ন্যায় বলিলেন, আমি জল খাব!

সমাধির পর যখন জল খাইতে চাহিতেন, তখন ভক্তেরা এক প্রকার জানিতে পারিতেন যে, এবার ইনি ক্রমশঃ বাহ্যজ্ঞান লাভ করিবেন।

ঠাকুর ভাবে বলিতে লাগিলেন, মা! সে দিন ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখালি। তার পর আমি আবার বলেছিলাম, "মা! আমি আর এক জন পণ্ডিতকে দেখবো" তাই, তুই আমায় এখানে এনেছিস্।

(পাণ্ডিত্য ও সাধন)

পরে শশধরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাবা! আর একটু বল বাড়াও। আর কিছু দিন সাধন ভজন কর। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি? তবে তুমি লোকের ভালর জন্য এসব কচ্ছো। [এই বলিয়া ঠাকুর শশধরকে মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিলেন।]

(পাণ্ডিত্য ও বিবেক বৈরাগ্য)

ঠাকুর আরও বলিতে লাগিলেন, যখন প্রথমে লোকের মুখে তোমার কথা শুনলাম, তখন জিজ্ঞাসা করলুম যে, এই পণ্ডিত কি শুধু পণ্ডিত না বিবেক-বৈরাগ্য আছে?

যে পণ্ডিতে বিবেক নাই, সে ব্যক্তি পণ্ডিতই নয়।

(আদেশ ও আচার্য্য)

যদি আদেশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে লোক-শিক্ষায় দোষ নাই।

আদেশ পেয়ে যদি কেহ লোক-শিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না।

বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আসে, তা হ'লে এমন শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মত হয়ে যায়।

প্রদীপ জ্বাল্লে, বাদুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে—ডাক্‌তে হয় না।

তেমনি যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর লোক ডাক্‌তে হয় না। অমুক সময়ে লেক্‌চার হবে ব'লে, খবর পাঠাতে হয় না। তাঁর এমনি টান যে, লোক তাঁর কাছে আপনি আসে।

তখন রাজা, বাবু, সকলে দলে দলে আসে। আর বল্‌তে থাকে 'আপনি কি লইবেন? আম, সন্দেশ, টাকা, কড়ি, শাল এই সব এনেছি, আপনি কি লইবেন'? আমি সে সকল লোক্‌কে বলি, 'দূর কর—আমার ওসব ভাল লাগে না, আমি কিছু চাহি না।'

চুম্বক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস? বল্‌তে হয় না—লোহা আপনি চুম্বক পাথরের টানে ছুটে আসে।

এরূপ লোক পণ্ডিত নয় বটে। তা' ব'লে মনে ক'র না যে তাঁর জ্ঞানের কিছু কম্‌তি হয়। বই পড়ে কি জ্ঞান হয়? যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে—ফুরোয় না।

ওদেশে ধান মাপ্‌বার সময়, এক জন মাপে, আর এক জন রাশ্ ঠেলে দেয়; তেমনি যিনি আদেশ পান, তিনি যত লোকশিক্ষা দিতে থাকেন, মা আমার পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ্ ঠেলে ঠেলে দেন; সে জ্ঞান আর ফুরায় না।

যার যদি একবার কটাক্ষ হয়, তা' হ'লে কি আর জ্ঞানের অভাব থাকে? তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, কোন আদেশ পেয়েছ কি না?

———

ক্রমশঃ।

গোলাপ কলি।

এ নহে গো শুধু এক অফুটন্ত ফুল;
নিখিলের যত সুধা সুষমা সৌরভে
তিলে তিলে আহরণ করেছে মুকুল,
কোমল আঁচল তলে কত না বিভবে।
আসিও সে দিন, যবে সম্পূর্ণ গৌরবে
উঠিবে বিকশি' ফুল কনক ঊষার
ফেলি লাজ-বাস; আসিও সেদিন তবে
উন্মুক্ত গগন তলে বিজন সন্ধ্যায়
স্বরগে মরতে হবে গোধূলী ছায়ায়
মিলন আনন্দে হারা; অচল শিখরে
ভানু রক্ত পদ রাখি রঞ্জিবে শোভায়;
গুঞ্জরিবে অলি তার অনিন্দ্য অধরে।
করুণ-কিরণ লেখা মৃদুল মলয়ে
অবসর দাও, তারে তুলিতে ফুটায়ে॥

শ্রীমতী কমলিনী দেবী।

———

যে পণ্ডিতে বিবেক নাই, সে ব্যক্তি পণ্ডিতই নয়।

(আদেশ ও আচার্য্য)

যদি আদেশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে লোক-শিক্ষায় দোষ নাই।

আদেশ পেয়ে যদি কেহ লোক-শিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না।

বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আসে, তা হ'লে এমন শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মত হয়ে যায়।

প্রদীপ জ্বাল্‌লে, বাদুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে—ডাক্‌তে হয় না।

তেমনি যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর লোক ডাক্‌তে হয় না। অমুক সময়ে লেক্‌চার হবে ব'লে, খবর পাঠাতে হয় না। তাঁর এমনি টান যে, লোক তাঁর কাছে আপনি আসে।

তখন রাজা, বাবু, সকলে দলে দলে আসে। আর বল্‌তে থাকে 'আপনি কি লইবেন? আম, সন্দেশ, টাকা, কড়ি, শাল এই সব এনেছি, আপনি কি লইবেন'? আমি সে সকল লোক্‌কে বলি, 'তুর কর—আমার ওসব ভাল লাগে না, আমি কিছু চাহি না'।

চুম্বুক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস? বল্‌তে হয় না—লোহা আপনি চুম্বুক পাথরের টানে ছুটে আসে।

এরূপ লোক পণ্ডিত নয় বটে। তা' ব'লে মনে ক'র না যে তাঁর জ্ঞানের কিছু কম্‌তি হয়। বই পড়ে কি জ্ঞান হয়? যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে—ফুরোয় না।

ওদেশে ধান মাপ্‌বার সময়, এক জন মাপে, আর এক জন রাশ্ ঠেলে দেয়; তেম্‌নি যিনি আদেশ পান, তিনি যত লোকশিক্ষা দিতে থাকেন, মা আমার পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ্ ঠেলে ঠেলে দেন; সে জ্ঞান আর ফুরায় না।

মার যদি একবার কটাক্ষ হয়, তা' হ'লে কি আর জ্ঞানের অভাব থাকে? তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, কোন আদেশ পেয়েছ কি না?

ক্রমশঃ।

গোলাপ কলি।

এ নহে গো শুধু এক অফুটন্ত ফুল;
নিখিলের যত সুধা সুষমা সৌরভে
তিলে তিলে আহরণ করেছে মুকুল,
কোমল আঁচল তলে কত না বিভবে।
আসিও সে দিন, যবে সম্পূর্ণ গৌরবে
উঠিবে বিকশি' ফুল কনক উষার
ফেলি লাজ-বাস; আসিও সেদিন তবে
উন্মুক্ত গগন তলে বিজন সন্ধ্যায়
স্বরগে মরতে হবে গোধূলী ছায়ায়
মিলন আনন্দে হারা; অচল শিখরে
ভানু 'রক্ত পদ' রাখি রঞ্জিবে শোভায়;
গুঞ্জরিবে অলি তার অনিন্দ্য অধরে।
করুণ-কিরণ লেখা মৃদুল মলয়ে
অবসর দাও, তারে তুলিতে ফুটায়ে॥

শ্রীমতী কমলিনী দেবী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত।

পৌষ ও মাঘ।

মাঘোৎসবের জন্য দুই মাসের কাগজ একত্র বাহির হইয়াছে। এই যুগ্ম সংখ্যায় তিন ফর্ম্মা কম আছে, ফাল্গুনের সংখ্যায় তাহা সংলগ্ন হইবে। উনবিংশটি প্রবন্ধের মধ্যে অধিকাংশই অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ। 'যবনিকান্তরালে' লেখকের গভীর গবেষণা এবং সূক্ষ্ম চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। 'সপ্তভূম' প্রবন্ধে দল্‌মা পাহাড়ের 'খেড়া'র পরিচয়ে অনেকে তৃপ্ত হইবেন। 'সাহিত্য ও সমাজে' নূতন কিছু শিখিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। 'আব্‌দারে' রচয়িত্রীর কোমল হৃদয়ের প্রত্যেক ভাবগুলি স্পষ্ট-রূপে প্রকটিত হইয়াছে। সম্পাদকের 'মিলনের কথা' শুনিবার লোক কৈ? সকলেই নীরবে ঘুমাইয়া আছে! শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি বুদ্ধদেবের পরি নির্ম্মাণ কাল হইতে ৯ম খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্তের 'বঙ্গের ইতিবৃত্ত' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পূর্ণিমা।

অগ্রহায়ণ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা সমেত এই সংখ্যায় ছয়টি প্রবন্ধ আছে। তন্মধ্যে পাঁচটিতেই অল্পাধিক পরিমানে হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর উপর সম্পাদকের ভারি আক্রোশ দেখিতেছি! 'নিয়তি' প্রবন্ধে লেখক একবার ঠেস গাহিয়াছেন এবং সমালোচনায় সম্পাদক মহাশয় পূর্ণ ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়াছেন। যে দোষে মহাভারতী মহাশয়ের প্রতি চাবুক বা পিনাল কোর্ড বা অপর গাল ফিরাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয় নিজেও ঠিক সেই দোষে দোষী হইয়াছেন। পূর্ণিমারও ত পাঠিকা আছে। তাহাদিগকে ঐ সম্বাদ জানিতে দিয়া সম্পাদক মহাশয় কি ভাল কাজ করিয়াছেন? সম্পাদক মহাশয়

নিজের বেলা কোন শাস্তির বিধান করিবেন জানিতে ইচ্ছা করি। 'মাকড় মারলে ধোকড় হয়' না হইলেই বাঁচি!

অন্তঃপুর।

অগ্রহায়ণ।

এবার মাত্র তিনটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য, আর একটি পুরাতন 'শিক্ষা-পরিচয়' হইতে উদ্ধৃত। তাহা হইলেও প্রবন্ধ ক'টী সুনির্ব্বাচিত।

ইস্‌লাম-প্রচারক।

সেপ্টে, অক্টো, ১৯০১ ইং।

ইস্‌লাম প্রচারক এই আমরা নূতন পাইলাম। ইহাতে কেবল ইস্‌লামধর্ম্ম-নীতি, সমাজ-নীতি, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আলোচ্য যুগ্ম সংখ্যায় সমালোচনা সমেত সপ্তদশটি প্রবন্ধ আছে। অধিকাংশই সুখ পাঠ্য।

সুধা।

১ম খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা।

পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন ইহা একখানি নব প্রকাশিত মাসিক পত্র। মুর্শিদাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম, এ, ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ তর্কতীর্থ মহোদয়ের সম্পাদকতায় বাহির হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বএ ২৲ কাটা। মাসিক পত্র প্লাবিত বঙ্গদেশে আর একখানি নূতন পত্রের জন্য পরিগ্রহের আবশ্যক কি, সহযোগীর মুখেই তাহার উত্তর শুনুন। সহযোগী বলিতেছেন, "আকাশে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি এবং মর্ত্তে অসংখ্য প্রকার দীপালোক বর্ত্তমান থাকিতেও যদি খদ্যোতের প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গলা সাহিত্য ক্ষেত্রে নব্যভারত, ভারতী, বঙ্গদর্শন, প্রবাসী প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিতেও 'সুধার' আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমরা স্বীকার করি। আবশ্যকতা আছে বলিয়া সুধার জন্ম এবং সেই জন্যই সুধার প্রচার।" আলোচ্য সংখ্যায় একবিংশতিটি প্রবন্ধ ও

পরিব্রাজক বেশে ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর অষ্ট্রেলিয়া যাত্রার একখানি সুন্দর চিত্র প্রকাশিত হইাছে। অধিকাংশ প্রবন্ধগুলিই সুনির্ব্বাচিত ও তৃপ্তিকর। ৺ নীলকণ্ঠ মজুমদারের জীবনী-লেখক লিখিয়াছেন, "ঢাকা কলেজ হইতে কলিকাতায় আসিয়া কয়েক বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজে কার্য্য করেন, তাহার পর কটক রাভেন্সো কলেজের প্রিন্সিপালের পদে নিযুক্ত হয়েন।" নীলকণ্ঠ বাবু যে বহুদিবস রাজসাহী কলেজে অধ্যাপকতায় নিযুক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার বন্ধু কি জানেন না? যাহা হউক আমরা সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

প্রবাসী।

অগ্রহায়ণ ও পৌষ।

আজকাল উচিত কথায় অনেকেই বিরক্ত। খারাপ জিনিষ ভাল বলিয়া বাজারে বিক্রয় করিব, কেহ খারাপ বলিতে পারিবে না! যদি বল, তোমার সহিত আড়ি! সমালোচনা ব্যপদেশে কোন কোন সহযোগীকে আমারা অপ্রিয় কথা বলিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ঈর্ষা শূন্য। বিশেষতঃ প্রবাসীকে আমরা একটু স্নেহ করি, সেই জন্য তাহার ত্রুটী দেখিলেই আমরা তাহাকে সাবধান করিয়া থাকি। আলোচ্য সংখ্যায় ২২টি প্রবন্ধ আছে। তন্মধ্যে ছয়টি কবিতা, দুইটি সমালোচনা, একটি গল্প, একটিতে একখানি নাটক ও অবশিষ্টগুলি জীবন চরিত, ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও অন্যান্য বিবিধ তত্ত্ব-কথায় পূর্ণ। "খিচুড়ীর" সমালোচনা যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যায় যে, প্রভু সন্তান স্বব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া আর কখনও পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন না। তাঁহার খিচুড়ী উপরে ও তলায় দুই দিকেই পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। অঘোর বাবু মেয়েলি সাহিত্য ও বারব্রত প্রকাশ করিতেছেন,—অতি উত্তম। আমরাও প্রায় ৫০০টি মেয়েলি ছড়া, গাঁথা, কবিতা, উপাখ্যান, বারব্রত প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছি। 'কুম্ভীর' গল্পটী ছাপা না হইলে কোন ক্ষতি হইত না। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও এবার বেশ হইয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রবাসীর ক্রমোন্নতি কামনা করি।

—•—

মিত্রকানন।

[অমরশশি ঘোষ— রাধানগরের জমিদার পুত্র। কুসুমকুমারী তস্য স্ত্রী। দুঃশীলা— দাসী।]

প্রথমঅঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাধাকুঞ্জ।

অমরশশি ও কুসুমকুমারীর প্রবেশ।

প্রভাতকাল।

—•—

কুসুম — প্রাণেশ্বর, এইকুঞ্জে তোমারে হেরিলে
মনে হয়, ভ্রমিতেছি নন্দন কাননে
মধুর মলয় বাতে।

অমর — তাই সত্য প্রিয়ে!
প্রভাতে 'বিশাখা' জলে, হিল্লোলে হিল্লোলে
কমলিনী ডুবে, ভাসে; বাগ্র মধু লোভে
ধেয়ে আসে অলিকুল; আর মুগ্ধমন
আমার, দেখিতে জলে আলোকের খেলা
ছুটে আসে মহানন্দে।

কুসুম — প্রভাত বাতাসে —
কত পরিচিত মুখ মনে ভেসে আসে
মুগ্ধ কল্পনায়।

অমর — আর তব মুখ হেরি
মনে হয় স্বর্গে যেন ঐ মুখখানি
দেখিয়াছি কোন (ও) মায়া পুরে।

কুসুম — চেয়ে দেখ প্রিয়,
বালার্ক লোহিত করে গলিছে তুষার-
-মুকুট গিরির ঐ। জ্বলিতেছে গিরি
অনলে কাঞ্চন যেন। হাসিছে বিজুলি
গুহামুখে।

অমর — শুনো আর(ও) পাখী করে গান
কি মধুর, উড়ি উড়ি ধরিছে আহার
কেহ চঞ্চুপুটে, কেহ নখের আঁচরে!
তাহাদের পক্ষে পড়ি রবির কিরণ
ঝলসে বিচিত্র বর্ণে ক্ষুদ্র ইন্দ্র ধনুঃ।
কত প্রজাপতি দেখ অলস-পাখায়
ভাসিয়া যেতেছে স্নিগ্ধ পবন সাগরে,
বসি কেহ প্রস্ফুটিত গোলাপের গায়
মাখিছে আপন অঙ্গে গন্ধ পুষ্পরেণু—
আবার বসিছে উড়ি অন্য এক ফুলে।

কুসুম — জল প্রপাতের ধ্বনি বাড়িতেছে ঐ
শুনো কান দিয়া।

অমর — দেখ কত মেঘ পুনঃ
ছুটাছুটি করিতেছে গিরির শিখরে।
শ্যামল, ধবল, নীল নানা আভরণে
ভূষিত, বিহঙ্গ কলকণ্ঠ মুখরিত
অযুত তরু-মালায় ক্ষুদ্র গিরি যেন
অনন্ত যৌবন গর্ব্বে আছে দাঁড়াইয়া,
আপনি আপন হারা।

কুসুম — সখা এ কাননে
এলে, মনে পড়ে যায়, সেই পিত্রালয়ে—
মিত্র কাননের কথা। আহা সরোবর—
কে যেন অমৃত দুগ্ধ ভরিয়াছে তায়

ঢালি আপনার স্তন।

অমর (অন্যমনে) — এস ফুল তুলি
গাঁথিয়া চিকন করি কুসুমের হার,
দোলাই আনন্দে দোঁহে গলে দুজনার।
অন্য চিন্তা এ প্রভাতে সাজে কি সুন্দরী?

(মাল্য প্রস্তুত করনোদ্যত।)

কুসুম — আহা! সখে সাজায়েছি স্তবকে স্তবকে
ফুলরাজি মিত্রোদ্যানে। ঊষা, সন্ধ্যাকালে
জলসিঞ্চি তরুমূলে ঘর্ম্ম সিক্ত তনু
ঢলিয়া পড়িছে বৃদ্ধ অশথের ছায়।

অমর — আহা! প্রিয়ে, সে সময়ে কোথায় আছিল
এই হতভাগ্য প্রেম— আকাঙ্ক্ষী তোমার?
রহিলে নিকটে, অবশ্যই বীজনিত
কমল পাতায়, চুম্বি সোহাগে অধর।

কুসুম — পূর্ব্ব সুখ মনে হয় ভ্রমি এ কাননে।
শশিটীর সুধাহাসি সায়াহ্ন গগন
ঢেলে দিত নেত্র ভরি;— বিহগ সঙ্গীতে
মুগ্ধ থাকিতাম পড়ি দিদি মার বুকে
স্নেহ স্বর্গে। দেখিতাম চাহিয়া আকাশে
ফুল্ল শিশু সম চাঁদে ঘিরি মেঘ হাসে।
এ রাধানগরে সুধু একমাত্র সুখ
রাধাকুঞ্জে।

অমর — কি করিব— কে খণ্ডাবে বল
বিধির লিখন? হায় পূর্ব্বজন্মে প্রিয়ে
ছিলোনা মোদের বুঝি মনের মিলন।

কুসুম — সর্ব্ব বিদ্যাশাস্ত্র জ্ঞান তোমার, যা বল
মেনেনিতে হয় মাথা পাতি। কিন্তু কেন
তোমার ও মুখ মোর অন্তরে অন্তরে

এঁকে গেছে যেন যুগ যুগান্তর হ'তে ?
কেন ও নয়ন নাথ ধ্রুবতারা মম
চির প্রেম সোহাগের ?

অমর — আঁখির সে দোষ।
আঁখি কতজনে দেখে কত নবছলে।
কুরঙ্গ নয়নাবালা ললিত যৌবনা
'তারে দেখি ধরে এক ভাব'। সুপুরুষে
হেরি পুনঃ ভাবান্তর হয়লো প্রেয়সী।

কুসুম — ছি ছি সখে নয়নের নাহি ভাবান্তর—
নয়ন চিনিতে জানে আপন ঈশ্বর;
দোষী মন, নয়নের কি দোষ বলোনা ?

অমর — নয়নের দোষ সুধু মনেরে ছলনা।

কুসুম — নয়নের অভিরাম সে মিত্র কাননে
ইচ্ছা ছিল, চাহি দোঁহে দুজনার পানে
রজনী করিব ভোর। 'শ্যামা' জলে যবে
বাবার হরিণ দুটি জলপান করি
ছুটাছুটি করিবে সে জ্যোৎস্না বিধৌত
'শ্যামা'শষ্প কূলে— চাঁদ মধুর হাসিয়া
চকোরে পাঠায়ে দেবে মাথার উপরে।
মিশি তার কণ্ঠে, জল প্রপাতের ধ্বনি
দূর গিরি হতে আসি, নীর কণা দিয়া
শীতলিয়া দিবে কান। হুহু বায়ু বহি
তুলিবে মধুর তরু পল্লব মর্ম্মর।
যাবে— চল ব্যোমচরে কিছুদিন দোঁহে
থেকে আসি ?

ক্রমশঃ।

শ্রীসুকুমার রায়।

পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সাহা প্রবর্ত্তিত।

পঞ্চমবর্ষ। মাঘের

উৎসাহ

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

* সম্পাদক *

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

উৎসাহ প্রেস, রাজসাহী।

শ্রীমহিরুদ্দীন সরকার প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

সূচীপত্র।

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
পিপাসা ...	... ...	৬১
জন্মোৎসবে ...	শ্রীমতী শ্যামোদিনী ঘোষ ...	৬৬
দ্বিতীয় যুগের নবদ্বীপ	ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী ...	৭১
পাপ ...	... ...	৭৭
প্রবাস-বিদায় ...	শ্রীপগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, ...	৮৩
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতম্	শ্রীম——— বি-এ, ...	৮৪
অমরজীবন ...	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ...	৮৮
মাসিক সার সঙ্কলন...	... ...	৯১
হিন্দুজাতির কালান ব্যবহার	শ্রীরজনীমোহন ঠাকুর ...	৯২

—০::§)※(§::০—

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত

প্রায় ৩০০ বৎসরের প্রাচীন ভক্তি-গ্রন্থ

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল।

মূল্য ১৷৵০ প্রতি খণ্ড ।৵০

(কবিবর হরিচরণ দাস বিরচিত।)

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গুরুদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায়। আমার নিকট লইলে ডাকমাশুল ও ভিঃপিঃ খরচা লাগে না।

ম্যানেজার "উৎসাহ"।
ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

—০—

উৎসাহপ্রেশ।

এই প্রেসে চিঠি, কার্ড, চেক দাখিলা, প্রীতি-উপহার প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে অল্প সময়ে সুলভ মূল্যে মুদ্রিত হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ম্যানেজার "উৎসাহ"।
ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতম্।

অর্থাৎ "শ্রীম— লিখিত" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের উপদেশপূর্ণ জীবন-চরিত। যাবতীয় মাসিকপত্রে নিত্য প্রকাশিত। প্রথমভাগ মূল্য আড়াই টাকা। ছাপা শেষ হইয়া আসিয়াছে। ভিপিতে পাঠাবার পত্রপাঠ অর্ডার দিয়া রাখিলে এক টাকায় পাইবেন। ডাঃ মাঃ ৵০। ঠিকানা— স্বামী ত্রিগুণাতীত, প্রকাশক, ১৪ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, কম্বুলেটোলা, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসাহ।

৫ম বর্ষ। } মাঘ; ১৩০৮। { ৩য় সংখ্যা।

পিপাসা।

এতদিন কোথাছিলে হে বরললনা!
হে তীব্র পিপাসা! কেন পুনঃ একামনা
কল্পনার কক্ষ হ'তে করিয়া সঞ্চয়,
আবার ভরিয়া দিলে নিস্তব্ধ হৃদয়—
ঝটিকান্তে শান্তনদ সম। মেঘাত্যয়ে
কেন ভান রাজ্যে হেন বাসন্তী মলয়ে,
ভরিয়া তুলিলে; কেন কোকিল কূজনে
আবার জাগালে এই হেমন্ত বিজনে
নানা ফল ফুল! কেন পুনঃ অলিকুল
অশ্রান্ত ঝঙ্কারে করে অন্তর আকুল!
বাসনার বিষদন্ত সর্ব্বাঙ্গে আবার
হানে শক্তি-শেল সম, নাহি শক্তি আর
তুলিতে দু'হাতে। হে তৃষ্ণা, হে মনোরাণি,
বল, বল কোথা মম বিশল্যকরণী।

—০—

জন্মোৎসবে।

(১)

আজি পুলক আকুল নিখিল প্রকৃতি
নব আনন্দ প্রভাতে;
ধরণী হৃদয় উচ্ছ্বসিত
রম্য অতুল শোভাতে,
এক অধীর বিভল তীব্র আবেগ
উথলে জগত সভাতে
নব আনন্দ প্রভাতে ॥

(২)

পাখীগুলি সব গাহিয়া গাহিয়া
ফিরিছে গগন বুকে,
আপন সঙ্গীতে আপনি বিভল
আকুল অধীর সুখে—
কোথা হ'তে এক অন্ত বিহীন
গীত এসে পড়ে মুখে
আকুল অধীর সুখে ॥

(৩)

মর্ম্মরি উঠে তরু পল্লব
আকুল স্বনিয়া স্বনিয়া,
(কি যেন) বলিবারে গিয়ে পায়না খুঁজিয়ে
ম্লান ভাষা আসে ফিরিয়া।
এক অন্তবিহীন, রুদ্ধ বেদনা
ফিরিছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
নিশি দিনমান ধরিয়া ॥

(৪)

ফুলবধূ গুলি গুণ্ঠণ টানি
সস্মিত মুখে চাহিয়া,
লুব্ধ সমীর চির চঞ্চল
ফিরিছে তাহারে ঘেরিয়া;
চকিতে লুটিয়া সৌরভ তার.
কুঞ্জে পড়িছে ঢলিয়া
রঙ্গে ভঙ্গে নাচিয়া।

(৫)

কল মুখরিত তরু মর্ম্মর
শ্যামল কুঞ্জ ভবনে
লোলুপ মধুপ ঝঙ্কারি ফিরে
তরুণী কুসুম শ্রবণে;
চির উজ্জ্বল লাবণ্য শ্রী
ফুটিছে বিশ্ব আননে;
মধুর কুঞ্জ ভবনে।

(৬)

অনন্তের ছায়া ধরিয়া বক্ষে
হাসিছে গগন নীলিমা,
আকুল জলধি ধরিবারে চাহে
তাহার অসীম মহিমা,
ঊষার আকাশে, এঁকে দেয় রবি
তাহার চরণ শোণিমা,
হাসিছে গগন নীলিমা।

(৭)

—তারি মাঝখানে, কে তুই আসিলি

দ্বিগুণোজ্জ্বল করি,
চির উজ্জ্বল লাবণ্য শ্রী
আপনার মাঝে হরি ?
জগতের শোভা জগতের গান
আপনার মাঝে ধরি
দ্বিগুণোজ্জ্বল করি ?

(৮)

তুই কোন্ নন্দনের পারিজাত ফুল
সন্ধ্যাকাশের তারা,
আপনার মাঝে, আপনি নিলীন
আপন সৌরভে সারা ?
কোন্ অমর ত্রিদিব, হ'য়ে আছে ম্লান
হইয়া তোমায় হারা ?
কোন্ সন্ধ্যাকাশের তারা ?

(৯)

হেথা রৌদ্র রঙ্গ, মহা অশান্ত
দারুণ হট্টগোল,
চারিদিকে শত মুখে শত রাগে
উঠে ভৈরব রোল;
এর মাঝে শুধু চির সুললিত
তোর ও মধুর বোল,
হেথা দারুণ হট্টগোল !

(১০)

হেথা শুধু হাহাকার শুধু আর্ত্তনাদ
শুধুই রোদন রব,
শকুনি গৃধিনী করে টানাটানি

লইয়া গলিত শব,
হেথা শুধু ব্যথিতের, শুধু দানবের
আর্ত্ত ভীষণ রব,
বড় নির্ম্মম সব !

(১১)

তারি মাঝ খানে; আসিলি কি ক'রে
মোদের ধরণী তীরে,
নন্দন বনে খেলিবারে যেতে
পথ ভুলেছিস্ কিরে ?
ওই রক্ত চরণ স্পর্শ লোলুপ
উদয়াচল শিরে
উদে উষা যথা ধীরে ?

(১২)

তুমি এই কঠিনতা এই মলিনতা
দিবে কি ধৌত করি,
ওই নব নির্ম্মল অরুণ আভায়
সব প্রোজ্জ্বল করি ?
তাই বুঝি এলি, করুণা রূপিণি
নন্দন পরিহরি,
করুণা-বসন পরি !

(১৩)

কত জীবনের ধারা, অকূল আঁধারে
বহিছে রে তোর মাঝে,
দূর ভবিষ্যের উষার আলোক
তোর ও মুখেতে রাজে;
এক মহান বিষাণ জীমূত মন্দ্র
ঐ ক্রন্দন পাছে বাজে ॥

(১৪)

—তবে আজিকার এই উৎসব রোল
উথলুক চিরকাল,
আজিকার এই মঙ্গল ধ্বনি
বাজাক আনন্দ তাল;
আজিকার এই রম্য প্রভাত
হর্ষ-কিরীট-ভাল,
থাক আজীবন কাল।

(১৫)

এ উষা শান্ত হৌক্ অনন্ত
তোর ও জীবন পরে,
রিক্ত হস্তে আসিবে যাহারা
ফিরিবে পূর্ণ করে;
চাহিয়ো তখন যবে একদিন
দাঁড়াইব তোর দ্বারে—
আমার শূন্য জীবন পরে।—

(১৬)

—আজি ও করকমলে উপযোগী তব
কি দিব বলরে আনি,
এ ধূলিধূসর মলিন ধরার
অয়ি বাসন্তি রাণি;
ধর মাসীমার অশ্রুসিক্ত
কবিতা-মাল্য খানি
আমি কি দিব বলরে আনি!!

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ।

—•—

দ্বিতীয় যুগের নবদ্বীপ।

বাঙ্গালী জাতির শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা, সাহিত্য, সমাজ সংস্কার, ধর্ম্ম চিন্তা প্রভৃতি বিষয়ে কোনও কথা লিখিতে বা বলিতে হইলে, ভাগীরথী তীরবর্ত্তী প্রাচীন নবদ্বীপের কথা মনে হয়। বাঙ্গালী জাতির উন্নতির ইতিহাসের সহিত প্রাচীন নবদ্বীপের ইতিহাস এরূপ অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযোজিত যে, নবদ্বীপের নাম উহ্য রাখিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির বিস্তৃত বিবৃতি দেওয়া কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠে। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা দেশের অথবা বাঙ্গালী জাতির প্রকৃত ইতিহাস নাই; সমগ্র বাঙ্গালা দেশের কেন, বঙ্গের কোনও জেলারই বিস্তৃত ও প্রকৃত ইতিহাস এপর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহাও দক্ষিণ কেন্দ্রের তুষারাবৃত জলজ শৈবালপ্রসূনের ন্যায় অপরিস্ফুট এবং অপরিস্কৃত, সুতরাং নবদ্বীপের ঐতিহাসিক তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিবার অভিপ্রায় আমার নাই। নবদ্বীপ, বাঙ্গালী জাতির বিদ্যা শিক্ষার প্রসূতি; নবদ্বীপ, বাঙ্গালা দেশের জ্ঞানের আকর; নবদ্বীপ, দীশক্তি সম্পন্ন বাঙ্গালী জাতির মস্তিষ্কের তীক্ষ্ণ মেধা। সমগ্র বঙ্গের অথবা সমগ্র ভারতের কেন, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে প্রাচীন নবদ্বীপ মহাগৌরবের লীলা স্থল! আফ্রিকার আল্ অজ্হর্, গ্রীশের এথিনিয়া (Athenia), বিলাতের অক্স্ফোর্ড বা কেম্ব্রিজ, ইটালীর ভ্যাটিকান্ (Vatican), স্পেণের এশ্কুয়েল, জর্ম্মণির লিপ্জীগ্ অথবা ভারতমধ্যস্থিত কাশীধামের কুইন্স্ কলেজ কিম্বা আলিগড়ের আংগ্লো ওরিয়েন্টল মহম্মদীয় কলেজ যদি পৃথিবীর বর্ত্তমান সভ্যজাতিদিগের সুশিক্ষার গৌরবস্থল হয়, তাহা হইলে এই সকলের একত্রিত গৌরব অপেক্ষা প্রাচীন নবদ্বীপ অধিকতর গৌরবময় ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার অণুমাত্রও কারণ নাই। কিন্তু আমরা যে নবদ্বীপের কথা বলিতেছি, তাহা দ্বিতীয় যুগের নবদ্বীপ। এস্থলে "যুগ" শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। নবদ্বীপের আদি ইতিহাস অবশ্যই অজ্ঞাত; 'নবদ্বীপ' বলিলে কোনও নূতন দ্বীপ বলিয়া যাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের সহিত আমাদের মত ভেদ আছে,

কারণ এই 'নব' বা 'নূতন' শব্দের প্রকৃত অর্থ করিতে হইলে নব শব্দের অর্থ 'প্রাচীন' হইয়া পড়ে। আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি, সে যুগ বর্ত্তমানি যুগ নহে অথবা শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের পরবর্ত্তী সময়ের কথা বলিতেছি না। দ্বিতীয় যুগ অর্থে, চৈতন্যমহাপ্রভুর জন্ম গ্রহণের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়কে বুঝিতে হইবে।

"চৈতন্যভাগবৎ"কার লিখিয়াছেন, "নবদ্বীপের একটি ঘাটে সূর্য্যোদয় হইতে রাত্রি দশম ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রতি দিন গড়ে সার্দ্ধৈক লক্ষ লোক স্নান করিত; গঙ্গাপূজা বা "গ্রহণ" অথবা অন্য কোনও উৎসবের সময়ে প্রায় একবিংশতি প্রধান প্রধান ঘাটে চতুর্দ্দশ লক্ষ লোক স্নান করিয়াছে, ইহা দেখা গিয়াছে।" গৌড়ের হিন্দু রাজা সুবুদ্ধি রায় এবং তৎপরবর্ত্তী মুসলমান নরপতি হোসেন সা (খৃষ্টীয় ১৪৯৮) মহাশয়দিগের সমসাময়িক গ্রন্থাবলীতে একথার প্রমাণ আছে। হণ্টার সাহেব বলেন, বর্ত্তমান কলিকাতার লোকসংখ্যা অপেক্ষা সে সময়ের নবদ্বীপের লোকসংখ্যা চতুর্গুণ অধিক ছিল। নবদ্বীপ কোনও সময়ে সমগ্র বঙ্গের রাজধানী ছিল না অথবা বাণিজ্য বা ব্যবসার জন্য ইহা কখনও প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই— It was famous as a seat of learning; in fact, in that respect the most famous city in the world. সমগ্র নগরে 'শিক্ষা' 'শিক্ষা' ভিন্ন আর কোনও চিৎকার শুনা যাইত না। নৌকার নাবিক, রাজবর্ত্মের বিপণিকার, নৃত্যকারিণী অভিসারিণী অথবা ক্রীড়ালীল বালক, যাহাকেই দেখ, সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা সকলেরই মুখে শুনিতে পাইবে। গল্পে, তামাসায়, বিবাদে, বিসম্বাদে, হাস্যে, কৌতুকে, সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চ্চা সর্ব্বত্রই পরিদৃশ্যমান হইত। সামান্য সামান্য জাতির অশিক্ষিত লোকদিগের মুখেও কথায় কথায় সংস্কৃত শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত শুনিতে পাওয়া যাইত। জনৈক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "The one absorbing idea was the acquisition of knowledge. The old and the young, among the higher classes, were constantly engaged in intellectual pursuits, as if there was no other business in the world." ধনলাভের চেষ্টা, রাজনীতির চর্চ্চা, যুদ্ধের সমাচার অথবা মুসলমান শাসনের দোষ গুণ নবদ্বীপবাসীদের হৃদয়কে

স্পর্শ করিতে পারিত না; 'শিক্ষা' ভিন্ন অন্য কোনও কথা যেন তাঁহাদের অভিধানে ছিল না বলিয়া বোধ হয়। চাকুরী করা, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণের পক্ষে নর-পুরীষাপেক্ষা ঘৃণিত বলিয়া বিবেচিত হইত। সুরাপান মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং সে সময়ে নবদ্বীপ নগরে অথবা ইহার পঞ্চক্রোশ মধ্যে সুরার দোকান ছিল না। জনৈক বৈষ্ণব সুলেখক লিখিয়াছেন The Pundits and students of Nuddea had such an aversion for sensual pleasures that no liquor shop was permitted to be established in the City. টমাশ কার্লাইল বলেন Morality as regards study is, as in all other things, the primary Consideration, and over rules all others. কথাটি সত্য এবং সারগর্ভ; নবদ্বীপের শিক্ষক ও ছাত্র নৈতিক চরিত্রে বলীয়ান ছিলেন, তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। "কুকুরে এবং চাকরে সমান" এই প্রাচীন প্রবাদ নবদ্বীপের টোলের শিক্ষিত ছাত্রেরাই প্রথমে উচ্চারণ করেন, ক্রমে রূপ সনাতন সে কথার জলন্ত ও জীবন্ত কার্য্যকারীতা দেখাইয়াছিলেন। নবদ্বীপের ছাত্রের স্বাধীনতা প্রিয়তা খুব প্রশংসনীয়।

নবদ্বীপের পণ্ডিতদের মতে, জ্ঞানই কর্ম্ম, জ্ঞানই ধর্ম্ম এবং জ্ঞানই মোক্ষ। জ্ঞানলাভ করা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ও চরম উদ্দেশ্য, ইহাই পণ্ডিতদিগের অভিমতি। বালকেরা চতুর্থ বৎসর বয়ক্রমকালে শিক্ষামন্দিরে প্রেরিত হইত এবং কিছু শিখিতে সক্ষম না হইলেও পাঠার্থীদিগের সহিত বসিয়া থাকিত, ইহাতে অতি শিশুকাল হইতে বালকের শিক্ষার প্রবৃত্তি সমূহ প্রবলা হইয়া উঠিত; এখন যাহাকে 'ডিসিপ্লিণ' বলে তাহাও শিশুরা ক্রমে ক্রমে শিক্ষা করিত। সৌন্দর্য্য, বেশভূষা, ধন, সম্পত্তি, উচ্চপদ, ক্ষমতা, প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি ছিল না, কেবল চতুর্দ্দিকে 'শিক্ষা' 'শিক্ষা' ভিন্ন আর কিছুই দৃশ্য হইত না। নামাবলী গায়ে দিয়া, নগ্নপদে, নগ্নশিরে, সামান্য দেশীধূতী পরিয়া, বাহাড়ম্বের চিহ্নমাত্র না রাখিয়া, শিক্ষকেরা অধ্যাপনা করিতে আসিতেন এবং বিদ্যার্থীরা খোলাগায়ে অধ্যয়ন করিতে আসিত। পিতারা ভগবানের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিত "ভগবন!

দয়াময়! দেখ যেন আমার সন্তানটি শিক্ষিত হয়"; স্নেহময়ী জননী মহাশয়া জগদম্বার দিকে চাহিয়া করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন "দেখ মা! অভয়ে! আমার কন্যাটি যেন শিক্ষিত যুবার হাতে অর্পিত হয়।"

পণ্ডিতেরা নানা উপায়ে প্রতিপালিত হইত, সুতরাং অন্ন বস্ত্রের চিন্তা কাহারও ছিল না। গুণগ্রাহী এবং বিদ্যোৎসাহীকে উৎসাহ দেওয়া সেকালের ধনবান গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম ছিল। সাধুর সেবা, ভগবানের পূজা এবং পণ্ডিতের প্রতিপালন, সেকালে হিন্দু গৃহস্থের নিত্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। মুসলমানেরাও হিন্দু পণ্ডিতদিগকে সাহায্য করিতেন। মুসলমানেরা সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি জন্য সময়ে সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সেকালের পণ্ডিতকে দেখিলে, হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই সম্মান করিত। বিদ্যা চর্চ্চা জন্য সেকালের নবদ্বীপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। অসংখ্যাসংখ্য ছাত্র ও অসংখ্যাসংখ্য শিক্ষকের বাটীর সম্মুখে তখন "বিদ্যাই ধর্ম্ম" "বিদ্যাই কর্ম্ম" "জ্ঞান হইতেই মোক্ষ" প্রভৃতি কথা লেখা থাকিত। হিন্দুদের দেখা দেখি মুসলমান মৌলবীগণও তাঁহাদের বাটীর সম্মুখে, পারস্যকবি সেখ সাদির বিরচিত

"বে-য়েলেম্ না তোঁয়া খোঁদা রা সনাক্‌ৎ"।

কবিতা লিখিয়া রাখিতেন। হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাজারে, সর্ব্বত্র বিদ্যার্থী দেখা যাইত। সভা, সমিতি প্রভৃতির অভাব ছিল না; ন্যায়ের কচ্‌কচি, বেদান্তের বক্‌বকাও, ব্যাকরণের বিতণ্ডা, দর্শনের দলাদলি, এসকল নিত্য কর্ম্ম ছিল। যেখানেই যাও টুলো পণ্ডিতদিগের অথবা তাঁহাদের ছাত্রদের কিম্বা তৎপক্ষীয় লোকদিগের বিচারেরও বিতর্কের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে। পণ্ডিতদের দলাদলি লইয়া প্রায়ই হাতাহাতি লড়াই পর্য্যন্ত হইয়া যাইত; অবশ্য একথা স্বীকার্য্য, পণ্ডিত বা তাঁহাদের আত্মম্ভরীতা এবং অধৈর্য্য অনেক সময়ে তাঁহাদের অপ্রশংসার কারণ ছিল। ঘাটে স্নান করিতে গিয়া টোলের বিদ্যার্থীরা শাস্ত্র লইয়া এমন বাদানুবাদ করিত যে, কোনও কোনও সময়ে পরাজিত সম্প্রদায়কে বাধ্য হইয়া গোপনে সন্তরণ দ্বারা ভাগিরথী অতিক্রম

করতঃ পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে হইত। "চৈতন্যভাগবত"কার লিখিয়াছেন তাঁহার পিতামহের সময়ে, নবদ্বীপে সাতশত টোল ছিল। বৃন্দাবন ঠাকুর স্বচক্ষে টোল দেখিয়া লিখিয়াছেন, "প্রতি দিনে নানা দেশ হইতে সহস্র সহস্র বিদ্যার্থীকে নবদ্বীপে আসিতে ও পড়িতে দেখিয়াছি। সহস্র সহস্র লোক, অন্যস্থানে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া নবদ্বীপে পরিক্ষা দিতে আসিত। নবদ্বীপে না আসিলে কাহারও লেখা পড়ার শেষ হইত না।" নবদ্বীপের বর্ণনা করিতে গিয়া জনৈক লেখক লিখিয়াছেন "Thousands came to the city from all parts of India, some to begin and some to finish their education, and thousands left every day after having obtained their diplomas. The student who had been educated as far as possible elsewhere, felt bound to come to Nabadwip to complete his education and obtain a diploma, without which he could not hope to attain to any considerable status in society."

কেহ পণ্ডিতদিগের সাক্ষাৎ করিতে বা বিচার করিতে আসিত, কেহ বা বিদ্যার্থীদিগের শিক্ষা প্রণালী দেখিতে আসিত, কেহ বা কোনও দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য নবদ্বীপে উপনীত হইত অথবা কেহ বা তাঁহার বিদ্যার্থী পুত্রকে দেখিবার জন্য আগমন করিত। এই রূপে নবদ্বীপে নানা কারণে বহুলোকের সমাগম হইত; ভাদ্রের তরঙ্গভরা ভাগিরথীর ন্যায় নবদ্বীপ নগর লোকে ভরা থাকিত। প্রত্যেক গলিতে টোলের অস্তিত্ব ছিল। ছাত্রদের নিকট হইতে ফিজ্ স্বরূপে অর্থ গ্রহণ করার নিয়ম ছিল না। কেহ লেখা পড়া শিখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে তাহাকে লেখা পড়া না শিখাইলে মহা অধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। টোলের ছাত্রদিগকে পণ্ডিতেরা বিনা বেতনে পড়াইতেন এবং অনেক ছাত্রকে খাইতেও দিতেন। যে টোলে অধ্যাপকের সংখ্যা অধিক থাকিত না, সে টোলে বড় বড় ছাত্রেরা ছোট ছোট ছাত্রদিগকে অবকাশ মত পড়াইয়া দিত।

কাব্য, দর্শণ, অলঙ্কার, ছন্দ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, স্মৃতি, সংহিতা, বেদান্ত, উপনিষদ, ত্রিবেদ এই সকল বিষয়ের আলোচনা

অধিকতর রূপে সেকালের নবদ্বীপের টোলসমূহে দেখা যাইত। ন্যায়ের আলোচনার সূত্রপাত তখনও হয় নাই। বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা মিথিলায় গিয়া ন্যায় শিখিয়া আসিতেন এবং সেই জন্য মিথিলাবাসীদিগকে 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। মিথিলার পণ্ডিতেরা বাঙ্গালীর অসাধারণ ধীশক্তি দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, "বাঙ্গালী জাতিকে সকল বিষয়েই অসাধারণ পণ্ডিত দেখিতেছি কিন্তু তাহাদের দেশে ন্যায় শাস্ত্র নাই। ন্যায় আমাদের হাতে থাকুক, তাহা হইলে উহারা আমাদের নিকটে শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকিবে।" এই সময়ে নবদ্বীপে পণ্ডিত রামভদ্র ন্যায়ের টোল স্থাপন করেন কিন্তু ন্যায়ের গ্রন্থ না থাকায় মুখে মুখে ন্যায়ের সূত্র সামান্যরূপে শিক্ষা দেওয়া হইত। বাসুদেব সার্ব্বভৌম নামে সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যার্থী মিথিলায় গিয়া ন্যায় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিতে লাগিলেন। তিনি তথায় ন্যায় শাস্ত্রের প্রথম শ্লোকের প্রথম অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ সূত্রের শেষ শ্লোক পর্য্যন্ত এমন আশ্চর্য্যরূপে মুখস্থ করিয়া লইলেন যে, নবদ্বীপে আসিয়া তাহা গ্রন্থাকারে লিখিয়া ন্যায় শাস্ত্রের আলোচনা জন্য এক প্রকাণ্ড নৈয়ায়িক টোল স্থাপন করেন। একজন লেখক লিখিয়াছেন This almost super-human feat of Basudev Sarvavowm immortalised his fame. এই বিদ্যার্থী বাসুদেব পরিশেষে কেবল বঙ্গের নহে, কেবল ভারতের নহে, সমগ্র জগতের মধ্যে একজন অনন্যসাধারণ মহাপ্রাজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের "ন্যায় শাস্ত্র" শিক্ষা করিয়া মিথিলা হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন কিন্তু কিছু কাল পরেই "চিন্তামণি" নামে এক প্রকাণ্ড নৈয়ায়িক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তদনন্তর রঘুনন্দন এই ন্যায় হইতে জগদ্বিখ্যাত "দীধিতি" গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন, কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রশাস্ত্রও এই দীধিতির ফল স্বরূপ। রঘুনন্দনের গ্রন্থ ২৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত। "Didheeti is perhaps the subtlest book that has ever been produced in any language. Raghunandan's code of laws is regarded as the highest authority in Bengal. The works which the professors of Sarvavowm's college have left behind excite the wonder of mankind "— Babu Sisir Kumar Ghosh (A. B. Patrika)

সার্ব্বভৌমের যশোরাশি যখন সমগ্র ভারতবর্ষ ছাইয়া উঠিল, তখন পুণা, কাশী, জয়পুর, উজ্জয়িনী, কাঞ্চি, দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থান হইতে বিদ্যার্থীরা নবদ্বীপে ন্যায় পড়িতে আসিতে লাগিলেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমকে লইয়া গিয়া পুরীধামে এক প্রকাণ্ড টোল স্থাপন করেন। সার্ব্বভৌমের বিহণে নবদ্বীপের রবি ক্রমে মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। তাঁহার বিদ্যালয়ে যে সকল জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যার্থী রূপে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেশব ভারতী অন্যতম। মহাত্মা কেশব ভারতীর পিতা নবদ্বীপের একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। কেশবভারতী নানা বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করিয়া অবশেষে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বণ করেন, সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মাধবেন্দ্র পুরী কেশব ভারতীর সহাধ্যায়ী। এই কেশব ভারতী, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য গৌরাঙ্গদেবের দীক্ষাগুরু। সার্ব্বভৌমের শিক্ষা মন্দিরে জগন্নাথ মিশ্র নামে শ্রীহট্ট দেশীয় এক ব্রাহ্মণ ছাত্র পাঠ করিতেন, ক্রমে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হয়েন; এই জগন্নাথ মিশ্র মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের পিতা। এই নবদ্বীপে চৈতন্যদেবও বিদ্যার্থী ছিলেন এবং নবদ্বীপে পড়িয়াই তিনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মহাপণ্ডিত হইয়া উঠেন। কেশব ভারতী, গৈরিক বসনধারী বাঙ্গালী "ভারতী"দিগের একপ্রকার গুরু। এখন নবদ্বীপ আর সে নবদ্বীপ নহে, এখন সেখানে বাসুদেব সার্ব্বভৌম নাই, কেশব ভারতী নাই, চৈতন্যপ্রভু নাই;— আছে কেবল দলাদলি, ন্যাড়ানেড়ি এবং সময়-সেবক অর্থপিপাসুদলের কোলাহল।

সমাপ্ত।

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

পাপ।

ক্রমান্বয়ে তিনবার বি-এ, ফেল করিয়া প্রভাতকুমার পড়াশুনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখন বাড়ীতে বসিয়া আছে। প্রভাতদের অবস্থা ভাল,— ২০।২৫

হাজার টাকা লাভের জমিদারী, কলিকাতায় দুই তিনটি বাড়ী, তিন চার রকমের গাড়ী, অগণিত দাস দাসী প্রভৃতি বড় লোকের যাহা থাকা উচিত এবং যাহা প্রয়োজন তাহাদের তাহার কিছুরই অভাব নাই।

প্রভাতের বিবাহ হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের শ্রীরামপুর ষ্টেসনের অনতিদূরে তাহার শ্বশুরবাড়ী। স্ত্রী কুসুমকুমারীর 'সুমত্ত' বয়স—অনুমান ১৭।১৮ বৎসর। রূপও যে একবারে নাই তাহা নহে। ভাদ্রের ভরাগঙ্গার মত সে রূপ উছলি উছলি পড়িতেছে।

কিয়দ্দিবস হইল কুসুম সহোদরের বিবাহ উপলক্ষে পিত্রালয়ে আসিয়াছে। আসিবার সময় প্রভাতকে সঙ্গে আসিতে কুসুম কত অনুনয় বিনয় করিল, কিন্তু কেন যে প্রভাত আসিতে স্বীকৃত হইল না, তাহা জানি না। তাহার সকল অনুনয় ব্যর্থ হইলে কুসুম মুক্তাফল সদৃশ দুই ফোটা অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ক্ষুণ্ণমনে স্বামীর নিকট বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিল। প্রভাত গাড়ীর দ্বার রুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়া কুসুমের কাণে কি বলিয়া দিল, কুসুমও মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। পরে দরজা বন্ধ হইল। অশ্বযান হাওড়া ষ্টেসনাভিমুখে ধাবিত হইল। একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস, যেন প্রভাতের হৃদয় বেদনা কতকপরিমাণে লাঘব করিয়া অনন্তে বিলীন হইয়া গেল। প্রভাত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

কুসুম পিত্রালয়ে যাওয়ার পর হইতে, তাহাকে প্রত্যহ একখানি করিয়া পত্র লিখা প্রভাতের একটি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম হইল। সংসারের কোন কাজ তাহাকে করিতে হয় না। নিজেরই এটা ওটা সেটা করিতে দিন কাটিয়া যায়। তবে তাহাকে প্রত্যহ একটি অতি প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইত বটে;—তাহাকে ঔষধ খাইতে হইত! বিশ্ব বিদ্যালয়ের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মানসে প্রভাত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে। তাহার ফলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে ত পারিলই না, পরন্তু পৈত্রিক প্রাণটা শুদ্ধ হারাইতে বসিল! চক্ষের জ্যোতি হ্রাস হইল, পরিপাক শক্তি ক্ষীণ হইল, মাথা ঘুরিতে আরম্ভ করিল। পুত্রের অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া বৃদ্ধ হরিচরণ একদিন তাহাকে বলিলেন,—

"বাবা, তোমার আর পড়িয়া শুনিয়া কাজ নাই,— শরীরটা একবারে

মাটী হইতে চলিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তোমার যে দু'চার পয়সা আছে তাহাতেই একরূপ বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন চলিয়া যাইবে।" পুত্রও তাহাতে দ্বিরুক্তি করিল না।

* * * *

আজ প্রভাতের একটু বেশী অসুখ করিয়াছে,— মাথাটা বেশীর ভাগ ঘুরিতেছে। প্রত্যহ প্রাতঃকাল নয়টার ডেলিভারিতে প্রভাত কুসুমের পত্র পাইয়া থাকে, আজ তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তৎপর ১০টা, ১১টা, ১২টা ক্রমে ক্রমে সবগুলি বাজিয়া গেল তবুও প্রণয়িনীর পত্র আসিল না। প্রভাতের মস্তিষ্কমধ্যস্থ চঞ্চল হইয়া উঠিল,—মস্তিষ্কের ক্রিয়া দ্রুত চলিতে লাগিল, তাহার ফলে বেলা তিনটা না বাজিতেই প্রভাত অবসন্ন দেহে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। অনেকক্ষণ শুইয়া রহিল। পাতাটি নড়িলে, বায়ু একটু বেগে প্রবাহিত হইলে প্রভাত উৎফুল্ল হইয়া উঠে, ভাবে ঐবুঝি কেহ কুসুমের পত্র লইয়া আসিতেছে, কিন্তু বৃথা আশা! তখন তাহার মনে হইতে লাগিল,—

জানে কাঁদি তার তরে,
তবু সে বিলম্ব করে—
রমণী নিদয়!

রাত্রিতে প্রভাত আর কিছু আহার করিল না। রজনীতে তাহার বৃদ্ধা মাতা তাহার শয়ন কক্ষে আসিয়া কিছু আহার করিতে কতবার অনুরোধ করিলেন, প্রভাত প্রত্যেকবারই মাথার বেশী অসুখ করিয়াছে বলিয়া তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিল। পুত্র আহার করিতে নিতান্ত অসম্মতি প্রকাশ করিলে, মাতা বলিলেন,—

একটু দুধজলই না হয় খাও?
না, মা, দুধও খাব না।
একবারে উপোস পেড়ে রইবে?
হাঁ, কিছু খেতে ইচ্ছা কচ্চে না।
রেতে উপোস পাড়তে নেই!
কে বল্লে নেই?—না হয় শুধু একটু জল দাও।

বৃদ্ধার দক্ষিণ হস্তে হরিনামের ঝোলা ছিল— হরিনাম করিতেছিলেন। তিনি ঐ অবস্থাতেই বাম হস্তে জলের গ্লাস ধরিয়া প্রভাতের শয্যার নিকট গেলেন। প্রভাত অর্দ্ধউত্থিতাবস্থায় একটু জল পান করিয়া পুণরায় শয়ন করিল। তাহাকে শয়ন করিতে দেখিয়া বৃদ্ধা বলিলেন,—"বাবা, একটুখানি রস। জল খেয়ে খেয়েই সুতে হয় না মাথায় জলভার হবে।"

পুত্র একটু বিরক্তির সুরে বলিল,—

"তোমার নিকট যত রাজ্যের সৃষ্টি ছাড়া শাস্তোর!"

মাতা কিছু অপ্রতিভ হইয়া, "তবে শও, তবে শও" বলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। প্রভাতও পাশ ফিরিয়া শয়ন করিয়া ভাবরাজ্যে ভ্রমণোদ্দেশে বহির্গত হইল। কত কথাই মনে হইতে লাগিল। কখনও ভাবে,—"কুসুম,—আমার কুসি বড় সুন্দর; তুমি

যেখানে যখন থাক, ভজিব তোমারে;
যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে,
প্রেমের প্রতিমা তুমি আলোক আঁধারে।
অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি শ্রেষ্ঠ মঠে,—
সতত সঙ্গিনী মোর সংসার মাঝারে।

আবার কখনও ভাবে—

কুসুম,
তুমি প্রাণ, তুমি ধন, তুমি মন, তুমি জন,
নিকটে যেক্ষণ থাক সেইক্ষণ ভাললো,
যতজন আর আছে, তুচ্ছ ধরি তোমা কাছে
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কালো লো।

যাহা হউক প্রভাতকে বেশিক্ষণ আর এ চিন্তায় কষ্ট পাইতে হইল না। অচিরেই দুঃখ সন্তাপ-চিন্তা প্রশমিনী-নিদ্রা আসিয়া তাহার অপাঙ্গে আবির্ভূত হইলেন। সে অচিরকাল মধ্যে চিন্তা ভুলিল, কুসুমকে ভুলিল, নিজকে ভুলিল— এমন কি বিশ্ব সংসারকে ভুলিল!

পর দিবস প্রভাতের নিদ্রাভঙ্গ হইতে বিলম্ব হইল। বেলা নয়টার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া সে দেখিল, পার্শ্বের গৃহে তাহার পিতা ও চিকিৎসক

মহাশয় তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। প্রভাত হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া ডাক্তারকে অসুখের কথা বলিলেন। ডাক্তার তাহার 'চেষ্ট' ও 'ব্যাক্' পরীক্ষা করণান্তর প্রেসক্রিপসান করিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় প্রভাতের পিতাকে বলিয়া গেলেন,—"চিন্তার কারণ কিছুই নাই, এই ঔষধ আনাইয়া নিয়মিতরূপে খাওয়ান, ব্যারাম সারিয়া যাইবে। অত্যধিক মানসিক চিন্তাতে এরূপ হইয়াছে।"

* * * * *

ক্রমে এক দিন গেল, দুই দিন গেল, তিন দিন গেল তবুও কুসুমের পত্র আসিল না। প্রভাত ভাবি একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে মনে করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। কোন মতেই মনকে বাগে রাখিতে পারিল না। শেষে শ্রীরামপুরে যাওয়াই স্থির করিল। ৫টার আফিসট্রেনে যাওয়ার বন্দোবস্ত হইল।

মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়া প্রভাত নীচের বৈঠকখানা ঘরে শয়ন করিয়া জনের গ্রন্থাবলীর পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে অর্দ্ধস্পষ্টকণ্ঠে বলিল,—

"Greater love hath no man than this,
That a man lay down his life for his friends."

প্রেম অতি পবিত্র। যে "আপনা ভুলিয়া পরেতে মিশাতে পারে" সেই প্রকৃত প্রেমিক। আমার সে শিক্ষা হইয়াছে কি? আত্মত্যাগই ভালবাসা। আমি কি আত্মবলিদান দিতে পারিয়াছি? না,— আমার এত আত্মত্যাগ নহে, আত্ম প্রতিষ্ঠা! হায়,—

প্রভাত এইরূপে চিন্তা করিতেছে এমন সময় ডাক হরকরা গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার হস্তে একখানি পত্র অর্পণ করিল। হস্তাক্ষর দেখিয়া পত্রখানি কাহার লিখিত তাহা জানিতে আর তাহার বিলম্ব হইল না। সে তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়িয়া পত্র পড়িল,—

"প্রিয়তম!

কেন যে তোমাকে এ কয়দিন পত্র লিখিনাই, তাহা বোধ হয় জান না। কেমন করিয়াই বা জানিবে? আমি অতি গুরুতর পাপ করিয়াছি!

আমার এ পাপের ক্ষমা নাই— প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি আর তোমাকে স্পর্শ করিবারও যোগ্যা নহি। এ পাপমুখ তোমাকে দেখাইতে আর ইচ্ছা নাই। কেমন আছ? ইতি

"পাপিষ্ঠা—

কুসুম।"

একি! একি আমার কুসুমের পত্র? আমার কুসুম ত কখনো কোন পাপ করিতে পারে না,— সে যে নিষ্পাপ! তবে বোধ হয় এ পত্র অন্য কাহারো হইবে? ওহো আমি কি পাগল হইয়াছি!— প্রভাত দুইবার তিনবার পত্রখানি পাঠ করিল, অনিমেষে হস্তাক্ষর অবলোকন করিল,— দেখিয়া কুসুমের হস্তাক্ষর বলিয়াই বোধ হইল। শেষে প্রভাত আর স্থির থাকিতে পারিল না,— তাহার আসন টলিল! তখনি— তখনি যাত্রার বন্দোবস্ত হইল। বাষ্পীয় শকটের জন্য আর অপেক্ষা করিতে পারিল না; তখনি অশ্বযানে শ্রীরামপুরে রওনা হইল।

সন্ধ্যার সময় প্রভাত শ্বশুরালয়ে পৌঁছছিল 'জামাই বাবু আসিছেন; জামাই বাবু আসিয়াছেন' বলিয়া বড়ীতে ভারি একটা সাঁড়া পড়িয়া গেল। তাহার শ্যালকেরা আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। দরজার ফাঁক দিয়া বয়স্থা শ্যালিকাদ্বয় ভগিনীপতিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর জলযোগের ডাক পড়িল। প্রভাত ভিতরে যাইয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে প্রণাম করিয়া জলযোগ করিতে বসিল। খাইতে খাইতে শাশুড়ীর সঙ্গে তাহার দুইএকটি কথা যে না হইল তাহা নহে, তবে তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম না। জলযোগ শেষ হইলে প্রভাত ভিতরের একটি শূন্য প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া শয্যায় উপবেশন করিল। অচিরেই কুসুম তথায় উপস্থিত হইল। কুসুমকে দেখিয়া প্রভাত তাহার হাত ধরিয়া অতি ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—

"কি হইয়াছে বল?"

"আমি অতি গুরুতর পাপ করিয়াছি। আমাকে স্পর্শ করিও না!"

"তুমি কোন পাপ করিতে পারনা, করিলেও ক্ষমার্হ!

না,—তুমি আমাকে যাহা নিষেধ করিয়াছিলে আমি তাহাই করিয়াছি।

আসিবার সময় গাড়ীতে কাণে কাণে যাহা খাইতে নিষেধ করিয়াছিলে, আমি তাহাই খাইয়াছি।"

"কি খাইয়াছ স্পষ্ট করিয়া বল, আমার মনে নাই!"

"আমি গোক্ষাপাতার গুঁড়ো দাঁতে দিয়াছি!"

প্রভাত সহাস্যাননে কুসুমকে বক্ষে টানিয়া লইল।

এই ঘটনার পর হইতে আর কেহ কখনও প্রভাতের মাথার অসুখের কথা শুনে নাই। কুসুমও আর কোন দিন স্বামী ছাড়িয়া কুত্রাপি গমন করে নাই।

প্রবাস-বিদায়।

যে স্নেহ বন্ধনে বাঁধা ছিল এ জীবন
শিথিলিল শেষ গ্রন্থিতার, আজিতোর
বিদায়ের দিনে। অতীতের মধুরতা
চির নির্ব্বাসিত তোর প্রবাস গমনে।
এক দিন জীবনের নবীন প্রভাতে
গ্রথিত যে স্নেহ সূত্রে কল্পনার মালা
সব শুখাইল যদি, বিড়ম্বনা তবে
স্তম্ভিত এ হৃদয়ের শ্রান্ত দীর্ঘশ্বাস!
যে দীপ্ত কামনা হৃদে ধ্রুবতারা সম—
মঙ্গল কবচ তব,— লইছে তোমারে
আজি সুদূর প্রবাসে, ফলিবে সুফল
সংসারের স্নেহ আলিঙ্গনে ভুলে যাবে
সুদীর্ঘ প্রবাস ক্লেশ, পূর্ণ মনস্কাম।

কক্ষভ্রষ্ট গ্রহ সম, এ উদার বিশ্বে,
উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা দৃপ্ত জনস্রোতে পড়ি
ভেসে যাই যদি স্নিগ্ধ শান্ত সুশীতল
মরণের পারে, তখন সে অতীতের
মিলন জীবনে ফিরিয়া চাহিস্ প্রিয়তম।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতম্।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

পণ্ডিত দর্শন।

হাজরা। হাঁ অবশ্য আদেশ পেয়েছেন। কেমন মহাশয়?

পণ্ডিত। না, আদেশ কিছু পাই নাই।

গৃহস্বামী। "না, আদেশ পান নাই বটে, "তবে কর্ত্তব্যবোধে লেক্‌চার দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যে আদেশ পায় নাই, তার লেক্‌চার কি হবে?

একজন (ব্রাহ্ম) লেক্‌চার দিতে দিতে বলেছিল "ভাইরে, আমি কত মদ খেতুম, হেন কর্ত্তুম, তেন কর্ত্তুম।" এই কথা শুনে, লোকগুলো বলাবলি করতে লাগ্‌লো, "শালা বলে কিরে! মদ খেত!" এই কথা বলাতে উল্টো উৎপত্তি হ'ল। তাই ভাল লোক না হ'লে লেক্‌চারে কোন উপকার হয় না।

বরিশালে বাড়ী একজন সদরওয়ালা আমায় বলেছিল "মহাশয়, আপনি প্রচার করতে আরম্ভ করুন। তা যদি করেন, তা' হ'লে আমিও কোমর বাঁধি। আমি বল্‌লাম ওগো, একটা গল্প শোন। ওদেশে হালদার পুকুর ব'লে একটি পুকুর আছে। যত লোক তার পাড়ে বাহ্যে করতো। আর

সকালবেলা যারা পুকুরে আস্‌তো, গালাগালে তাদের ভূত ছাড়িয়ে দিত; কিন্তু গালাগালে কোন কাজ হ'ত না; আবার তার পরদিন সকালে পাড়ে বাহ্যে করেছে, লোকে দেখ্‌তো। কিছুদিন পরে কোম্পানি থেকে যখন একজন চাপরাসী একটা হুকুম পুকুরের কাছে মেরে দিলে; তখন কি আশ্চর্য্য, একেবারে বাহ্যে করা বন্ধ হ'য়ে গেলো।

তাই বল্‌ছি হেঁজিপেঁজি লোকে লেক্‌চার দিলে কিছু কাজ হয় না। চাপরাস থাক্‌লে তবে লোকে মান্‌বে। ঈশ্বরের আদেশ না থাক্‌লে লোক-শিক্ষা হয় না। যে লোক-শিক্ষা দিবে, তার খুব শক্তি চাই। কল্‌কেতায় অনেক হনুমানপুরী আছে,—তা'দের সঙ্গে তোমায় লড়্‌তে হবে। এরা তো (যারা চারিদিকে সভায় বসে আছে) পাঠ্‌ঠা।

চৈতন্যদেব নিজে অবতার। তিনি যা করে গেলেন, তারই কি রয়েছে বল দেখি? আর যে আদেশ পায় নাই তা'র লেক্‌চার কি উপকার হবে আর কি জন্যই বা থাক্‌বে?

[কিরূপে আদেশ পাওয়া যায়]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই বল্‌ছি ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও। এই কথা বলিয়া প্রভু প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গান গাইতে লাগিলেন।

(গান)

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম-রত্নধন॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয়-মাঝে বৃন্দাবন।
দিব্ দিব্ দিব্ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আঁবার সে কোনজন।
কুবির বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ সাগরে ডুব্‌লে মরে না—এ যে অমৃতের সাগর।

[নরেন্দ্র ও অমৃতের সাগর]

আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম—ঈশ্বর রসের সমুদ্র; তুই এ সমুদ্রে ডুব্ দিবি কিনা বল। আচ্ছা মনে কর খুলিতে এক খুলি রস রয়েছে, আর তুই মাছি হয়েছিস। তুই কোথা ব'সে রস খাবি বল? নরেন্দ্র বল্লে, আমি

খুলির আঁড়ায় ব'সে মুখ বাড়িয়ে খা'ব। কেন না বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব যে! তখন আমি বল্‌লাম, বাবা এ সচ্চিদানন্দ-সাগর—এতে মরণের ভয় নাই এ সাগর অমৃতের সাগর। যারা অজ্ঞান তারাই বলে যে ভক্তি প্রেমের বাড়াবাড়ি কর্‌তে নাই। ঈশ্বর প্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে? তাই তোমায় বলি, সচ্চিদানন্দ সাগরে মগ্ন হয়।

ঈশ্বর লাভ হ'লে আর ভাবনা কি? তখন আদেশও হবে, লোক-শিক্ষাও হবে।

—০—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(ঈশ্বর লাভের নানাপথ)

দেখ অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ।

যে কোন প্রকারে হউক, এ সাগরে পড়্‌তে পার্‌লেই হ'ল। মনে কর অমৃতের একটি কুণ্ড আছে। কোন রকমে এই অমৃত একটু মুখে পড়্‌লেই অমর হবে—তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড় বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেবে একটু খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক্। একই ফল। একটু অমৃত আস্বাদন কর্‌লেই তুমি অমর হবে।

অনন্ত পথ—তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি; যে পথ দিয়া যাও, আন্তরিক হ'লে ঈশ্বরকে পাবে।

মোটামুটি যোগ তিন প্রকার;—"জ্ঞানযোগ", "কর্ম্মযোগ", আর "ভক্তিযোগ।"

১। জ্ঞানযোগ—জ্ঞানী ব্রহ্মকে জান্‌তে চায়। নেতিনেতি বিচার করে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই বিচার করে, সদসৎ বিচার করে। বিচারের শেষ যেখানে, সেখানে সমাধি হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

২। কর্ম্মযোগ—কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখার নাম কর্ম্মযোগ। তুমি যা শিখাচ্ছ।

অনাসক্ত হ'য়ে প্রাণায়াম, ধ্যানধারণাদি করা কর্ম্মযোগ। সংসারী লোকেরা যদি অনাসক্ত হয়ে, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে, তাঁতে ভক্তি রেখে সংসারের কর্ম্ম করে, সেও কর্ম্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে পূজা, জপ এই সব কর্ম্ম করার নামও কর্ম্মযোগ।

ঈশ্বর লাভই কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য।

৩। ভক্তিযোগ—ঈশ্বরের নাম গুণকীর্ত্তন এই সব ক'রে, তাঁতে মন রাখার নাম ভক্তিযোগ। কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তি-যোগই যুগধর্ম্ম।

কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। প্রথমতঃ আমি আগেই বলেছি, সময় কৈ? শাস্ত্রে যে সব কর্ম্ম কর্‌তে বলেছে, তার সময় কৈ? কলিতে আয়ু কম।

তার পর অনাসক্ত হয়ে, ফলকামনা না ক'রে কর্ম্ম করা ভারি কঠিন। ঈশ্বর লাভ না কর্‌লে ঠিক অনাসক্ত হওয়া যায় না। তুমি হয়তো জান না, কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে।

আবার জ্ঞানযোগও এ যুগে ভারি কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ, তাতে আবার আয়ু কম। তার পর আবার দেহবুদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহবুদ্ধি না গেলে একেবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী বলে, 'আমি সেই ব্রহ্ম। আমি শরীর নই! আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ এ সকলের পার'।

যদি রোগ শোক, সুখ দুঃখ, এসব বোধ থাকে, তা'হ'লে তুমি জ্ঞানী কেমন করে হবে? এ দিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর করে রক্ত পড়্‌ছে খুব লাগ্‌ছে—অথচ বল্‌ছো, 'কৈ আমার হাত তো কাটে নাই! আমার কি হয়েছে'।

(ভক্তিযোগেই যুগধর্ম্ম; জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ নহে)

তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ আর অন্যান্য পথ দিয়াও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এসব পথ ভারি কঠিন।

ভক্তিযোগ যুগধর্ম্ম—তার এ মানে নয় যে, ভক্ত এক জায়গায় যাবে; জ্ঞানী বা কর্ম্মী আর এক জায়গায় যাবে। মানে এই, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তি-পথ ধরে যান, তা' হ'লেও সেই জ্ঞান লাভ কর্‌বেন। ভক্তবৎসল মনে কর্‌লেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন।

ক্রমশঃ

—০—

অমরজীবন।

জীবন সায়াহ্ন আইল ঘনা'য়ে
নিস্প্রভ বিকল জীবন-রবি
পড়িছে ঢলিয়ে কাল-অম্বুগায়ে
নিস্পন্দ, বিশাল করুণ ছবি!—
মুহূর্ত্তে সুনীল অম্বুরাশিতলে
ডুবিবে, যাইবে কোথা? পরলোকে?
কোথা সেই স্থান? দেখিতে কেমন?
উঠিবে যে সেথা, সুখে কিংবা দুখে?
হেথা হ'তে যাবে ভুলিয়ে কি সব,
বিসর্জ্জিয়া স্মৃতি অম্বুরাশি-নীরে?
বিশ্বও কি তারে— অমনি নিমিষে—
দিবেগো বিদায়?— অমনি অচিরে
লবে প্রক্ষালিয়া বিশুদ্ধ নীরেতে
—বিসর্জ্জিয়া তায়,— হৃদিমন প্রাণ?
বিশ্বাস না হয়! ভেবোনা ওরূপ,
কেমনে সত্যের শীরে বজ্র হান?
তাঁর সুবিশাল ত্রিভুবন ব্যাপী
সার্ব্বজনীন্ সুপ্রশান্ত প্রেম,
(হায়রে স্বর্গীয় পরশ মাণিক,
পরশে যাহার লৌহও হেম!)—
অনন্ত জীবন, স্বর্গীয় ভাবেতে
রাখিবে জাগা'য়ে তাঁহার নাম;
ধরা বুকে রাখি' অনশ্বর প্রেম
গেছে যেগে সেই অমর ধাম!
এবিশ্বের স্মৃতি জড়িত বিষম
তাঁর স্মৃতি সনে;— অনর্গল দ্বার,
বিশাল তোরণে সুউচ্চ সে ধ্বজা
প্রমাণে অমর জীবন তাঁর!

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

মাসিক সার সঙ্কলন।

ভারতী।

কার্ত্তিক, ১৩০৮।

"ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যায়" লেখক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত দেখাইয়াছেন যে, "অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ভূমিকর এক পাউণ্ডে এক সিলিং হইতে চারি সিলিং পর্য্যন্ত ছিল,—অর্থাৎ জমিদারের প্রাপ্য খাজানার উপর শতকরা ৫৲ হইতে ২০৲ অবধি ছিল। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে এই কর স্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন হইয়াছে। কিন্তু ১৭৯৩ হইতে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বঙ্গদেশে জমিদারের প্রাপ্য খাজানার উপর শতকরা ৯০৲ পরিমাণ এবং উত্তর ভারতে ৮০৲ পরিমাণ রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছিল। কর ধার্য্য বিষয়ে ব্রিটিশরাজ যে মুসলমান বাদশাহগনের অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহা সত্য বটে, কিন্তু বিভিন্নতা এই যে মুসলমানরাজ যাহা চাহিতেন তাহা সম্পূর্ণ আদায় করিতেন না, কিন্তু ব্রিটিশরাজ যাহা চাহিলেন তাহা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইলেন। বঙ্গের শেষ মুসলমান রাজা তাঁহার রাজত্বের শেষ বৎসরে (১৭৬৪ খৃঃ) ভূমিকর স্বরূপ ৮১,৭৫,৫৩৩, টাকা আদায় করিয়াছিলেন;—সে সময় হইতে ত্রিশ বৎসরে ইংরাজরাজ বঙ্গের বার্ষিক ভূমিকর ২,৬৮,০০,০০০, টাকা করিয়া তুলিয়াছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব এলাহাবাদ ও অন্য কতিপয় জেলা ইংরাজকে হস্তান্তরিত করেন। এই সকল জেলায় মুসলমান নবাব বার্ষিক ১,৩৫,২৩,৪৭০৲ টাকা দাবী করিতেন। তিন বৎসরের মধ্যে ইংরাজ সেই জেলাগুলি হইতে বার্ষিক ১,৬৮,২৩,৩৬০৲ টাকা আদায় করিলেন। এই দাবীও আদায় গত পার্থক্য ছাড়া আরও একটি বিশেষ পার্থক্য ইংরাজ ও মুসলমান রাজ্যের মধ্যে রহিয়াছে। মুসলমান যাহা আদায় করিতেন তাহা ভারতবর্ষেই ব্যয় করিতেন—দেশের লোকের হস্তে আবার ফিরিয়া যাইত; ইংরাজ যাহা আদায় করেন, তাহার একটি বৃহৎ অংশ ইংলণ্ডে আসিয়া ব্যয়িত হয়। ... হোম চার্জ্জ যাহা বৎসর

বৎসর ভারত গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন, তাহার পরিমাণ ২৪ কোটি টাকা। 'উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণের বেতন— উচ্চ রাজকর্ম্ম বলিতে গেলে সবই ইংরাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত— তাহারও পরিমাণ দশ কিম্বা বার কোটি টাকা। ভারতের বার্ষিক রাজস্ব (Net Revenue) ৬৫ কোটি টাকা তাহার অর্দ্ধাংশ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। * * * বাৎসরিক হাজার টাকা বা তাহার অধিক বেতনের যতগুলি রাজকর্ম্ম আছে তাহাতে বেতন ও পেন্সনে ইংরাজগণ এক কোটি ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড পান, আমরা পাই ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড মাত্র। শিক্ষিত ভারতবাসীর প্রতি ইহা নিতান্ত অবিচার।"

সপ্ত দেব লোক।— লেখক শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষই ভূর্লোক, অন্তরীক্ষ ভুবর্লোক, স্বর্গ (সূর্য্য ও ধ্রুব মধ্যগত স্থানের নাম স্বর্গ) স্বর্লোক, আল্টাই পর্ব্বতের ঠিক্ উত্তরদিকস্থ সাইবিরিয়ার দক্ষিণাংশ ধ্রুবলোক। বর্ত্তমান চীন দেশ জনলোক। ধ্রুবলোক ও জনলোকের অভ্যন্তর ভাগ মহর্লোক। সম্ভবতঃ কোরিয়া ও তৎপশ্চিমস্থ সাইবিরিয়ার কিয়দংশ লইয়া তপোলোক। তপোলোকের পরবর্ত্তীলোক সত্য বা ব্রহ্মলোক। এখানে আদি কবি ব্রহ্মা বাস করেন। এই ব্রহ্মলোক উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণ বেলা পর্য্যন্ত প্রসারিতছিল। ইহার উত্তর ভাগ গ্রীনলণ্ডের সমসূত্রে এক অর্দ্ধাংশে নিমগ্নমান থাকায় এখানে সূর্য্য ৬ মাস উদিত ও ছয় মাস অস্তমিত থাকিত।"— লেখক নিজের উক্তি নিজেই সমর্থন করিতে পারেন নাই। স্থানে স্থানে "সম্ভবতঃ" প্রয়োগ করিয়াছেন। যখন তুমি একটি নূতন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইয়াছ, তখন 'সম্ভবত' বলিলে লোকে শুনিবে কেন? মানিবেই বা কেন?

সুধা।

মাঘ, ১৩০৮।

চারি মাসের 'সুধা' সাহিত্য-ক্ষেত্রে যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইতেছে, তাহাতে তাহার দ্বারা কালে আরও বেশী আশা করা যাইতে পারে। এরূপ স্থলে প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাহাকে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হইবে। একমাসের কাগজে তিনটি ক্রমশঃ উপন্যাস,— নিতান্তই পাঠকগণের উপর ঘোর অত্যাচার। একবারে তিনটি উপন্যাস আরম্ভ করা আমাদের

মতে সমীচীন বোধ হয় না। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন দোষ দেখিতে পাইলাম না। সুধার এগারটি প্রবন্ধই সারগর্ভ। জৈনদের 'দিওয়ালি' উৎসব পড়িয়া তৃপ্ত হইলাম। লেখকের নাম নাই,—কিন্তু জানিতে বেশী কষ্ট হইল না। লেখক বোধ হয় আমাদের সুপরিচিত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী। 'ব্রহ্ম' শব্দ তত্ত্বে মহাভারতী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"ব্রহ্ম শব্দের বৈয়াকরণিক বুৎপত্তি; 'ব্রহ্ম' শব্দ (পুং লিঙ্গ) বৃন্হ ধাতুর উত্তর, কর্ত্তৃবাচ্যে মন্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ হইয়াছে। ই কারে ন কারের লোপ হয়। পাণিনি বলিয়াছেন, বৃহি-বৃদ্ধৌ। অর্থাৎ বৃহিশব্দ বৃদ্ধি অর্থ বাচক। বৃদ্ধি অর্থে সাধারণতঃ অভ্যুদয়, আধিক্য, বিস্তার প্রভৃতি বুঝায়। 'অভ্যুদয়' শব্দের অর্থ প্রকাশ, খৃষ্টানেরা ইহাকে Glorious Manifestation অথবা Glory and wisdom বলে; বাইবেলে সাধু পল লিখিয়াছেন Christ is the express image and effulgence of God's person; Christ is the wisdom of God. বাইবেলের পুরাতন টেস্‌মাণ্ট গ্রন্থে লিখিত আছে, The Creation is the glory of God। এখানে এই সকল শব্দ প্রকাশ বা অভ্যুদয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মুসলমান শাস্ত্রে এই অভ্যুদয়ের নাম জেলাল, হিব্রু ভাষায় ইহার প্রতিশব্দ সেকিনা এবং পুরাণে ইহার নাম চিৎশক্তি। আধিক্য শব্দের অর্থ অপরিসীমা বা অনন্তত্ব, ইংরাজি বিজ্ঞানে ইহা Complete development বা Perfection নামে অভিহিত; আরব্য ভাষায় ইহার নাম য়েনতেহা এবং পারস্য ভাষায় ইহাকে কামালিয়ৎ কহে। বিস্তার শব্দের অর্থ সর্ব্বব্যাপীত্ব, ইউরোপীয় দর্শনে ইহাকে Absolute Possession কহে, পারস্য ভাষায় ইহার নাম হাজির-উল্-নাজিরী এবং ল্যাটিন ভাষায় ইহার প্রতিশব্দ Omni-presence. বৃদ্ধি শব্দের অর্থ যাহার ক্ষয় নাই (অক্ষয়), যাঁহার বয়স সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, যাহার হ্রাস হয় না এবং যাঁহার ক্ষমতা, গুণ, স্থিতি প্রভৃতির যতই বর্ণনা কর বর্ণনার শেষ হয় না, তিনিই প্রকৃত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থাৎ 'বৃদ্ধ'! অন্নদামঙ্গলে কবিবর ভারতচন্দ্র রায় শিবের (ঈশ্বরের) বর্ণনায় বলিয়াছেন—

অতি বড় বৃদ্ধ পতি, সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার, কপালে আগুণ॥

এই কবিতায় "অতি বড় বৃদ্ধ" এই তিন শব্দে, ঈশ্বরের অনাদিত্ব প্রমাণীত হইতেছে, ঈশ্বরাপেক্ষা কাহারও বয়স অধিকতর হইতে পারে কি? এই জন্য তিনি স্বয়ম্ভূনামে অভিহিত, অর্থাৎ তাঁহার জন্মদাতা কেহ নাই, তিনি স্বয়ং সিদ্ধি এবং সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও প্রধান। তাহার পর "সিদ্ধিতে নিপুণ" শব্দই বৃদ্ধি শব্দের গূঢ় অর্থ। সিদ্ধি শব্দের সাধারণ অর্থ ভাং (নেশার দ্রব্য); মধ্যম অর্থে সফলতা বুঝায় এবং গূঢ় অর্থে "সিদ্ধি, ঋদ্ধি এবং একাদশ যোগ" বুঝায়।"

হিন্দুজাতির কামান ব্যবহার।

(২)

কিন্তু মুরদিগের ইউরোপে কামান প্রচলিত করিবার বহু দিন পরে, ইংরেজেরা সবে মাত্র ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম কামান ব্যবহার করেন; সুতরাং ভারতবর্ষে যে অল্পদিন হইতে কামান চলিয়াছে, একথা যে তাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবেন ইহা আশ্চর্য্য কি? কিন্তু রামায়ণে ও মহাভারতে যে শতঘ্নী অস্ত্রের উল্লেখ আছে, তাহা অনেক ইংরেজ গ্রন্থকারদিগের মতেও কামান ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। হ্যালহেড্ মহোদয়, কামান ব্যবহার বিষয়ে নানা তর্ক বিতর্ক করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে, "হিন্দুরা ও চীন দেশীয় লোকেরা কত পুরাকালে বারুদ প্রস্তুত ও ব্যবহার করিতে জানিত যে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন"। কিন্তু শতঘ্নী বিষয়ে নানা প্রকার সন্দেহ থাকিলেও, কবি চন্দ্রের যুদ্ধ বর্ণনা পড়িলে পৃথ্বীরাজের সময়ে যে কামান ব্যবহার হইত, সে বিষয়ে আর আমাদের সন্দেহ থাকিতে পারে না। তিনি কনোজ খণ্ডের এক স্থলে লিখিয়াছেন "কামান সকল হইতে এমন বিকট ধ্বনি এবং তাহার গোলার দ্বারা এমন ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল যে, তাহা দশক্রোশ পর্য্যন্ত শুনা গিয়াছিল।" আবার নয় লক্ষ মুসলমান

নামক কাব্যে যুদ্ধ বর্ণনাস্থলে, তিনি বলিয়াছেন যে "বিষম ভারযুক্ত কামান সমূহ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত ছিল।" এবং আর এক স্থলে লিখিয়াছেন, "কামান সমূহ ও বারুদের থলিকা সকল তিন ক্রোশ পথ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া ছিল।" যে কোনও হিন্দি ভাষাজ্ঞ ইংরেজ গ্রন্থকার কবি চন্দ্রের কোনও কোনও কবিতার অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারাও এই কামান শব্দটি (Cannon) বলিয়া ভাষান্তরিত করিয়াছেন।"

বঙ্গভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক, ভূতপূর্ব্ব "আর্য্যদর্শন" সম্পাদক মাননীয় বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয়, স্বরচিত "কীর্ত্তিমন্দির" নামক পুস্তকের ১৬১ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিয়াছেন,—"চাঁদ কবির কবিতা গ্রন্থে লিখিত আছে যে দিল্লি সমরে, পৃথ্বীরাজও 'কামান' ও 'নলগোলা' ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, যে এই সকল যুদ্ধ ক্ষেত্রীয়, আগ্নেয় গিরি মুখ হইতে, অবিরাম অগ্নি উদ্গীরিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিতেছে যে, হিন্দুরা যুদ্ধ-স্থলে বড় বড় কামান ও গোলা ব্যবহার করিতেন। ইহার পর বিয়ানা যুদ্ধে বাবর কামান ও গোলার অবতারণা করেন।"

খ্যাতি সম্পন্ন উদীয়মান ঐতিহাসিক মাননীয় বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্র বি, এল্, মহোদয় সুস্পষ্টরূপে কিছু না লিখিলেও, "চাঁদকবির বীরগাথার" বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে;—তাঁহার সম্পাদিত "ঐতিহাসিক চিত্র" অভিধেয় ত্রৈমাসিক পত্রিকার, দ্বিতীয় সংখ্যার ২০৬ পৃষ্ঠায় টীপ্পনি আকারে যে কথাগুলি সংযোজিত করিয়াছেন, তাহাতে উপলব্ধি হয় যে, পৃথ্বীরাজ ও মহম্মদ ঘোরীর সংগ্রামে, হিন্দু পক্ষে, কামান ব্যবহার সম্বন্ধে তিনিও আস্থাহীন নহেন। তাঁহার টীপ্পনিটি এইরূপ;—"মহামহোপাধ্যায় শ্যামলদাস বলেন, চাঁদ কবির নামে যে সকল বীরগাথা প্রচলিত আছে, উহা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দিতে রচিত এবং নানা অনৈতিহাসিক কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এ বিষয়ে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটিতে একটি প্রবন্ধও প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাকে অভ্রান্ত মনে করিয়া, সাহিত্য পরিষৎ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, ঐতিহাসিক চিত্রে চাঁদ কবির অনৈতিহাসিক কবিতাগুলিকে স্থানদিতে নিষেধ করিয়া, পত্র লিখিয়াছেন। বলাবাহুল্য আমরা মহামহোপাধ্যায়ের

সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিতে পারি নাই বলিয়াই চাঁদ কবিকে বিসর্জ্জন দিতে পারিতেছি না। অনুবাদ কার্য্য সমাপ্ত হইলে, যথাকালে মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনার, সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।"

হিন্দুজাতির কামান আবিষ্কার ও ব্যবহার সম্বন্ধে, বঙ্গের একজন মনস্বিনী, ও দুইজন মনীষীর মন্তব্য উদ্ধৃত করা গেল। যদিও তাঁহারা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে কামানের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী; তথাপি তাঁহাদের সেই সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত নয়, কতকগুলি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই নিঃসংশয়ে বুঝা যাইবে।

সম্মাননীয়া দেবী মহোদয়া— মহম্মদ ঘোরীসহ যুদ্ধে রাজপুতগণ সর্ব্বপ্রথম কামানের ব্যবহার করিয়াছিলেন; কেবল এই কথাটুকু বলিয়াই নিরস্ত নহেন। রামায়ণ এবং মহাভারতে, শতঘ্নী অস্ত্র প্রয়োগের কথা বর্ণিত আছে, এবং কোন কোন বিদেশীয় ইতিহাসবেত্তা তাহাকে কামান হইলেও হইতে পারে কল্পনা করিয়াছেন দেখিয়া—হিন্দুগণ অতি আদিম কালেও কামান পরিচালনে নিপুণ ছিলেন, এতদ্রূপ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত। নিষ্প্রয়োজন যে, রামায়ণ ও মহাভারতে বিবৃত সংগ্রাম ঘটিবার সমকালে,—আসিরীয়, মিসরীয়, ফিনিসীয়, পারসিক, গ্রীক ও রোমক প্রভৃতি তদানীন্তন সভ্যতম জাতিদের মাত্র, অসি, বর্ষা, ধনুঃ, গদা ইত্যাদি সাংগ্রামিক উপকরণ ছিল; তখন উপযুক্ত কোনও জাতিই আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানিতেন না। জানিলে, পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ; অবশ্যই ভূগর্ভে প্রোথিত, ভগ্নাবশেষ মধ্যে নিহিত, এবং দেবতায়তন ও সৌধাদিতে খোদিত, চিত্রিত, অপরাপর অস্ত্রের ন্যায় আগ্নেয়াস্ত্রেরও সন্ধান পাইতেন। কিন্তু তদ্রূপ কার্য্য সম্পন্ন না হওয়ায়, অন্যান্য প্রাচীনতম সভ্য, শিক্ষিত জাতিগণ যে কামানের নাম গন্ধও জ্ঞাত ছিলেন না, তাহা অসঙ্কোচে বলা যায়। তবু তর্ক উঠিতে পারে যে, অপরাপর আর্য্য জাতি, কামানের ব্যবহার জ্ঞাত ছিলেন না, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইলেও, আর্য্য-হিন্দুর তাহা আবিষ্কারে বা পরিচালনে, কোন বাধা দেখা যায় না। কিন্তু ইহা সর্ব্বথা অসম্ভব। খৃষ্টাব্দ প্রারম্ভের কয়েকশত বৎসর পূর্ব্বে, অগ্র, পশ্চাৎ ভাবে, আসিরিয়ার রাজা অসিরিস, তৎপত্নী শ্যামিয়ামিস্; পারস্যের সম্রাট্ প্রথম দারায়স্, এবং মেসিডোনীয়ার সম্রাট আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ে,

ভারতবর্ষের কতকাংশ জয় করিয়াছিলেন। অবশ্য সেই ব্যাপারে হিন্দুগণের সঙ্গে, তাঁহাদের সংঘর্ষও ঘটিয়াছিল। হিন্দুগণ, তৎসময়ে কামানের ব্যবহার জানিলে, নিশ্চিতই অসি, বর্ষা, ধনু, গদা, ফীঙ্গা, সম্বল, আসিরীয়, পারসীক, এবং গ্রীক জাতি এতদূরদেশে অভিযান করিয়া, হিন্দু পক্ষকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইতেন না। তাহার পর, মহান্ আলেক্‌জাণ্ডারের সেনাপতি পরন্তু তাঁহার জীবনান্তে বাক্‌ট্রিয়ার সম্রাট সেলিউক্‌স নিকেটরের দূত মেগাস্থিনিস্, বহুদিন মগধের সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের রাজ সভায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি হিন্দুজাতির আচার ব্যবহারের, অনেক বাস্তব, অবাস্তব বিবরণ সপ্রণীত ইণ্ডিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে হিন্দুগণের কামান ব্যবহারে অভিজ্ঞতা থাকিলে, তিনি তাহার উল্লেখে বিরত হইতেন না।

আর এক কথা পারসীক, গ্রীক সম্রাটগণও হিন্দুদের নিকট কামানের খোঁজ পাইলে স্ব স্ব সৈন্যশ্রেণী মধ্যে অবশ্যই তাহার প্রচলন করিতেন। পরন্তু গ্রীকগণ হিন্দুর নিকট কামানের নির্ম্মাণ প্রণালী শিখিয়া গেলে, রোমক জাতি তাহার প্রস্তুত ও ব্যবহার নৈপুণ্য শিখিয়া লইতেন নিঃসন্দেহ। এবং রোমক শিক্ষা ও সভ্যতা-প্লাবিত বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতি যে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বহু অগ্রেই, কামানের ব্যবহারে যোগ্যতা লাভে পারগ হইতেন, ইহা অবিশ্বাস্য নয়। কিন্তু তদ্রূপ ঘটিয়াছে কি? এস্থলে একটি আপত্তি এই হইতে পারে যে, বিজাতি বিদ্বেষ বশে পারসীক এবং গ্রীক জাতি হিন্দুদের ব্যবহৃত কামানের প্রচলন নিজ নিজ সম্প্রদায় মধ্যে করেন নাই, এবং অশ্রদ্ধা বশেই, তাহার নির্ম্মাণ কৌশল শিখেন নাই। কিন্তু আপত্তিটির কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি? গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতির আদান প্রদান ব্যাপারে বৈদেশিক জাতিগণ উদারতার পরিচয় দিতে পারিলেন কেবল অত্যাবশ্যক যুদ্ধোপকরণ লইবার বেলাতেই ঘৃণা পরবশ হইলেন একথা কোন সুশিক্ষিত এবং সুবোধ ব্যক্তিরই বিশ্বাস করা উচিত নয়। অতএব প্রমাণীকৃত হইতেছে যে অতি আদিম কাল হইতে চন্দ্রগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত হিন্দু সৈন্য দ্বারা কামান ব্যবহৃত হয় নাই। চন্দ্রগুপ্তের পর হইতে পৃথ্বীরাজের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে হিন্দুজাতি কামান নির্ম্মাণে এবং পরিচালনে অজ্ঞ ছিলেন তাহার পরিচয় পদে পদে

পাওয়া যায়। ধাতবজিনিষ সহজে নষ্ট হইয়া যাইবার নহে; অতএব তদানীন্তন হিন্দুগণ কামান ব্যবহার করিয়া থাকিলে, মহারাজা অশোক, গুপ্ত সম্রাটগণ, বর্দ্ধন রাজগণ এবং পালরাজগণের উৎকীর্ণ প্রস্তর ফলক তাম্র-শাসন প্রভৃতির ন্যায় ২।৪টি পুরাতন কামানও এতদিন বহিষ্কৃত হইত। অতঃপর একথাও বিবেচ্য যে ভারতবর্ষেরই কোন দেবমন্দিরাদিতে ধনু গদা ভল্ল কৃপাণ ইত্যাদি যুদ্ধোপাদান ব্যতীত বন্দুক কামানাদির চিত্র অঙ্কিত নাই সুতরাং ইহাও পূর্ব্বতন হিন্দুদের কামান ব্যবহার না জানিবার অন্যতর প্রমাণ।

কেহ কেহ বলিতে পারেন চন্দ্রগুপ্ত অশোক প্রভৃতি সম্রাটগণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সমসময়ে বা কিছু পরে কামানের পরিচালন বিষয়ে হিন্দুগণ অনভিজ্ঞ থাকিলেই বা হানি কি? তাঁহারা রামায়ণ মহাভারত বর্ণিত সময়ে কামান নির্ম্মাণ ও প্রয়োগে পটু থাকিলে হয়ত কোনও অনিশ্চিত কারণে তৎপরে কিছু দিন সে বিদ্যা বিস্মৃত হইয়াছিলেন তাই চন্দ্রগুপ্তাদির সময়ে কামানের প্রচলন ছিল না। কিন্তু ইহা নিতান্তই মিথ্যা আপত্তি। হিন্দুগণ পুরাকালে তরবারী, ধনু, গদা, বর্শা, কুঠার প্রভৃতি যে সমুদয় সাময়িক অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত ও ব্যবহার করিতেন পরবর্ত্তী বংশধরগণ তাহার নির্ম্মাণ কৌশল ভুলিলেন না বরং উত্তরোত্তর উন্নতিই করিতে পারিলেন; শুধু কামান তৈয়ারের প্রণালীটিই বিস্মৃত হইলেন ইহা কে স্বীকার করিবে? ক্রমশঃ।

—•—

শ্রীরজনীমোহন ঠাকুর।

শান্তিপুরী রুমাল।

কংগ্রেসের শিল্প প্রদর্শনীতে রৌপ্য মেডেল প্রাপ্ত ও উৎসাহ-সম্পাদকের সুপরিচিত।

অর্ডার দিলে সহর পাড়ের দুইধারে গ্রাহকের নাম ধাম সহ রুমাল বুনাইয়া দিয়া থাকি। মূল্য বাঙ্গলা ও হিন্দী অক্ষরের নাম প্রত্যেক খানা ॥৵০ আনা, ইংরাজি অক্ষরে ॥/০ আনা। চারিধারে নাম বুনাইতে ডবল মূল্য লাগে। রেশমী রুমালের মূল্য সূতীর দ্বিগুণ। রেশমী রুমালের চারিধারের নামের মূল্য প্রত্যেকখান ২॥০ টাকা। শ্রীচন্দ্রভূষণ প্রামানিক, শান্তিপুর, সূত্রাপাড়া।

পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সাহা প্রবর্ত্তিত।

উৎসাহ।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

(ফাল্গুন, চৈত্র ১৩০৮.)

*** সম্পাদক ***

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

সূচীপত্র।

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
অভিসারিকা	শ্রীরজনীকান্ত সেন বি-এল,	৯৭
অভিমান	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার,	৯৮
সংযম-সামর্থ	ধর্ম্মানন্দমহাভারতী,	১০১
ঘুড়ি ...	...	১১০
আমি—তুমি	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার,	১১৩
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতম্।	শ্রীম— বি, এ,	১১৮
হবে কি মিলন ...	...	১২১
মেয়েলি বারব্রত (লক্ষ্মীর কথা)		১২১
বন্দি	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ,	১২৫
সহমরণ		১২৭
পবিত্র সুন্দর	শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার বি, এ,	১৩১
কত স্মৃতি কত দিন কার	শ্রীসতীন্দ্রমোহন বাগচী	১৩৬
দীপালী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ,	১৩৯
হিন্দুজাতির কামান ব্যবহার	শ্রীরজনীমোহন ঠাকুর,	১৪৮

—०::§)*(§::०—

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা।

উৎসাহ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর সান্যাল প্রণীত

আজগুবি গল্প। (যন্ত্রস্থ)

বালক বালিকাগণের পাঠোপযোগী এমন কৌতুকপূর্ণ হাস্যোদ্দীপক শিক্ষাপ্রদ গল্পের পুস্তক বঙ্গ ভাষায় এই প্রথম। শুধু বালক নয়, বৃদ্ধরাও উহা পাঠে যথেষ্ট আমোদ পাইবেন। গল্প পড়িবারকালে হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়ি ছিঁড়িয়া যাইবে। নিম্নলিখিত গল্পগুলি প্রকাশিত হইতেছে:—

১। গর্ভস্রাব কে ? ২। ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখ নাই। ৩। ছাম্বরড়া। ৪। ওঝার মাথার বোঝা। ৫। বিশমন আর বাইশমন। ৬। চোদ্দ ছটাকে কপাল। প্রভৃতি।

ব্রজসুন্দ বাবুর **শ্রীশ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল**। ১ম খণ্ড ।/০ আনা।

কলিকাতায় গুরুদাস বাবুর দোকানে ও আমার নিকট পাওয়া যায়।

ঘোড়ামারা পোঃ, রাজসাহী। } শ্রীসুরেশ উৎসাহ কার্য্যাধ্যক্ষ।

কার্য্যাধ্যক্ষের নিবেদন।

গত অগ্রহায়ণ মাসে উৎসাহের পঞ্চমবর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।

বহু গ্রাহকের নিকট উৎসাহের মূল্য বাকী। উৎসাহের মূল্য অগ্রিম দেয়। এই সংখ্যা উৎসাহ হাতে পাইলেই মনে করিয়া দেখিবেন—উৎসাহের মূল্য পাঠাইয়াছেন কি না, না পাঠাইয়া থাকিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব দেয় মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া আমাদের পরম উপকার করিবেন। অন্যথা আগামী সংখ্যা উৎসাহ আমরা ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট ভি পি করিতে চাই। যাঁহাদের আপত্তি আছে, তাঁহারা লিখিবেন। না লিখিলে মনে করিব আপত্তি নাই।

উৎসাহ।

পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সাহা প্রবর্ত্তিত।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত।

৫ম বর্ষ। } ফাল্গুন; ১৩০৮। { ৪র্থ সংখ্যা।

অভিসারিকা।

তিলক কামোদ----ঝাঁপতাল।

নয়ন-মনোহারিকে ! গহন বনচারিকে !
নব-বকুল-আলউরে, প্রেম অভিসারিকে !
নূপুর-পদ-চঞ্চলে; চপলা খেলে অঞ্চলে,
হরি-মিলন-ত্রস্ত-হৃদি— প্যারী অণুকারিকে !
কুস্কুম সুদিগ্ধ তনু চর্চ্চিত-সুচন্দনে;
মালতী সুগন্ধ লুটে পীন কুচ বন্ধনে;—
দলিত পদে বল্লরী, চ্যুত-কুসুম-মঞ্জরী
মধুর-মৃদু-গীতি-চির-মূক-শুক-সারিকে !

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

অভিমান।

ওগো!

চিরদিন গেয়েছি ত গান, কি পেয়েছি আমি,
চির দিন ভালত বেসেছি, কি পেয়েছি স্বামী?

সখি!

বুক ভরা ভালবাসা,
আঁখি ভরা জল;
আগ্নেয় পর্ব্বত ভরা ব্যথা,
একি সখি! নিয়তির ফল?
তাহারি হাসি ও অশ্রুজল লয়ে,
নিভৃতে গড়েছি মানস দেবতা;
তিল তিল করে মরিতে পারিনা,
আজি তারে দুটি অনুগ্রহ কথা!

সে যখন এসেছিল কাছে,
হাসি ও অশ্রুজল লয়ে,—
পাতিয়া দিয়াছিনু মম প্রাণ,
বসায়েছিনু হৃদি মন্দির মাঝে!
আপনারে সখি! গিয়াছিনু ভুলি,
ভুলেছিনু এ জগত পারাবার!
হৃদয়ের আশা ও নিরাশা,
শ্রীচরণে সঁপেছিনু তাঁর।

বাঁশি বেজেছিল ধরা দিনু তাই,
তার পর সখি, থামিল বাঁশি!
চরণে এখন কঠিন শৃঙ্খল,
নিজ হাতে তুলে পরিনু ফাঁসি!

আমিত চাহিনা কিছু তার কাছে,
প্রাণ শুধু ভালবাসা চায়;
প্রাণের সম্পর্ক এযে, ইহ পরকালে,
সখি! কঠিন আঘাতে আজ ভেঙ্গেদিতে চায়!

বিধাতার আশীর্ব্বাদে মিলেছিনু সাথে তাঁর,
জীবনের মধুর প্রভাতে।
আজ কিনা বলে সেগো "পারিনা সহিতে,
ভালবাসা— প্রেম ব্যভিচার।"

সে দেখায় বেদান্তের, কত লেখা, কত টিকা
"জীবন এ স্বপ্নময় বৃথা শুধু মায়া মরীচিকা।"

সে চাহে উজ্জ্বল করিবারে,
আপনারে দিয়া বলিদান;
সে শুধু আমারে বলে,
"গেও না গেও না প্রেম গান।"

"কোথা হাসি, কোথা অশ্রু, অসার কল্পনা,
ভুলে ভুলে চলেছে জগৎ"
"জগৎ কি"— "অনন্ত কালের কণা,
ভুল তব যাক ভেঙ্গে-বল ওঁ তৎসৎ।"

"পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, ততক্ষণ আছে,
যতক্ষণ ভেদাভেদ রবে;"
"তারপর" "সব মায়া", ঈষৎ হাসিল সে,
"সোহং সোহং বল সবে।"

"নাহি হেথা আত্মহারা প্রেম,
নাহি হেথা জ্যোছনা লহরী॥
এ নহে গো হাসিময় ধরা,
মোরা সবে কর্ম্ম ক্ষেত্র'পরি।"

"করে যাও আপনার কাজ,
এ জগতে কেহ নহে কার।"

সখি! এমন হৃদয় হীন কথা,
কোন মুখে বাহিরিল তার?

ভুলিয়াছে সে অতীত জগৎ,
আপনারে ভুলিয়াছে;
কোন পাষাণেরে পূজা করে সেগো—
সখি! তার কি হৃদয় আছে?

মোরা, নারী হয়ে জন্মেছি ধরায়,
আমি ত করিনি কারো হানি;
এ জগতে বুঝিনাক কিছু,
আমি শুধু তাহারেই জানি!
দিনে দিনে বুক ফেটে যায়,
দুঃখ মোর জীবনে মরণ;
পারিনা এ জীবন বহিতে,
মরণে করিব সমর্পণ!!

শান্ত্রি!

বৃথা তব এই শাস্ত্র অধ্যয়ন,
তুমি বৃথা শুধু মর খুঁজে;
যে— প্রেমেতে আপনা ভোলে
সেই সে তাঁহারে পূজে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার।

সংযম-সামর্থ।

প্রাচীন হিন্দুর আধ্যাত্ম বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং আধ্যাত্ম বিজ্ঞান শাস্ত্রের উপক্রমণিকা স্বরূপ ষড়দর্শন শাস্ত্র, মানবীয় জ্ঞানক্ষেত্রে অতি অপূর্ব্ব পদার্থ! কঠোর তপস্যাও সাধন-প্রসূত আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং গভীর চিন্তা ও নিদিধ্যাসন প্রসূত দার্শনিক জ্ঞান এই উভয় জ্ঞানের সমবায়ে যে মহান্ পরাবিদ্যার প্রত্যক্ষ প্রাতিভাষিক জ্ঞান হয়, নৈয়ায়িকদিগের মতে সেই জ্ঞানের উপযুক্ত সংজ্ঞা "ব্রহ্মজ্ঞান"; হিন্দুর ন্যায় (Logic), দর্শন ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানশাস্ত্রে মুমুক্ষ মুনিদিগের এবং জীবন্মুক্ত ঋষিবর্গের প্রত্যাদিষ্ট প্রাড্-বিবেকী দিগের আলোচিত ও বিশ্লেষিত এই ব্রহ্মজ্ঞানের গভীর বিবেকপূর্ণ বিচার কি সুন্দর কি চমৎকার! আবার আরও অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া যখন এই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুবর্ত্তিনী বৃত্তি সমূহের প্রকৃতিপুঞ্জের অসাধারণ শক্তি নিচয়কে সম্যক বুঝিতে পারি, যখন সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতর রূপে জ্ঞান বিজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া মনোবৃত্তি সমূহকে পরাবিদ্যোন্মুখিনী করিতে শিক্ষা করি,

তখন দেখিতে পাই, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাতিভাষিক সত্তা আরও উচ্চতর স্থানে সম্প্রসারিত হইয়া সঙ্কীর্ণ ন্যায় ও দর্শনের চিন্তাসম্ভূত জ্ঞানকে তুচ্ছ করতঃ আর এক অপূর্ব্ব প্রকীর্ণ অন্তর্জাগতিক জ্ঞানে তন্ময় হইয়া পড়ে, সেই প্রকীর্ণ জ্ঞান সর্ব্বদাই কার্য্যকরী (Active) এবং সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল (Practical) ভাবে পরিণত হয়, সেই জ্ঞানের কার্য্যকারী শক্তির নাম (দার্শনিক শাস্ত্র মতে) "যোগ"; বেদান্ত দর্শন মতে যোগ সদতই সকর্ম্মক, কখনও অকর্ম্মক নহে। হিন্দুর আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানশাস্ত্র সমূহের সূত্র ও নীতি অনুসারে বিচার করিলে জানিতে পারি, যোগের প্রাথমিক অবস্থার পরিভাষা চিত্তবৃত্তির নিরোধ, দ্বিতীয় অবস্থার পরিভাষা অতিরিক্তৈন্দ্রিক প্রতীতি এবং তৃতীয় বা চরম অবস্থার ফল বা নাম তুরীয়াবস্থা, যাহার নামান্তর তন্ময়তা, বিশিষ্ট সুষুপ্তি, কৈবল্য মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ বা অক্ষয় পরমানন্দ। এই মুক্তি বা ব্রহ্মানন্দ মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহাই প্রত্যেক সাধন ও সাধকের বিশিষ্ট "জ্ঞাপ্তি" অর্থাৎ চারমিক ঈপ্সা এবং ধ্যান ও ধারণা জনিত তত্ত্বজ্ঞানের সর্ব্বশেষ ফল। এই অবস্থায় উপনীত হইতে গেলে বেগবতী সর্ব্বতোমুখিনী চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে হয়, কারণ "চিত্তবৃত্তি সমূহের নিরোধের নামই যোগ; অভ্যাস বৈরাগ্য ভিন্ন এই প্রমাথিনী চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় না।" (পাতঞ্জল।) এই বিপ্রকার্ষিত চিত্তসমূহকে সম্প্রসারিত করিয়া কেন্দ্রীভূতা করিতে পারিলে যে অপূর্ব্ব অমানুষিক সামর্থ্যের উদ্ভব হয় তাহার নাম সংযম সামর্থ্য, ইহারই অপর নাম ইচ্ছা শক্তি। ইচ্ছা শক্তিকে বুঝিলে পরব্রহ্মকে বুঝা যায়, কারণ ব্রহ্মবিদ্যার মূলে ইচ্ছাশক্তি কারণের কারণ স্বরূপ— ভিত্তির ভিত্তি স্বরূপ— প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইয়া চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে, মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায়, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায়, সৈকতাবৃত ফল্গুনদের ন্যায় অথবা স্তম্ভাচ্ছাদিত পৌলস্ত-বাণের ন্যায়, ইচ্ছাশক্তি অপূর্ব্ব অলৌলিক ক্রিয়া সমূহ নিষ্পাদনে সমর্থা হয়। ইচ্ছা শক্তির সম্পূর্ণ উৎকর্ষে সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হয় আবার ইচ্ছা শক্তির অবনতিতে মনুষ্য ব্রহ্মানন্দ উপভোগে বঞ্চিত থাকেন, এই জন্য সূক্ষ্মদর্শী বিবেকী হিন্দুর ন্যায়, দর্শন এবং আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে ইচ্ছা শক্তিই সকলপ্রকার যোগশক্তি, সকলপ্রকার অনুভূতি শক্তি, সকলপ্রকার জ্ঞানবিজ্ঞান শক্তির মূলীভূত কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে;

এই সংযম-সামর্থ্য, বা ইচ্ছাশক্তিই ব্রহ্মবিদ্যার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান উপকরন; চিত্তশুদ্ধি, সাধন এবং আত্মিক উন্নতির পথে ইচ্ছাশক্তিই আমাদের উপদেশক ও প্রদর্শক। ইচ্ছাশক্তিই বেদ ও পুরাণ এবং বাইবেল ও কোরাণের মূলমন্ত্র; বৌদ্ধ, পার্সী ও জৈনের ধর্ম্ম, ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে ইচ্ছাশক্তিই সুবর্ণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা। যাহার ইচ্ছা-শক্তিতে অভ্যাস বা বিশ্বাস নাই তাহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হওয়া কঠিন হইতেও কঠিনতর এবং সম্পূর্ণ অসম্ভব।

যোগীরা এই ইচ্ছাশক্তিকে সংযম সামর্থ্য এই সংজ্ঞা দিয়াছেন, কারণ ইচ্ছাশক্তি সংযমতার সন্ততি; সংযমে সামর্থ্য জন্মিলে যে অনির্ব্বচনীয় অমানুষিক শক্তি হয় তাহারই বলে প্রকৃতির উপরে মানবের আধিপত্য জন্মে এবং তাহারই বলে জগতের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত মহাপুরুষেরা অলৌলিকক্রিয়া সমূহ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে দুই একটি প্রয়োজনীয় দার্শনিক কথার সংক্ষেপে এই স্থলে আলোচনা করিব।

আমরা চারিদিকে যে সমস্ত পদার্থ প্রত্যক্ষ করি, তত্ত্বচিন্তকগণের মতে, সে সমস্তই শক্তির রূপান্তর বা অবস্থান্তর মাত্র। পণ্ডিত আনড্রজ্যাক্সন্ ডেভিস্ "ক্ষিত্যপ্তেজোমরুৎ" এই ভূতচতুষ্টয়কে সূক্ষ্মতম অবিনশ্বর পদার্থের স্থূলতম পরিণতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অধ্যাপক টিণ্ডেলের শক্তিবাদ অনুসারে, ভৌতিক পদার্থমাত্রেই শক্তির বিভিন্ন রূপ, শক্তি হইতে পৃথগ্‌ভূত পদার্থ অপ্রসিদ্ধ ও সত্তা শূন্য অবস্তু মাত্র।

কিন্তু, এই শক্তি স্বরূপতঃ কি? ভৌতিক বিজ্ঞানের অভিমতে উহা গতি ও স্থিতির নিয়ামিকা বা নৈমিত্তিক কারণ (Efficient Cause)। অধ্যাপক টিণ্ডেল শক্তিকে কপিলের সাঙ্খ্য-শাস্ত্রোক্ত "প্রধান" নামক শক্তির ন্যায় চেতনাপরিশূন্য অন্ধ শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু, সংবিদ্-তত্ত্ববিদ্গণের মতে, চৈতন্য ও শক্তি, জল ও তরঙ্গের ন্যায় "সম্পরিষক্ত" অর্থাৎ একতাপ্রাপ্ত। উহাদের একতর অন্যতর হইতে বিবিক্ত (distinguished) হইতে পারে বটে; কিন্তু কোনক্রমেই পৃথগ্‌ভূত (separated) হইবার নহে। এতন্মতে "অন্ধশক্তি" একটি স্ববিরোধী self-contradictory, শব্দ সমন্বয় মাত্র।

শক্তি, স্থূল ও সূক্ষ্ম, ভৌতিক ও অভৌতিক, বা অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা ভেদে দুই প্রকার। অনন্ত আকাশ, বিচিত্র বহিরঙ্গা শক্তির জীবন্ত ক্রীড়া-প্রাঙ্গন। এই বহিরঙ্গা শক্তিই, এক সময়ে, সুবিমল চন্দ্রালোকে নিরন্ধ্র নভোমণ্ডল প্রদীপ্ত করিয়া অনুপম সৌন্দর্য্যে প্রাণ মন বিমোহিত করে; আবার পরক্ষণেই আকাশ ঘন-ঘটায় সমাচ্ছন্ন করিয়া অশনি নিপাতে ও বারিবর্ষণে দর্শককে ব্যাকুল ও সন্ত্রাসিত করিয়া তুলে।

অপর উন্নতমুখী আত্মা, অন্তরঙ্গা শক্তির যেন একটি জীবন্ত সমর-প্রাঙ্গণ। উহাতে অহর্নিশ কত শক্তি যে কত শক্তির উপর প্রতিদ্বন্দ্বী বল প্রসারিত করিতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত বিচিত্র শক্তির যে উদয় ও বিলয় ঘটিতেছে; পলকে পলকে কত প্রসুপ্ত শক্তি জাগ্রৎ, আর কত জাগ্রৎ শক্তি যে প্রসুপ্ত হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? আর কেই বা তাহার ইয়ত্তা করিবে?

বিচিত্র বহিরঙ্গা শক্তি, পরমাণুপুঞ্জের অগ্র পশ্চাৎ গতি সঞ্জাত করিয়া পদার্থ-বিশেষকে যেমন শব্দায়মান, তেজস্মান, আলোকময় কিংবা তড়িৎ সম্পন্ন করে, অন্তরঙ্গা শক্তিও তেমন মানুষের অন্তঃকরণকে কখনও উৎসাহে স্ফূর্ত্তিমান্, কখনও বা নৈরাশ্যে নিমজ্জমান, কখনও কার্য্যনিষ্ঠ এবং কখনও বা অবসাদগ্রস্ত করিয়া তুলে। ইহারই প্রভাবে মানুষ একবার ভাবলহরীতে আন্দোলিত হইয়া সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করেন, আবার পরক্ষণেই রোষকষায়িত লোচনে কম্পিত কলেবর হইতে থাকেন।

"Chaotic cosmic matter" নামক মৌলিক উপাদানকে যেমন প্রকৃতিবিৎ পণ্ডিত বহিরঙ্গা শক্তির মূলদেশে নিরীক্ষণ করেন, ইচ্ছাশক্তিকেও অধ্যাত্মবিৎ পণ্ডিত তেমন অন্তরঙ্গা শক্তির মূলপ্রস্রবণরূপে দেখিতে পান। নৈয়ায়িকগণ এই ইচ্ছাশক্তিকে অন্তর্জ্জগতে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়া বলিয়াছেন—"ইচ্ছা হইতে কৃতি, কৃতি হইতে চেষ্টা এবং চেষ্টা হইতে ক্রিয়া জন্মে।" যোগশাস্ত্রোক্ত "অনিমালঘিমাদি" অষ্ট সিদ্ধির অন্তর্ভুত "প্রাকাম্যের" অভ্যন্তরে, আমরা ইচ্ছাশক্তিরই প্রবল পরাক্রমের পরিচয় পাই। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ ইচ্ছাশক্তির নিম্নতম বিকাশের অবস্থা বিশেষকে "Spontaneity of movement" এবং "Self-preservation"

এই দুই নামে আখ্যাত করিয়াছেন। মিস কব্ ইচ্ছাশক্তির কার্য্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা, ইচ্ছা-সাপেক্ষ, (Voluntary) ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, (Involuntary) ও ইচ্ছা-চালিত (Volitional)। ইহা জড়-জগতে কিরূপে আপন প্রভাব বিস্তার করে, তৎসম্বন্ধে একজন ইংরেজ পণ্ডিত লিখিয়াছেন:—

"অগ্রে আমরা ইচ্ছা করি। অতঃপর ঐচ্ছিক স্নায়ুর অভ্যন্তরস্থ তাড়িত আলোড়িত হয়; আলোড়িত তাড়িত রক্তসঞ্চালনকারিণী ধমনীকে প্রকম্পিত করে; প্রকম্পিত ধমনী মাংসপেশীসমূহ সঙ্কুচিত করে; সঙ্কুচিত মাংসপেশী বাহু উত্তোলন করে; উত্তোলিত বাহু অবশেষে ঈপ্সিত বস্তু আনয়ন করে।"

পদার্থের কিরন্ত অবস্থার আবিষ্কর্ত্তা ক্রুকস্ সাহেব এই ইচ্ছাশক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় বলিয়াছেন—"মানবের এমন একটি শক্তি আছে যাহার সাহায্য বিনাস্পর্শে কঠিন বস্তুর ভার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে; না ছুঁইয়া কোন জিনিস নড়ান যাইতে পারে; না ধরিয়া ভারী জিনিস শূন্যে ঝুলান যাইতে পারে এবং প্রত্যক্ষ কারণ ব্যতীত শব্দ উৎপাদন করা যাইতে পারে।"

ফলতঃ অন্তর্জ্জাগতিক শক্তি সমূহের মধ্যে ইচ্ছাকেই অধিস্বামিনীরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক ইহারই প্রভাবে জ্ঞানাহরণ ও কর্ম্মানুষ্ঠানে রত। ইহারই আদেশে স্মৃতিশক্তি সঞ্চালিত ও বুদ্ধিবৃত্তি সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সঙ্গতি-সন্ধানে নিয়োজিত। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ইচ্ছার দাসী; ইচ্ছার আদেশেই পরিচালিত ও পরিশাসিত। ইন্দ্রিয়গণ যখন শ্রেয়ঃ পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়-পথ আশ্রয় করে, তখন অন্তর-নিহিত শুভসংস্কাররূপ প্রস্তর রাশি নিক্ষিপ্ত করিয়া কে তাহাদের গতি সংরুদ্ধ করে? রূপরসাদি বাহ্য-সৌন্দর্য্য যখন মোহন সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া অন্তরাত্মাকে দাসত্বের বন্ধনে বদ্ধ করিতে প্রয়াসী হয়, তখন কে বিবেক-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার অনির্ব্বার বন্ধন উন্মোচনে প্রবৃত্ত হয়? অহঙ্কারের অনুসঙ্গিনী জুগুপ্সা, যখন সাধু ব্যক্তির সাধু সঙ্কল্পের উপরেও দুরভিসন্ধির কালিমা সংমিশ্রিত

করে, তখন কে অনুতাপের গভীর নির্ঘোষে প্রাণকে প্রকম্পিত ও সন্ত্রাসিত করিয়া তৎপ্রবৃত্তির শুণ্ড সংকোচন করে? আর কেই বা উদীয়মান প্রবৃত্তির তমসাচ্ছন্ন প্রদেশে জ্ঞানের শুভ্র কিরণজাল বিকিরণ করে?

ইচ্ছাশক্তির ব্যাপ্তি ও বেগের বিষয় চিন্তা করিলে মন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়। জড় পদার্থের ব্যাপকতা আর কত? আধ ছটাক জলযান বাষ্প, আধ ছটাক প্লাটিনম্ অপেক্ষা সার্দ্ধ দুই লক্ষগুণ অধিক পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া থাকিতে পারে; বিদ্যুৎ এক সেকেণ্ডে চন্দ্রলোকে গমন করিতে পারে; আলোক কম্পন এক মুহূর্ত্তে এক লক্ষ ক্রোশ অতিবাহন করিতে পারে। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি প্রণাঞ্চশীলতায় যেন জলযানের ব্যাপ্তি, এবং ক্ষিপ্রকারিতায় যেন আলোক-কম্পন ও বিদ্যুদ্বেগকেও পরাস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। উহা এক মুহূর্ত্তে মনকে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পরিভ্রমণ করাইতে পারে। এক মুহূর্ত্তে তুষারমণ্ডিত হিমাদ্রি-শিখরের তরুণ অরুণের তরল-কাঞ্চন-কিরণ-শোভা সন্দর্শন করাইয়া, দ্যুলোকবিলম্বিত জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর কৌমুদী-তরঙ্গ-ভঙ্গের সৌন্দর্য্য-উচ্ছ্বাসে নিমগ্ন করিতে পারে। উহা এক মুহূর্ত্তে সংসারানল সন্তপ্ত প্রবৃত্তি-প্রভৃষ্ট-প্রাণকে নিখিল প্রপঞ্চের আসক্তি-শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া দেশ-কালাতীত সমশ্নুবান্ সত্তার হৃদয়-মোহনকারী পূর্ণ পবিত্রতার সৌন্দর্য্যে বিলীন করিতে পারে। উহার ব্যাপ্তির কথা কি আর কহিব? এমন ইন্দ্রিয়বোধ নাই, এমন প্রত্যক্ষ নাই, এমন অনুমান নাই, এমন উপলব্ধি নাই, যাহার মূলে উহাকে আদি কারণরূপে নির্ণীত করা না যায়। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, মানবেচ্ছা সর্ব্বার্থসাধিনী। মানুষের অভিলষনীয় এমন কিছু নাই, যাহা উহার করায়ত্ত নহে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ উহারই অধিকৃত সম্পদ্।

আবার অন্যদিকে দেখিতে গেলে, উহার ন্যায় ভীষণ বৈরী আর দ্বিতীয় সম্ভবে না। ভূমণ্ডলে যত সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, যত রোমহর্ষণ রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছে, নর-রুধির-ধারায় যত সমর-প্রাঙ্গণ প্লাবিত হইয়াছে, তন্মূলে আমরা উহারই অনর্থ সন্ধান ও ফলোপধায়িনী চেষ্টার চিহ্ন দেখিতে পাই। ভূমণ্ডলে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ন্যায় মহাবীর বোধ হয় আর জন্মে নাই। সিজর, হানিবল ও আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি বীরগণের

প্রতিপত্তি প্রসারণের পথ, তাঁহাদিগের অভিভাবক ও অপরাপর ব্যক্তিগণ অনাবৃত করিয়া যান। কিন্তু নেপোলিয়নের পক্ষে সেরূপ সুযোগ সম্ভাবিত হয় নাই। ইনি সামান্য বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া একমাত্র ইচ্ছা-শক্তি-সঞ্চালনেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ইউরোপ খণ্ডে প্রধান ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হন। কি স্থিরনিশ্চয়তা, কি ধ্রুবেচ্ছতা, কি বুদ্ধি পরিচালনা, কি বহুজাতির প্রতিকূলে শক্তি-সঞ্চালন ইত্যাদি বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিলেও জিগীষাবৃত্তির সমধিক প্রবলতা হেতু ইঁহার জীবনে কি শোচনীয় পরিণামই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

ইচ্ছাশক্তির সমীচীন স্বাধীনতা সম্ভাবিত কি না, এ কূটপ্রশ্ন লইয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে যুগ যুগান্তর হইতে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। কেহ কেহ ইচ্ছাশক্তির সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা স্বীকার করিয়াও উহাকে স্বর্ণশৃঙ্খলপরিহিতা পিঞ্জররুদ্ধা বিহঙ্গীর ন্যায় পরাধীনা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই:— জাগতিক পদার্থের ন্যায় ইচ্ছাশক্তিও কার্য্য-কারণ-তত্ত্বের অধীন। প্রবৃত্তি যেমন প্রতিকূল কারণে সঙ্কুচিত এবং অনুকূল কারণে প্রসারিত হয়, ইচ্ছাশক্তির আকুঞ্চন-প্রসারণও তদ্রূপ নিয়ম-তন্ত্রের অধীন। পরন্তু, ইহাদের প্রতিযোগিগণ বলেন, ইচ্ছা কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার অতীত। অনুকূল বা প্রতিকূল কারণ, ইহাকে কেন্দ্র ভ্রষ্ট করিতে সমর্থ নহে। ইহা সম্মানের কারণ সত্ত্বেও মানুষকে প্রহৃষ্ট করে না এবং অপমানের কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও অন্তঃকরণকে বিষাদে বিষণ্ণ করে না। ইহা, বিজয়ীর জয়োচ্ছ্বাসে, বালকের সুধাময় হাস্যে, শোক দুঃখের নিদারুণ কশাঘাতে, প্রণয়াস্পদের সুখময় প্রেমালিঙ্গনে অন্তঃকরণকে সমভাবাপন্ন করিয়া রাখিতে পারে। এই ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতাই মানব মহত্ত্বের প্রধানতম কারণ। স্বাধীনতা আছে বলিয়াই মানুষের অন্তরে গভীর দায়িত্ব বোধ বর্ত্তমান। ইহার ঐকান্তিক অসদ্ভাব হইলে, মনুষ্য আর প্রস্তরে কোনই ইতর-বিশেষ থাকিত না।

ফলতঃ এই ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতায় বিশ্বাসকারী ব্যক্তিগণই পর্ব্বতসমান বাধাবিঘ্নকে বজ্রবদ্বলে বিদূরিত করিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়েন। এই জীবন্ত বিশ্বাসের প্রবল পরাক্রমেই ফোষ্টার সাহেব কলিকাতা হইতে

সুদূর সেণ্টপিটার্সবর্গ নগরে স্থলপথে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই জীবন্ত বিশ্বাসই নেপোলিয়নকে নীহার-মণ্ডিত আল্পস্ পর্ব্বতের সঙ্কীর্ণ বর্ত্ম ভেদ করিয়া অষ্ট্রীয়া-সমরে বিজয়-নিশান উড্ডীয়মান করিতে সমর্থ করিয়াছিল। গ্যারিবল্ডীর পরোপকার স্পৃহা, ও ম্যাটসিনীর স্বদেশপ্রাণতার মূলেও আমরা উহারই সজীব প্রভাব সন্দর্শন করি। এই তীব্রসংবেগশালিনী ইচ্ছাশক্তিই একদিন ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনীবৃত্তি বিস্ফুরিত করিয়া প্রাচীন ভারতে প্রবল পরাক্রমে কাব্য প্রভৃতি দৈত্যগণ, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ, বালখিল্য প্রভৃতি ঋষিগণ, সোমেশ্বর প্রভৃতি ভূপতিগণ, গোবিন্দ ভগবৎপাদাচার্য্য, গোবিন্দনায়ক, চর্ব্বটি, কপিল, ব্যালি, কাপালি, কন্দলায়ন প্রভৃতি সিদ্ধগণের প্রাণকে পরম-পুরুষার্থ-সাধন-মন্দিরে সিদ্ধাসনে সমাসীন করিয়াছিল। রাজর্ষি অম্বরীষ, দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি পর্ব্বত প্রভৃতি পরম ভক্তগণ, এই ইচ্ছাশক্তির প্রবলত্ব সহযোগেই অনন্তশীর্ষা প্রবৃত্তির মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, সেই অতীন্দ্রিয় সুন্দরের অনবদ্য মহিমা পরমানন্দে পরিকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

যে কোনও ধর্ম্মই বল, ধর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য অকাট্য বা অখণ্ড সুখ, শাস্ত্রকারেরা এই অখণ্ড সুখকে ব্রহ্মানন্দ বা অব্যয় পরমানন্দ এই গৌরবান্বিত সংজ্ঞায় সম্মানিত করিয়াছেন। বেদান্তীদিগের মতে অভাবের পূরণের নাম সুখ, নৈয়ায়িকদিগের মতে অভাবের নাশ বা বিনাশের নাম সুখ। ন্যায় ও দর্শনে ধর্ম্মতত্ত্ব লইয়া এই মহাপ্রভেদ!! অভাব পূরণের বৃত্তির নামই চেষ্টা কিন্তু "নিরগ্নি ও নিষ্ক্রিয়" ব্যক্তিই ন্যায়শাস্ত্রে যথার্থ পরব্রহ্মের উপাসক ও যথার্থ ব্রহ্মানন্দের ভোগী। নৈয়ায়িকের মত পরিস্ফুটতর ও সুন্দরতর বলিয়া বোধ হয়। অভাবের (Demands) যত হ্রাসতা হয় ততই চেষ্টার হ্রাসতা হয়, চেষ্টার হ্রাসতায় দুঃখের ও অবসাদের হ্রাসতা হয়, চেষ্টার হ্রাসতায় মনুষ্য কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানকে আশ্রয় করে এবং তত্ত্বজ্ঞানের পবিত্র ও প্রশস্ত মার্গে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হয়। পবিত্রতা, সাধুতা, সরলতা, সৌজন্যতা, ত্যাগ স্বীকার প্রভৃতি ধর্ম্মের লক্ষণ, সুতরাং এইগুলির অভাবে ধর্ম্মসাধন হয় না, এইগুলির পরিণতি (Culture) জন্য প্রবলা ইচ্ছাশক্তি বা সংযম সামর্থ্যের নিতান্ত প্রয়োজন। সংযমী পুরুষই "পুরুষ ব্যাঘ্র", যাঁহার সংযম সামর্থ্য জন্মিয়াছে তিনিই ধার্ম্মিক। এই

সংযম সামর্থ্য বা ইচ্ছাশক্তিই সকল সুখ, সৌভাগ্য ও শ্রীবৃদ্ধির মূলীভূত কারণ। হিন্দুর এই সংযম সামর্থ্য জগতের ইতিহাসে প্রবাদ বাক্য রূপে প্রথিত; আবার কি সংযম সামর্থ্যে ভারতকে উন্নত দেখিতে পাইব? ধর্ম্মবলই প্রকৃত বল, সংযম সামর্থ্যই ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান উপাদান। এই সামর্থ্য হইতে সকল সামর্থ্য উদ্ভূত হয়, ইহা ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির বিধায়িকা। ভাই হিন্দু! আইস আমরা আবার আমাদের প্রাচীন আর্য্য পিতৃ পুরুষদিগের ন্যায় সংযম সামর্থ্য শিক্ষা করিয়া ইচ্ছাশক্তি বলে ইহলোকে সংসারকে আনন্দাগারে পরিণত করি এবং পরলোকে অব্যয় অমৃতসাগরে নিমগ্ন হইয়া সেই "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্" সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে পরমানন্দ ভোগ করি।

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ঘুড়ি।

(একটি সত্যঘটনা অবলম্বনে লিখিত।)

তারাচরণ পিতার একমাত্র বংশধর,— সবে ধন নীলমণি। কাজেই তাহার উপর পিতা মাতার স্নেহ ও যত্নের মাত্রাটা কিছু বেশী। তাহার ফলে তারাচরণের মস্তকটি একেবারে ভক্ষিত না হইলেও কিছু দিনের জন্য বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছিল।

তারাচরণের জন্ম স্থান যশোহর জেলার কোন এক পল্লীগ্রামে। তাহার অবস্থা কাল-চক্র-নেমির আবর্ত্তনে ঘূর্ণিত হইলেও এখনও নিতান্ত মন্দ নয়। তাহার পিতামহের হৃদয় কুসুমকোমল ছিল,— সামান্য করুণ ভাবস্পর্শে তাহা বীণার তারের ন্যায় ঝন্ ঝন্ করিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিত। বিপন্নের আর্ত্তনাদ, দুঃখিতের বিগলিত অশ্রুবারি বিমোচন করাই তিনি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তই তিনি মৃত্যু কালে পুত্র রাধাচরণের স্কন্ধে বিপুল ঋণভার অর্পন করিয়া যাইতে বাধ্য হন।

রাধাচরণ পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইবার মানসে জমিদারির অর্দ্ধাংশ পোসকবলায় বিক্রয় করেন। অপর অর্দ্ধাংশ হইতে এখন তাঁহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে।

তারাচরণ সপ্তমবর্ষ বয়ক্রমকালে হাতে খড়িমাটী দিয়া গ্রাম্য বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই তাহার প্রশংসা চারিদিকে রাষ্ট্র হইতে লাগিল। পণ্ডিত মহাশয় পড়া জিজ্ঞাসা করিলে তাহার দাঁতের গোঁড়া খুলিত, অঙ্ক কসিতে বলিলে মাথা ঘুরিত। তিনি বেশী পিড়াপীড়ি

করিলে সে পেন্সিল লইয়া শ্লেটের উপর ছবি আঁকিত। চিত্রবিদ্যায় তাহার যে বিশেষ পারিদর্শীতা ছিল তাহা নহে। আর্ট স্কুল হইলে তাহাকে যে স্কুলে রাখিত তাহা বিশ্বাস হয় না। সে আঁকিত— মোড়ায় উপবিষ্ট পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে পণ্ডিত মহাশয়ের মুখ ভিন্ন অপর অঙ্গের সহিত তাহার সাদৃশ্য লক্ষিত হইত না,— মর্কটের সহিত কতকটা হইত বটে! কেন না চিত্রকর একটা লেজ বানাইয়া মোড়ার নীচে ঝুলাইয়া দিত। ছুটির পূর্ব্বে, অন্যান্য ছাত্ররা কড়া, গোণ্ডা, নামতা বলিতে আরম্ভ করিলে, তারাচরণ সকলের অলক্ষিতে একের পুস্তক অন্যের দপ্তরে পূরিয়া রাখিত, ইহার শ্লেট উহার সহিত বদল করিত। ছুটি হইলে তাহারা যখন পুস্তক কিম্বা শ্লেট অন্বেষণ করিত, সে তখন হাতে তালি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে গাহিত,—

"চারু মাষ্টার মানুষ বাঘ সদাই থাকে চোটে,
চক্ষু দুটি মুদিত সদা পাছে দেখা ছোটে।
আর জন্মে বোল্‌তা ছিল চারু মাষ্টার * *,
এ জন্মে তার হুলের বিষে প্রাণটা ঝালা পালা॥"

পর দিবস যথা সময়ে চারু মাষ্টারের নিকট অভিযোগ উপস্থিত হইত। পণ্ডিত মহাশয় তারাচরণের নগ্নদেহে কখনও বেত্রের মহীয়সী মহিমা প্রকটিত করিতেন, কখনও বা তাহার হস্তপদ বদ্ধ করিয়া কড়িকাঠের সহিত লটকাইয়া রাখিয়া ক্রোধের উপশম করিতেন।

মধ্যে মধ্যে রাধাচরণ নিজে পুত্রকে পড়াইতে বসিতেন ও তাহার মনোযোগ আকর্ষণের নিমিত্ত বলিতেন, "লেখা পড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই"। শান্ত তারাচরণ সেই মুহূর্ত্তেই পিতাকে প্রশ্ন করিত, "বাবা, তোমার গাড়ী কই।" পিতা তখন পুত্রের মানস-পটে ভাবী সুখ সম্পদের অস্ফুট চিত্র চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তারাচরণ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুস্তক দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উঠিয়া প্রস্থান করিত। প্রস্থান

কালে পিতা জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "তুমি গাড়ী ঘোড়া দিতে পাল্লে না, এখন আমি ঘোষদের পেয়ারা গাছে চড়িগে।" গৃহিণীর মুখ বিনিঃসৃত প্রবল আবর্ত্তময়ী ঝটিকার মাঝে পড়িয়া শুষ্ক পত্রের ন্যায় ঘুরে উড়িয়া যান, এই ভয়ে রাধাচরণ পুত্রকে শাসন করিতে পারিতেন না।

রাধাচরণের বয়স বেশী হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা ভগবানের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিতেন যে, ছেলেটি মানুষ হওয়ার পর যেন তাঁহার মৃত্যু হয়। বেশী কিছু না হউক, মাইনরটা পাশ করিয়া একটা মোক্তার হইলেই তাহার সমস্ত ভাবনা মিটিয়া যায়। পিতার যতই কেন উচ্চ সঙ্কল্প না হউক, পুত্রের কিন্তু লেখা পড়ার প্রতি তাদৃশ মনোযোগ ছিল না।

দিন যাইতে লাগিল। তারাচরণের কিন্তু দিন দিন অধোগতি হইতে লাগিল। রাধাচরণ পুত্রের এতাদৃশ চরিত্রে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। ভাবিলেন স্থান পরিবর্ত্তনে ও উচ্চ আদর্শ দর্শনে তাহার চরিত্র সংশোধন হইতে পারে। দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রম কালে তারাচরণ স্বগ্রামে "আদর্শ চরিত্রের" গোল্ড মেডেল লইয়া, পেয়ারা চুরির সঙ্গীদের প্রিয় সম্ভাষণ এবং দলের সুহৃদ্‌জনের প্রণয়পূর্ণ অসৎপরামর্শ ক্ষুদ্র বুকটুকুর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া নিরস কঠোর নির্ম্মম কর্ত্তব্যের তাড়নায় পাঠাভ্যাস করিতে কলিকাতায় যাত্রা করিল। বিদায়কালীন মাতার সেই আলুথালু কেশপাশ, অশ্রুসিক্ত গণ্ডস্থল এবং স্নেহ-বিহ্বলতা তাহার মনে যেন এক অভিনব প্রতিধ্বনি করিল। পুত্র চলিয়া গেল, কিন্তু সে স্নেহময়ী জননীর সেই নিরানন্দময় ক্ষুব্ধ আর্ত্তনাদ কোন মতে তাহার বিজন বালা জীবন-কুঞ্জ হইতে নির্ম্মূলিত করিতে সক্ষম হইল না।

পুত্র রওনা হইয়া গেলে, বৃদ্ধ রাধাচরণের কোটরগত নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সেত অশ্রুনয়,— যেন তাঁহার হৃদয়ের উষ্ণশোণিত দুইবিন্দু চক্ষু ফুটিয়া বাহির হইল। তাহার পর যতক্ষণ পুত্রকে দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ তাহার পশ্চাৎদিকে স্থির দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। যখন আর দেখা গেল না, তখন করঙ্গ ভঙ্গ-ব্যাকুল পোতপতাকার ন্যায় প্রাবেপন জরাজীর্ণ দেহযষ্টি খানি টানিয়া আনিয়া শয্যার উপর স্থাপন করিল।

(২)

রাধাচরণের গ্রামের মুখুর্য্যেদের বড় ছেলে কলিকাতায় মেসে থাকিয়া লেখা পড়া করিত। তিনি সেই মেসেই পুত্রের বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন। তারাচরণ কলিকাতায় যাইয়া প্রথম দিনকতক বড় বিপদে পড়িল। এখানে পেয়ারা গাছের অভাব, বৃক্ষশিরে সালিকের ছানার অভাব, এমন কি তাহার সেই সযত্নে শিক্ষিত সঙ্গীদেরও অভাব। তারাচরণ এই বহু অভাবে পড়িয়া যেন মহাশূন্য ধাত্রীয় ভাসিতে লাগিল। যাহাহউক এসকল অভাব তারাচরণ সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সর্ব্বোপরি মুখুর্য্যেদের বড় ছেলের তাড়না তাহার বড় বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। তিনি সদাসর্ব্বদা তাহাকে পড়িতে বলিতেন, রাস্তায় বাহির হইতে দিতেন না। কিয়দ্দিবস পর তারাচরণ পালাইয়া দেশে যাইবে স্থির করিল। কিন্তু তাহারও সম্পূর্ণ অভাব দেখিল,---হাতে টাকা নাই। রাধাচরণ পুত্রের নিকট কিছুই দিতেন না, সমস্তই মুখুর্য্যেদের বড় ছেলের নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

একদা সন্ধ্যার সময় তারাচরণ ছাদে বসিয়া তাহার বর্ত্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করিতেছে। গোলদিঘির নির্ম্মল সলিল-সিক্ত কুসুম-সুরভি সান্ধ্য সমীরণ হিল্লোলে উর্দ্ধপথে ভাসিয়া ভাসিয়া তাহার গা ঘেসিয়া বহিয়া যাইতেছে, বালকবৃন্দ পুষ্করিণী তীরে নানাবিধ ক্রীড়া করিতেছে, বাসার নীচ দিয়া কত গাড়ী ধরণীর মূকবক্ষ কাঁপাইয়া সশব্দে চলিয়া যাইতেছে, তাহার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। সে যেন চিত্রার্পিতের ন্যায় মৌনভাবে কাহার নিকট করুণা ও কৃপার অনন্ত প্রার্থনা জানাইতেছে। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। হ্যারিসন্‌রোডের বৈদ্যুতিক আলো সহসা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এমন সময় নীচ হইতে কে যেন ডাকিল,—"তারাচরণ!"

তারাচরণ "যাই" বলিয়া আস্তে আস্তে ছাদ হইতে নামিয়া আসিল।

তারাচরণ নামিয়া আসিয়া দেখে, মুখুর্য্যেদের বড় ছেলে তাহাকে পড়িতে ডাকিতেছে। সে অতি অনিচ্ছার সহিত পুস্তক খুলিয়া পড়িতে বসিল। কিয়ৎক্ষণ পর সে বলিল,—

দাদা! (মুখুর্য্যেদের বড়ছেলেকে তারাচরণ 'দাদা' বলিয়া ডাকিত) আমায় পাঁচটি টাকা দিবে?

কেন?

সকলেই বিকাল বেলা খেলা করে, আমিও খেলিবার একটা জিনিষ কিনিব।

কি জিনিষ?

তা' এখন তোমাকে বলিব না। তুমি আমার সঙ্গে যাইয়া কিনিয়া দিবে। আচ্ছা ভাল করিয়া পড়, কাল কিনিয়া দিব।

(৩)

পর দিবস তারাচরণ পাঁচ টাকা খরচ করিয়া এক বাণ্ডিল রেশমী সূতা, একটি সুন্দর বৃহৎ লাটাই ও দুই পয়সা মূল্যের একখানি 'সতরঞ্চ ঘুড়ি' কিনিয়া আনিল। বাসায় আসিয়া বোতল চূর্ণ ও ময়দার আঠা দ্বারা 'মাঞ্জা' (মাজন) প্রস্তুত করিয়া বেশ করিয়া সূতায় মাখাইল, পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লাটাইতে জড়াইয়া বৈকালে ছাদে উঠিয়া ঘুড়ি উড়াইয়া দিল। তাহার ঘুড়ি দেখিয়া পাড়ার অন্যান্য 'ঘুড়িবাজ' ছেলেরাও ছাদে উঠিয়া নিজ নিজ ঘুড়ি উড়াইয়া দিয়া তাহার সহিত 'প্যাঁচ' খেলিতে লাগিল। তারাচরণের সূতা একে রেশমী, তাহার উপর মাঞ্জা করা, সুতরাং যে তাহার সহিত প্যাচ খেলিতে আসে তাহারই সূতা কাটিয়া যায়। এইরূপে প্রত্যহ সকলকে পরাস্ত করিয়া তারাচরণ সন্ধ্যার সময় সসৈন্য বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় 'হত্ত-পাল্লুয়া' ইত্যাকার হর্ষ ধ্বনি করিতে করিতে ছাদ হইতে নামিয়া আসে। কিন্তু ইহাতে এক বিষম অসুবিধা উপস্থিত হইল। ৪।৫ দিবস ক্রমাগত এইরূপ হওয়ায় সকলেই তাহার সহিত কাটাকাটি খেলা বন্ধ করিল। তারাচরণ কি করে? একলাত খেলা যায় না? আর প্যাঁচ খেলা ভিন্ন ঘুড়ি উড়াইয়াও আমোদ নাই। একদিন মুখুর্য্যেদের বড়ছেলে বেড়াইতে গেলে, তারাচরণ তাহার ঘুড়ি ও লাটাই লইয়া ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইল। উপনীত হইয়াই ঘুড়ি বাতাসে উড়াইয়া দিল। ঘুড়ি উড়িতে দেখিয়া আর একটি বালক একখানি ছোট ঘুড়ি লইয়া তাহার নিকট আসিয়া উড়াইয়া দিল। অবিলম্বেই প্যাঁচ বাধিয়া গেল। দেখিতে

দেখিতে আগন্তুক বালকের ঘুড়িখানা গঙ্গাবক্ষে পতিত হইল। বালক তাহার আদরের ঘুড়ির এই শোচনীয় পরিণাম দর্শনে কাঁদিয়া উঠিল। হঠাৎ কেন আজ এই বালকের ক্রন্দন তারাচরণের প্রাণে বাজিল। সে কত দিন কত লোককে অকারণে কষ্ট দিয়াছে, কতজনের তীব্র হাহাকার শ্রবণ করিয়াছে, কিছুতেই তাহার প্রাণে করুণার সঞ্চার হয় নাই। আজ কিন্তু তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল,—বালকের ক্রন্দনে বালকের প্রাণে আঘাত লাগিল!

তারাচরণ অতি বিনীতভাবে বালককে বলিল,—"তুমি কেঁদোনা, আমার এই ঘুড়িখানা নিয়ে যাও।" বালক তাহার কথা মিথ্যা ভাবিয়া তাহাতে সম্মত না হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল। তারাচরণ অপ্রতিভ হইল।

বালক চলিয়া গেল। তারাচরণ ঘুড়ি ও লাটাই হাতে করিয়া ভাগীরথী তীরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। অনেকক্ষণ কত কি ভাবিল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার জলশূন্য মরা-জীবননদীতে যেন আবার ভরা ভাদ্রের জোয়ার খেলিল। সে কি ভাবিয়া সেই প্রসন্ন সলিলা তরঙ্গিনীর সুপ্রশস্তবক্ষে,—চিরপ্রেমের অনন্ত পারাবারে, কৃপাসিন্ধুর বিশালতায় আপনার হস্তস্থিত সেই ক্ষুদ্র ঘুড়ি ও লাটায়ের অস্তিত্ব চিরদিনের মতন বিলুপ্ত করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল; যেন বাহ্যজগতের বিপুল কর্ম্ম ক্ষেত্রের কঠোর পরিশ্রমের অবসানে কর্ম্মশ্রান্ত অবসন্ন ক্ষীণ তনুখানি লইয়া আপনার স্নিগ্ধ গৃহে প্রবেশ করিল।

তৎপরদিবস হইতে আর কেহ কখনও তারাচরণের কোন বদ্‌খেয়াল শুনে নাই!

* * * *

উল্লিখিত ঘটনার পর সুদীর্ঘ পোনরটি বৎসর ক্রমান্বয়ে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তারাচরণ এম. এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এখন মোটা বেতনে একটি সরকারী উচ্চ পদে নিযুক্ত আছেন। বৃদ্ধ রাধাচরণ এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার বয়স ৯০ বৎসর হইয়াছে। তাঁহার আর আনন্দের সীমা নাই। তাঁহার অন্ন খায় কে?

—•—

আমি—তুমি।

"আমি আমি আমি"— আত্ম অভিমান ভরে
শূন্যপথে চলি,
দম্ভ আর মোহাবেশে গরব প্রভায়
সারা বিশ্ব দলি;—
আমি কর্ত্তা, আমি হর্ত্তা, আমারি সকল,
আমার কর্তৃত্বধ্বজা তুলি' ঘু'রে ফিরি
সারা বিশ্বতল!

প্রবল ঝটিকা বহি' ধ্বজা ভাঙ্গি'পড়ে,
দেখিনু কি চাহি?—
আমার বলিতে যাহা ছিল এই ভবে,
একটিও নাহি!
অমনি বসিয়া পড়ি, হৃদয় দুর্ব্বল;
নয়ন সমুখে হেরি ঘোর তমোময়
সারা বিশ্বতল!

কোথা ছিনু শূন্য পথে, দেখি একেবারে
কত—কত তলে
যেতেছি নামিয়া যেন, শেষে যেন ভূমি
ঠেকে পদ তলে;
কোটি কোটি অবসাদ হরে হৃদিবল,
নয়ন মুদিনু ত্রাসে,— লুপ্ত হল বুঝি
সারা বিশ্বতল!

মুদিনু নয়ন, সেই তমোরাশি নাশি'
জ্যোতি যেন আসে,
সে জ্যোতি মাঝারে হেরি মহাজ্যোতির্ম্ময়
জ্যোতি পরকাশে;—
সারা অঙ্গে অঙ্গে তাঁর দীপ্ত ঝল মল
লিখা আছে "তুমি তুমি"— দীপ্ত তার তেজে
সারা বিশ্বতল!

"তুমি তুমি" দীপ্ত কোটি বর্ণ মিশি' ছ'ল
মূর্ত্তি তেজোময়,
হৃদয় সমুখে মম আসি' দাঁড়াইল
প্রদানি' অভয়!
একি এ! তড়িৎতেজে বিশ্ব টল মল,
দেব অঙ্গে দ্রুত আসি' মিশে একে একে
সারা বিশ্বতল!!

কোথা দম্ভ কোথা মোহ খুঁজে নাহি পাই,
চূর্ণ অহমিকা;—
সুশান্ত হৃদয় মাঝে জ্বলে "তুমি" লিখা
প্রদীপ্ত দীপিকা!
ভাবাবেশে মুহূর্ত্তেকে আঁখি ছল ছল;—
'আমি' কোথা? 'তুমি'-ময় নিখিল জগৎ
সারা বিশ্বতল!!!

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতম্।

(ভক্তের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়?)

ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখ্‌তে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চায়—প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুশী হয়, তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্য্যের অধীকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন।

কল্‌কাতায় যদি কেউ একবার এসে পড়্‌তে পারে; তা'হলে গড়ের মাঠ, সুপ্রাইটী সবই দেখ্‌তে পায়।

কথাটা এই, এখন কল্‌কাতায় কেমন করে আসি।

জগতের মাকে পেলে, ভক্তিও পাবে আবার জ্ঞানও পাবে। জ্ঞানও পাবে, আবার ভক্তিও পাবে। ভাব সমাধিতে রূপ দর্শন হয়; আবার নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়, তখন অহং থাকে না, নামরূপ থাকে না।

(ভক্ত ও কর্ম্ম; ভক্তের প্রার্থনা।)

ভক্ত বলে; "মা সকাম কর্ম্মে আমার বড় ভয় হয়। সে কর্ম্মে কামনা আছে। সে কর্ম্ম কর্‌লেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা বড় কঠিন। সকাম কর্ম্ম কর্‌তে গেলে, তোমায় ভুলে যা'ব। তবে এমন কর্ম্মে কাজ নাই। যতদিন না তোমায় লাভ কর্‌তে পারি, ততদিন পর্য্যন্ত যেন কর্ম্ম কমে যায়। যেটুকু কর্ম্ম কর্‌তে হবে, সেটুকু যেন অনাসক্ত হয়ে কর্‌তে পারি। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়! আর যতদিন না তোমায় লাভ কর্ত্তে পারি, ততদিন যেন নূতন কর্ম্ম জড়াতে মন না যায়। তবে যখন তুমি আদেশ কর্‌বে, তখন তোমার কর্ম্ম কর্‌বো, নচেৎ নয়।

পণ্ডিত। মহাশয়ের তীর্থে কতদূর যাওয়া হয়েছিল?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, কতক জায়গা দেখেছি। হাজরা অনেক দূর গিছ্‌ল, আর খুব উঁচুতে উঠেছিল, হৃষীকেশ গিছ্‌ল। আমি অতদূরও যাই নাই, অত উঁচুতেও উঠি নাই।

চিল শকুনিও অনেক উচ্চে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। ভাগাড় কি জান? কামিনী ও কাঞ্চন।

যদি এখানে বসে ভক্তি লাভ করিতে পার, তা' হ'লে তীর্থ যাবার কি দরকার? কাশী গিয়ে দেখ্‌লাম সেই গাছ! সেই তেঁতুলপাতা!

তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হ'ল, তাহ'লে তীর্থ যাওয়ার আর ফল হ'ল না। আর ভক্তিই সার, আর একমাত্র প্রয়োজন। চিল শকুনি কি জান? অনেক লোক আছে, তারা লম্বা কথা কয়। আর বলে যে শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্ম কর্‌তে বলেছে, আমরা অনেক করেছি। এ দিকে তাদের মন ভারি বিষয়াসক্ত—টাকা, কড়ি, মান, সম্ভ্রম, দেহের সুখ এ সব নিয়ে ব্যস্ত।

পণ্ডিত। আজ্ঞা হাঁ মহাশয়, তীর্থে যাওয়া যা, আর কৌস্তুভ মণি ফেলে অন্য হীরামাণিক খুঁজে বেড়ানও তা'।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর তুমি এইটি জেনো, হাজার শিক্ষা দাও, সময় না হ'লে ফল হবে না।

ছেলে বিছানায় শোবার সময় মাকে বল্লে 'মা? আমার যখন জাগা পাবে, তখন তুমি আমায় উঠিও।' মা উত্তরে বল্লেন, বাবা হাগাই তোমাকে উঠাবে, এ জন্য তুমি কিছু ভেব না।'

সেইরূপ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হওয়া ঠিক সময় হ'লেই হয়।

(আচার্য্যের তিন শ্রেণী)

তিন রকম বদ্যি আছে।

এক রকম আছে তারা নাড়ী দেখে, ঔষধ ব্যবস্থা ক'রে চলে যায়। কেবল মাত্র রোগীকে ব'লে যায়, ঔষধ খেয়ো হে। এরা অধম থাকের বদ্যি।

সেইরূপ কতকগুলি আচার্য্য আছে। তারা উপদেশ দিয়ে যায়, কিন্তু তাদের উপদেশে লোকের ভাল হ'ল কি মন্দ হ'ল, তা' দেখে না। তা' দেখে না। তা'র জন্য ভাবে না।

কতকগুলি বদ্যি আছে তারা ঔষধ ব্যবস্থা ক'রে রোগীকে ঔষধ খেতে বলে। রোগী যদি খেতে না চায় তা'কে অনেক বুঝায়। মধ্যম থাকের বদ্যি। সেইরূপ মধ্যম থাকের আচার্য্যও আছে। তারা উপদেশ দেয়, আবার অনেক ক'রে লোকদের বুঝায়, যা'তে তা'রা উপদেশ অনুসারে চলে।

আবার উত্তম থাকের বৈদ্য আছে। যদি মিষ্ট কথাতে রোগী না বুঝে তা' হ'লে তা'রা জোর পর্যন্ত করে। যদি দরকার হয়, রোগীর বুকে হাঁটু দিয়ে রোগীকে ঔষধ গিলিয়ে দেয়। সেরূপ আবার উত্তম থাকের আচার্য্য আছে। তাঁরা ঈশ্বরের পথে আনবার জন্য শিষ্যদের উপর জোর পর্য্যন্ত করেন।

পণ্ডিত। মহাশয় যদি উত্তম থাকের আচার্য্য থাকেন, তবে কেন আপনি সময় না হলে জ্ঞান হয় না বল্লেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সত্য বটে। কিন্তু মনে কর ঔষধ যদি পেটে না যায়—যদি মুখ থেকে গড়িয়ে যায়, তা' হ'লে বৈদ্য কি কর্‌বে? উত্তম বৈদ্যও কিছু কর্‌তে পারে না।

(পাত্রাপাত্র)

শ্রীরামকৃষ্ণ। পাত্র দেখে উপদেশ দিতে হয়। তোমরা পাত্র দেখে উপদেশ দাও না। আমার কাছে কেউ ছোকরা এলে আমি আগে জিজ্ঞাসা করি, 'তোর কে আছে'। মনে কর বাপ নাই, হয়তো বাপের ঋণ আছে, তা' হ'লে সে কেমন ক'রে ঈশ্বরে মন দিবে। শুন্‌ছো বাপু?

পণ্ডিত। আজ্ঞা হাঁ আমি সব শুন্‌ছি।

(ঈশ্বরের দয়া)

শ্রীরামকৃষ্ণ। একদিন ঠাকুরবাড়ীতে কতকগুলি শিখ সেপাহী এসেছিল। মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে তাদের সঙ্গে দেখা হ'ল। কথার মধ্যে এক জন বল্লে, 'ঈশ্বর দয়াময়।' আমি বল্লাম, 'বটে? সত্য নাকি? কেমন ক'রে জান্‌লে?' তারা বল্লে, 'কেন মহাশয়, ঈশ্বর আমাদের খাওয়াচ্ছেন, দাওয়াচ্ছেন, এত যত্ন করছেন।' আমি বল্লাম, 'সে কি আশ্চর্য্য? ঈশ্বর যে সকলের বাপ! বাপ ছেলেকে দেখ্‌বে না ত কে দেখ্‌বে? তবে কি ও পাড়ার লোক এসে দেখ্‌বে না কি?

নরেন্দ্র। তবে ঈশ্বরকে দয়াময় বল্‌বো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে কি আমি দয়াময় বল্‌তে বারণ কর্‌ছি? আমার বল্‌বার মানে এই যে, ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক, পর নয়।

পণ্ডিত। কথা অমূল্য।

—•—

"হবে কি মিলন?"

স্থির নীর তটিনীর সম,
বহে যায় প্রাণ-নদী মম;
অকস্মাৎ উঠিল পবন,
তরঙ্গ ছুটিল অগণন।

ধীর ছিল হৃদয় আকাশ,
চঞ্চলতা হয় নি প্রকাশ;
চকিতে বিজলী মধু হাসি',
রেখে গেল ঘোর তমোরাশি।

কৈশোরের চিন্তাহীন মন
স্বভাবেই ছিল নিমগন;
কে সে আসি দিল দরশন,
প্রাণ মোর করিল হরণ?

বিধি, তোরে সুধাই এখন,
যা দেখালি দিবি কি কখন?

—•—

মেয়েলি বারব্রত।

লক্ষ্মীর কথা।

(১)

এক দীনহীন বৃদ্ধার একটিমাত্র পুত্র ছিল। পুত্রটী সারাদিন মাটী কাটে, একদণ্ড অবসর নাই— এমন কি সুস্থ চিত্তে চারিটি খাবারও অবসর পায় না— কেবল কাজ, কেবল কাজ। কিন্তু এত পরিশ্রম করিয়াও দৈন্য দূর করিতে পারে না। একদা পুত্র জননীকে বলিল, "মা, আজ আমার চালের পীঠে খেতে বড় সাধ হয়েছে, পীঠে ভেজে দাও।" মাতা পুত্রের বাসনা পূরণের জন্য পীঠে ভাজিল। কিন্তু পুত্রের সুস্থ হইয়া খাবার সময়ের অভাব। দুদণ্ড বসে আরামে পীঠে খেলে কল্য উপোস্‌পোড়ে থাক্‌তে হ'বে, কারণ মনিবের নিয়মিত কাজ পূরিয়া না দিতে পারিলে বেতন পাইবে না। তাই তাহার মাতা একটা ঝোলায় পীঠে ভরিয়া পুত্রের গলদেশে বাঁধিয়া দিল। পুত্র মাঠে সভুর কাজ করছে ও মধ্যে মধ্যে খোড়ায়, মস্ত রোদের

ভিতর মুখ দিয়া পীঠে খাচ্ছে। এমন সময় লক্ষ্মী নারায়ণ সেইস্থান দিয়া যাইতেছিলেন। নারায়ণ তাহার দুঃখ দেখিয়া লক্ষ্মীকে তৎপ্রতি কৃপা দৃষ্টি করিতে বলিলেন। কমলা তদুত্তরে বলিলেন,—"উহার কোন্ স্থানে দৃষ্টি করিব? উহার ঘর দুয়ার আবর্জ্জনাময়— অপবিত্র; উহার মা অলক্ষ্মী— আমার পূজা করে না; উহার মাথায় আঠা— পরিষ্কার করে না; দাঁতে ছাতা— পূতিগন্ধময়; উহার কটিদেশে শতগ্রন্থি দেওয়া মলিন বসন— উহার কোন স্থানেই আমার দৃষ্টি পড়িতে পারে না।"

নারায়ণ পুনরায় বলিলেন,—"ঐ দেখ, উহার গলদেশে পীঠক আছে, তাহার উপর দৃষ্টি কর।"

কমলা তখন প্রণয় কোপ সহকারে বলিলেন,—"তোমার সঙ্গে আর পারিয়া উঠি না। আর কখনও তোমার সঙ্গে রাস্তায় বেরোবনা। পথে যাহাকে দেখিবে তাহার দিকেই তাকাইতে বলিবে। ও মা, পুরুষমানুষের দিকে তাকাইতে বলিতে লজ্জাও করে না!" এই বলিয়া লক্ষ্মী পীঠের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি পীঠে সুবর্ণ হইয়া গেল। তাহার পর সে পীঠে খেতে ঝোলায় মুখ দিয়ে দেখে যে পীঠে শক্ত। তখন সে রেগে বাড়ী যাইয়া তাহার জননীকে বলিল,—

"নে তোর পীঠে, চাইনা খেতে। কোথা হ'তে গুচ্ছের পাথর কুড়িয়ে দিয়েছে।"

পুত্র ক্রোধভরে পীঠের ঝোলা নিক্ষেপ করিলে, জননী দেখে যে পীঠে সব সোণা হইয়া গিয়াছে। তখন সে পুত্রকে বলিল,—"কাল লক্ষ্মী পূজা করিতে হইবে। এই দেখ তাঁহার দৃষ্টিতে পীঠে সোণা হয়ে গিয়াছে।" এই হইতেই তাহাদের দৈন্য ঘুচিয়া গেল। চৌকোঠা মিলান বাড়ী হইল, অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইল।

(২)

এক ব্রাহ্মণের এক কন্যা ও এক পুত্র ছিল। একদা ব্রাহ্মণী পৈতা কাটিতেছে এমন সময় পুত্র পাড়ার অন্য এক ছেলের হাতে নাড়ু দেখিয়া আসিয়া নাড়ু খাইবার জন্য মাতার নিকট ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ সেথায় একজন নাড়ু বিক্রয় করিতে উপস্থিত হইল। লক্ষ্মীও কুকুর

হইয়া তৎপশ্চাৎ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণী পুত্রের জন্য নাড়ু ক্রয় করিতেছেন, এমন সময় কুকুরটি যাই লেজ মোড়া দিল অমনি একটি কড়ি পড়িল। গৃহিনী কড়িটি কুড়াইয়া ডালায় রাখিলেন। পরে নাড়ু ক্রয় করিয়া মূল্য স্বরূপ সেই কড়িটী দিলেন। কিন্তু ডালায় প্রতি ফিরিয়া দেখেন যে, সে এক কড়া কড়ি আছে-ই।

পুত্র দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধিপাইতে লাগিল। এদিকে কড়িটিও যেন অক্ষয়, গৃহিনী কত কাজে কতবার ব্যয় করেন, কিন্তু ফিরিয়া যাইয়া দেখেন, সেখানকার কড়ি সেই খানেই আছে। ক্রমে ক্রমে সেই এক কড়া কড়ি হইতে তাহাদের প্রকাণ্ড বাড়ী হইল।

তাহার পর পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। ব্রাহ্মণী তাহার বিবাহ দিলেন। পুত্রবধূকে দেখিয়া জননী যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু অচিরেই বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইল—বধূ যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে তাহাই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। যে জিনিষ আনিতে যায়, তাহাই হয় হাতে হইতে পড়িয়া, না হয় পা'লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। প্রত্যেক পণ্ড কার্য্যেই ব্রাহ্মণী বধূকে সাবধান করেন যে, আমার কড়ার জিনিস ভাঙ্গিও না।"

একদিন বধূ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার মা প্রত্যেক কাজেই 'কড়ার জিনিষ বলেন কেন?"

স্বামী বলিল,—"এক কুকুরের লেজ হইতে এক কড়া কড়ি পড়িয়াছিল। সেই কড়া দিয়া প্রথমে আমি নাড়ু কিনিয়া খাই। কড়িটি অক্ষয় কিছুতেই আমাদের ঘর ছাড়ে না। সেই এক কড়া কড়ি হইতেই আমাদের এত উন্নতি। ইহাতেই মা বলিয়া থাকেন যে, আমার কড়ার সংসার।"

কড়ার কথা শুনিয়া বধূ বলিল যে, আমি এই কড়ার সংসার করি? আর করিব না। এই বলিয়া সে রাত্রে উনুনের মধ্যে মাছের কাঁটা ও খোঁসা রাখিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিল। প্রাতে ব্রাহ্মণী ঘরে যাইয়া দেখে, বধূ কোন কাজ না করিয়া উনুনের মধ্যে কাঁটা খোঁসা রাখিয়া বসিয়া আছে। কি করেন? তিনি নিজেই সব পরিষ্কার করিয়া স্নান করিয়া এলেন। পর দিবসও ঐরূপ। তখন গৃহিনী পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বধূ এরূপ করে কেন? পুত্র বলিল, আমি তাহাকে কড়ির কথা বলিয়াছি।

অতঃপর ব্রাহ্মণী পুত্রবধূর উপর রাগ করিয়া কড়ির ডালাটী লইয়া গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলা কমলাও অন্তর্ধ্যান হইল। জঙ্গলে রাখালেরা গরু চরাইতেছিল, ব্রাহ্মণী তাহাদিগকে বলিলেন যে, তোমরা আমাকে এই বনের মধ্যে এখনি একখানা কুটির নির্ম্মাণ করিয়া দাও, আমি তোমাদিগকে পায়েস খাওয়াইব। রাখালেরা তাহাই করিল। তিনি পায়েস রাঁধিয়া তেঁতুলের পাত পাতিয়া ঝিনুকে করিয়া তুলিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইলেন। পরে সেই কাননস্থিত পর্ণকুটিরে অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মণী প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন। বাড়ী নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইলে পুষ্করিণী খনন করিতে আরম্ভ করিয়া ঢেরা পিটিয়া দিলেন যে, যে একডালি মাটি কাটিবে সে দুইডালি কড়ি পাইবে। এদিকে ব্রাহ্মণী বাড়ীত্যাগ করিয়া যাওয়ার পর হইতে তাহার পুত্র ও পুত্রবধূর দুঃখের সূচনা হয়। এখন তাহারা আহারাভাবে মৃতপ্রায় হইয়াছে। ঐ ঘোষনা শুনিয়া বধূ স্বামীকে বলিল যে, তুমি যাইয়া একডালি মাটি কাটিয়া আইস, আর অনাহারে থাকা যায় না। পুত্র কি করে—মাটি কাটিতে গেল। ব্রাহ্মণী তাহার দাস দাসীকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যে মাটি কাটিতে কাটিতে বলিবে, "মা তুমি থাকিতে আমার এত কষ্ট ছিল না" তাহাকে আমার নিকট লইয়া যাইবে। পুত্র যাইয়া মাটিতে কোপ দিয়া কাঁদিয়া বলিল, "মা তুমি থাকিতে আমার এত কষ্ট ছিল না।" পুত্র এই কথা বলিতেই ব্রাহ্মণীর ভৃত্যগণ তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। ব্রাহ্মণী পুত্রকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে নাপিত দিয়া কামাইয়া, বিষ্ণু তৈল মাখাইয়া স্নান করাইলেন। পরে নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্যে পুত্রকে খাওয়াইলেন। পুত্র তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া বলিল, "মা, আজকে মা যেমন খাওয়ান সেইরূপ খেলাম।"

মাতা বলিলেন,—"না বাপু, মা কি ভাল! বৌ-ই ভাল!

পুত্র। না,—মা-ই ভাল। তুমি উহার কথা আর কহিও না। আমি উহাকে আর গ্রহণ করিব না।"

মাতা কিছুতেই সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, বধূকে আনাইলেন। বধূ স্বামীর ঘর সংসার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণী স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

উৎসাহ।

পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সাহা প্রবর্ত্তিত।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত।

৫ম বর্ষ। } চৈত্র; ১৩০৮। { ৫ম সংখ্যা।

যদি।

আমি যদি শুধু হ'তাম তাহার
কবরীর ফুল হায়,—
নিবিড় আঁধার কেশের পরশে
উঠিতাম ফুটি' আকুল হরষে
চিকন চিকুরে ত'ার,
এহৃদয় করি'খালি অলকে দিতাম ঢালি'
আমার সুরভিভার।
হয় ত দেখিতে চাহি' ক্ষণেকের তরে,—
কোন্ ফুল-মালা হ'তে এসৌরভ ঝরে?

আমি যদি তা'র কমল চরণে
হ'তাম নূপুর খানি,—
গুঞ্জরি'উঠি' গৌরভ মদে
করিতাম তা'র প্রতি-পদে পদে
কৌতুক কানাকানি।

গুঞ্জি'চরণতলে কহিতাম কত ছলে
হৃদয়ের আশাবাণী।
হয়ত অধীরালাজে চাহিত চরণে,
মুখর নুপুর কেন বাজে ক্ষণে ক্ষণে ?

আমি যদি তা'র হ'তাম কাঁকন
কোমল করের সাথী,—
কম্বুকলালন পরশে আমার
কম করখানি বেড়ি'ধরি তা'র
রহিতাম দিবারাতি;
সে কোমলকরলীন বাজিতাম নিশিদিন
পরশহরষে মাতি'।
হয়ত আমারে চাহি' ভাবিত, কি চাহি'
অধীর কাঁকন মরে দিবানিশি গাহি' ?

আমি যদি শুধু হ'তাম হীরক
হারলতা মাঝে বুকে,—
নিশ্বাস সাথে কাঁপি'চঞ্চল
লভিয়া দীপ্তি আসিত উজল
রহিতাম শত সুখে;
হরষে উরষে পশি, রহিতাম দিবানিশি
চাহি' শুধু তা'র মুখে।
হয়ত হেরিয়া মোরে ভাবিত কেবল,
তা'রি বুকে মণি কেন এত সমুজ্জ্বল !

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সহমরণ।

যোগেন্দ্রনাথ পিতৃমাতৃ হীন, অবস্থাও নিতান্ত হীন। তাহার এক দূরসম্পর্কীয় কাকার অন্নে পালিত হইয়া যোগেন্দ্র লেখা পড়া শিক্ষা করে। কাকা দূরের হইলেও তাহাকে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। যোগেন্ও তাঁহার যত্নে ও স্নেহে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই পিতা জ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত।

খুড়ার সংসারে পালিত হইয়াই যোগেন্ বিংশবর্ষ বয়ক্রম কালে বি-এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। খুড়া তখন তাহার বিবাহের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে পাত্রিও মিলিল। তিনি কেবলমাত্র বিবাহের খরচটি লইয়া বি-এ পাশ করা ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে এক গরীব ব্রাহ্মণের নবম বর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে অনুমতি করিলেন।

একটা কথা বলিতে ভ্রম হইয়াছে। যোগেন্ শৈশব হইতেই কিছু সন্দিগ্ধমনা। পায়খানা হইতে আসিয়া একহাত পাঁচবার ধৌত করে, আহার করারপর পান খাইতে খাইতে তাহার মনে হয়, বুঝিবা গালে ডাল লাগিয়া আছে। যেই মনে হওয়া অমনি গালের পান নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় মুখ প্রক্ষালন করে। এইরূপ অনেক কার্য্যেই তাহার চিত্তচঞ্চলতা প্রকাশ পাইত। কিন্তু এসকল তত মারাত্মক নহে। বিবাহের পর হইতে স্ত্রী জাতির উপর তাহার বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হয়। স্ত্রী জাতির মনোভাবের বিচিত্র পরিবর্ত্তন, কামনা ও বিভ্রমের উদ্দীপনা পূর্ণ মিশ্র ঝঙ্কারকে সে নারীজীবনের পরুষকলুষিত অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা বলিয়া মনে করিত। অধিকন্তু তাহার বিবাহের পর দুইটি বৎসর ক্রমান্বয়ে তাহার স্ত্রী পিত্রালয়ে ছিল। এত দীর্ঘ কাল পিত্রালয়ে থাকিবার কারণ, তাহার পিতৃকল্প খুড়া মহাশয় মনে করিয়াছিলেন যে, বধূর বয়স অল্প, যোগেন্ও উপার্জ্জনক্ষম নহে। দুইটি বৎসর পর সে ওকালতী পাশ করিলে, বধূকে আনাইবেন। কার্য্যেও তাহাই হইল। দুই বৎসর পর যোগেন্ ওকালতী পরীক্ষায় পাশ হইলে স্ত্রী আনিত হইল। কিন্তু খুড়া মহাশয় জানিলেন না যে তাঁহার

এইরূপ সংশয় শূন্য সৎউদ্দেশ্যের ফলে, যোগেনের মানসপটে স্মরণের সন্দেহ রাশি পুঞ্জীকৃত হইল, তাহার সেই বাইশ বৎসরের বাসনা ব্যাপ্ত বেদনা-বিদ্ধ যৌবনের প্রতি প্রকৃতির তীব্র বিদ্রূপ বলিয়া প্রতীতি হইল।

যাহা হউক ওকালতী পাশ করার একমাস পর ব্যবসা করিতে যোগেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক বর্দ্ধমানে আসিলেন। এইবার অভিভাবক বর্জ্জিত হইয়া তাহার সন্দেহ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। এতদিন কাকার ভয়ে তাহার সন্দেহ প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিতে পারে নাই। এখন রাখিয়া ঢাকিয়া, বিশ্বাসে ও সন্দেহে দোলাইয়া, আদরে ও অনাদরে মিশাইয়া প্রবীন সতর্কতার সহিত সে স্ত্রীর চরিত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে কাছারি হইতে অকস্মাৎ বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইত। পুরুষ ভৃত্যদিগকে নিভৃতে ডাকিয়া কত কি জিজ্ঞাসা করিত। স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা অবহেলিতা কামিনী ইহার বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারিতেন না। সে সরলভাবে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে স্বামীর সেবা করিত, অকপটে হৃদয়ভাব প্রকাশ করিত। কিন্তু সন্দিগ্ধমনা যোগেন্দ্রনাথ সে সমস্তই নারীজীবনের অনতিক্রমনীয় কপটতা মাত্র মনে করিত। সুকুমারী কামিনীর পুণ্যপুঞ্জময় পবিত্র সৌন্দর্য্য তাহার দুরবগাহ অন্ধকার পূর্ণ হৃদয়ে প্রতিফলিত হইতে পারিত না, কামিনীর প্রেমপূর্ণ-সুখ-শীতল হৃদয়ের অমৃত স্পর্শে, তাঁহার চিন্তার কর-রেখা-চিহ্ন চির দগ্ধজীবনের সংশয় কালিমা অপসারিত হইতে পারিত না।

যোগেন্দ্রের সন্দেহের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে শত সংশয় সহস্র সন্দেহের হিল্লোলে ঘূরিতে লাগিল। সংশয়ের বৃদ্ধির সহিত তাহার সাহসও বৃদ্ধি হইল। সে প্রকাশ্যে চাকরাণীকে ডাকিয়া কামিনীর চরিত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইল। কথা কামিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল। পদ দলিতা ও উপেক্ষা কামিনী শাবক নাশাশঙ্কায় উপদ্রুতা ও উদ্বেজিতা হংসীর ন্যায় মর্ম্মনিহিত শোকবহ্নি প্রচণ্ডবেগে উদ্গীরণ করিল। সে অগ্নিতে ভগবান মকর-কেতনের ফুলধনু পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। যোগেন্দ্র পত্নীকে গৃহে আটকাইয়া দ্বারে তালা দিয়া কাছারিতে গেল।

বর্দ্ধমানে জজ আদালতে কামিনীর এক ভ্রাতা কার্য্য করিত। কামিনী কোন প্রকারে গৃহ হইতে বিনির্গত হইয়া, ভ্রাতৃভবনে উপনীত হইয়া

ভ্রাতৃবধূকে তাহার দুঃখের সমস্ত কথা বলিল। ভ্রাতৃজায়া তাহাকে অনেক সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়া বলিয়া দিলেন, "তুমি এখন বাড়ী যাও, যোগেন্ আসিয়া তোমাকে না দেখিতে পাইলে আরও কুপিত হইবেন। সে কাছারি হইতে আসুক, তোমার নিকট পাঠাইয়া দিব।"

যোগেন কাছারি হইতে আসিয়া স্ত্রীকে বাহিরে দেখিয়া বলিল,— ঘরের দরজা কে খুলিল? কে আসিয়াছিল?

স্বামীর উৎপীড়নে কামিনীর সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙ্গিয়াছিল। সে দৃঢ়ভাবে বলিল,— কেহ আসে নাই,— আমি দাদার বাসায় গিয়াছিলাম।

যোগেন চক্ষু জবাপুষ্পতুল্য রক্তিম করিয়া বলিল,—

কেন গিয়াছিলে?

কামিনী পূর্ব্ববৎ বলিল,—

সে আমার খুসী। তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার।

সেই দিবস হইতে যোগেন স্ত্রীকে অতি কঠোরতার সহিত গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিল। এদিকে স্ত্রীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের ফলে, সহরময় কুৎসা রটিতে লাগিল।

সেই দিবস সন্ধ্যার পর কামিনীর ভ্রাতা রাধাচরণ বাবু যোগেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। যোগেন তাঁহাকে দেখিয়াই অতি অকথ্যভাবে সম্বোধন পূর্ব্বক, এমন কি প্রকাশ্যে তাঁহাকে কামিনীর উপপতি বলিয়া তিরস্কার করিয়া বিতাড়িত করিল। হায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী সুশিক্ষিত যুবক! তোমরা মিল, কোমত, সেক্ষপীয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ; সেলি, দান্তে, গেটে পড়িয়া যে কি শিক্ষা লাভ করিয়াছ, কুসংস্কারান্ধদেশের ভ্রান্তজীব—আমরা তাহা কেমন করিয়া জানিব!!

রাধাচরণ বাবু অপমানিত হইয়া গৃহে যাইয়া ঝি-দ্বারা গোপনে কামিনীকে বলাইয়া পাঠাইলেন, তিনি কল্য সাহেবের নিকট বিদায়ের প্রার্থনা করিবেন। বিদায় পাইলে তাহাকে সংবাদ দিবে। পরে তাহাকে লইয়া যোগেনের খুড়ার নিকট রাখিয়া আসিবে।

তৎপরদিবস রাধাচরণ বাবু সাহেবের নিকট সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া

পাঁচ দিবসের বিদায় লইলেন। সকাল সকাল আফিস হইতে আসিয়া কামিনীকে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, আগামী কল্য রাত্রি ৮টার ট্রেনে তিনি তাহাকে লইয়া যাইবেন। সে যেন সন্ধ্যার সময় খিড়্কির দ্বারে উপস্থিত থাকে।

পত্রখানি পাঠ করিয়া কামিনী বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিল। পরে প্রহরী পরিবেষ্টিতা হইয়া রজনী অতিবাহিত করিল। পরদিবস স্নানের সময় পত্রখানি বালিসের নীচে রাখিয়া কামিনী স্নানে গেল। ফিরিয়া আসিয়া পত্রখানি তুলিতে ভুলিয়া গেল। সন্দিগ্ধমনা যোগেন প্রত্যহ প্রতিদণ্ডে বাড়ীর সমস্ত দ্রব্য তন্ন তন্ন করিয়া দেখিত। কামিনী স্নানে গেলে সে বিছানা অন্বেষণ করিতে করিতে পত্রখানি পাইল। পত্র পাঠ করিয়া যোগেনের মনোভাব যেরূপ হইল, তাহা লেখনী মুখে ব্যক্ত করিতে ক্ষুদ্র লেখক নিতান্ত অশক্ত। সে যেন ঈর্ষার জলন্ত চুল্লীতে দগ্ধ হইতে লাগিল।

আহারাদির পর কামিনী খিড়্কির দরজার কাছে ঘুরিতেছে। তখনও বেলা ছিল, তপনও লোকান্তরগত মার্ত্তণ্ডদেবের অন্ত্যেষ্টি আড়ম্বরের শেষ কর রেখা পশ্চিমাকাশের ভিমির শ্মশানে লাগিয়াছিল। এমন সময় তাহার সেই পত্রখানির কথা মনে পড়িল। মনে হইতেই সে দ্রুতপাদবিক্ষেপে গৃহে প্রবেশ করিল।

গৃহে প্রবেশ করিতেই এক রকম শব্দে সে কাঁপিয়া উঠিল। পরে চক্ষু মেলিয়া দেখে, তাহার স্বামী মেজেতে গড়াগড়ি যাইতেছে, মুখবিবর হইতে ফেণপুঞ্জ বিনির্গত হইতেছে, চক্ষুতারকা কপালে উঠিয়াছে আর থাকিয়া থাকিয়া সেই অব্যক্ত ভীষণ গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে। দক্ষিণ হস্ত অর্দ্ধ মুষ্টিবদ্ধ। তন্মধ্যে পত্রখানি দেখা যাইতেছে। কামিনী তাড়াতাড়ি স্বামীর হস্ত হইতে পত্রখানি ছিনিয়া লইয়া, ডাক্তার ডাকিতে লোক পাঠাইল। কিন্তু ডাক্তার আসিতে না আসিতে সে ভগ্ন প্রণয়শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া সেই অনাবিষ্কৃত চির অন্ধকারময় মৃত্যুর রাজ্যে প্রস্থান করিল।

কিছুক্ষণ পর রাধাচরণ খিড়্কির দ্বারে আসিয়া ডাকিল,—"কামিনী!" কামিনী বলিল, "দাদা যাই!"

তাহার পর যোগেন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া লোকজন গৃহে আসিলে,

কামিনীর মৃতদেহ স্বামীর পার্শ্বে পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল। আশ্চর্য্য পতিভক্তি প্রদর্শন করিয়া স্বর্গের কামিনী স্বর্গে চলিয়া গেল।

পবিত্র সুন্দর।

(আদর্শ-অনুসরণ।)

পবিত্রাত্মা যীশু বলিয়াছেন—Blessed are the pure in spirit for they shall see God.

ধর্ম্ম জগতে যত কথা উক্ত হইয়াছে ইহা তাহার মধ্যে একটি প্রধান বলিয়া মনে হয়। এই অমূল্য উক্তির উপযোগিতা ও আবশ্যকতা জীবনে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলে মানব কৃতার্থ হইয়া যায়।

কথাটী আমরা সর্ব্বপ্রথমেই একটি পুরাতন উপমা দিয়া বলি। নির্ম্মল সরসী জলেই রবিরশ্মি ও চন্দ্রকর সুন্দর রূপে প্রতিফলিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হয়। আকাশের অনন্ত মাধুরী, স্বর্গের বিমল জ্যোতি সমল সলিলে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। নির্ম্মল দর্পণেই প্রতিকৃতি সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। ঠিক এমনি আধ্যাত্মিক জগতে। বিশুদ্ধ পবিত্র হৃদয় দেব মন্দির; পুণ্যময় দেবতার পীঠস্থান; সেখানে তাঁহার মুখচ্ছবি বিমল জ্যোতিতে প্রতিভাত হয়। পাপপঙ্কিল হৃদয়ে তাঁহার সে রূপ মাধুরী ফুটিবার অবসর পায় না। সেখানে তিনি থাকিয়াও নাই— যেমন সমল সলিলে চন্দ্রকর পতিত হয় না তাহা নহে উহা চন্দ্রকে বক্ষে দেখিতে পায় না।

সুতরাং পবিত্র হৃদয়ই ধর্ম্ম জগতের আদি সোপান। ইহা ব্যতীত ধর্ম্মলাভ অসার অলীক জল্পনা মাত্র। এই পবিত্রতা যেমন আদিতে— ইহাই মধ্যে, ইহাই অন্তে— সমভাবে বিরাজিত। স্থির চিত্তে মানব জন্মের গূঢ়

রহস্যের কথা একটু ভাবিলেই এই সত্যই হৃদয়ে স্বাভাবিক উজ্জ্বল রূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে।

মানবের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা জন নানা মত প্রচার করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের সুবিজ্ঞ দার্শনিক মতের সত্যাসত্য বিচার করিতে চাই না। আমরা সহজ জ্ঞানের আলোকে বুঝি যে সেই মঙ্গলময় পুরুষ মানবকে "পরিণতি" দিবার জন্য এখানে আনিয়াছেন। সুখে দুঃখে, বিপদে পরীক্ষায় মানব অবিরাম সেই পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। যেরূপেই হউক সেই পরিণতি তাহাকে লাভ করিতে হইবে— নচেৎ গত্যন্তর নাই।

সে পরিণতি, ধন জন, মান বিদ্যা ইহাদের কিছুতেই নাই। পরিণতি অর্থে মানবের সকল বৃত্তির পূর্ণ চরিতার্থতা বা পরিপাক সাধন। সকল আশা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি তাহার চরিত্রের সকল দিকের পূর্ণ বিকাশ।

বিদ্যায় সে চরিত্রের এক অংশ পরিতৃপ্ত হইতে পারে— গৌরবে অন্য অংশ হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন তৃপ্তি এ সকলে অসম্ভব।

যদি মানুষের অনন্ত পিপাসা হয় তবে তাহা অনন্ত সমুদ্র ব্যতীত কে নিবারণ করিতে পারে? অনন্তের তৃপ্তি শুধু অনন্তেই সম্ভবে।

মানবের আশা অনন্ত আকাঙ্ক্ষা অনন্ত; সুতরাং সেই পূর্ণ অনন্ত ব্যতীত আর কেহই তাহার আদর্শ হইতে পারে না।

মানব তাহার পরিণতি এই অনন্তের দিকে চলিয়াছে। এখানে তাহার সহায় কে?

অনন্তই তাহার সহায়। তিনিই উদ্দেশ্য তিনিই উপায়; তিনিই লক্ষ্য, তিনিই আবার লক্ষ্যের পথপ্রদর্শক।

তিনি অন্তরে "বিবেক" ও বাহিরে "প্রকৃতি" রূপে বিরাজিত থাকিয়া মানুষকে তাহার পরিণতির দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন।

এই প্রকৃতির অনেক মূর্ত্তি আছে। কিন্তু সকল মূর্ত্তিতেই সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট। আমরা প্রকৃতির দিকে চাই, দেখি তাহার অতুল্য নিকেতনে সৌন্দর্য্যের মেলা বসিয়াছে। সেখানে সৌন্দর্য্য হাজারে হাজারে ছড়ান। অপূর্ব্ব সুন্দর-সমাবেশ!! প্রকৃতির হাসি সুন্দর, ক্রন্দন সুন্দর; আলো

সুন্দর—ছায়া সুন্দর। কাহার পানে চাহিবে? ঐ দেখ তরঙ্গময়ী তটিনী মৃদুকলতানে সাগর সঙ্গমে ছুটিয়াছে— তটিনী সুন্দর। দেখ পূর্ণচন্দ্র রজত কৌমুদি ধারায় জগতের কণ্ঠে অপূর্ব্ব জ্যোতি হার পরাইয়া দিয়া গগন প্রাঙ্গনে বিরাজিত— চন্দ্র সুন্দর।

মধুমাখা পাপিয়ার সুধাকণ্ঠে আকাশ পরিপূর্ণ; কুসুম সুবাসে মলয় সমীরণ সৌরভাকুল—পাপিয়া সুন্দর, কুসুম সুন্দর। হিম গিরি অনন্ত তুষার মাথায় ধরিয়া যোগমগ্ন; পদতলে ফীণা নির্ঝরিণীর সূক্ষ্ম রজতধারা— হিমাচল সুন্দর—নির্ঝর সুন্দর। সকলি সুন্দর—সকলি শোভাময়!!

এখন একবার এই সৌন্দর্য্যরাশির অন্তরতম স্থলে সূক্ষ্মদৃষ্টি নিক্ষেপ কর এই সৌন্দর্য্যের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেখ— দেখিবে মানবীর হৃদয়ে পবিত্র রাম নামের ন্যায় উহার অভ্যন্তরে স্তরে স্তরে পবিত্রতা অঙ্কিত রহিয়াছে। কুসুম সুগন্ধ অতি গাঢ়ভাবে আঘ্রাণ কর— তাহার প্রাণের প্রাণটুকু শুষিয়া লও দেখিবে পবিত্রতার গন্ধ। চন্দ্রের স্নিগ্ধতা পবিত্রতার স্নিগ্ধতা। পাপিয়ার সুরে পবিত্রতার লহরী। প্রকৃতি সুন্দরী-প্রকৃতি পবিত্রতাময়ী।

* * * *

প্রকৃতি এই রূপে আপনার সৌন্দর্য্য ডালি লইয়া পবিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ডাকিতেছে— এস পরিণতি পথের ব্যাকুল পথিক, আমার সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া আমি তোমাকে আমার সৌন্দর্য্যের মূল উৎস পবিত্র স্বরূপে লইয়া যাইব। ভগবান প্রকৃতির মধ্য দিয়া আমাদিগকে তাঁহার পবিত্রতার অংশ লইতে ডাকিতেছেন। এইবার বাহিরের প্রকৃতি ছাড়িয়া, অন্তর জগতে প্রবেশ করি সেখানে দেখি পবিত্রতার জন্য বিরাট আয়োজন বিবেকের কাঁটা দিক দর্শন সলাকার ন্যায় সর্ব্বদাই এই পবিত্রতার দিকে আমাদিগকে পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহা বিমল আত্মপ্রসাদ রূপে, নির্ম্মল শান্তি সৌভাগ্য রূপে—ভগবানের প্রসন্ন দৃষ্টিরূপে সর্ব্বদাই আমাদিগকে পবিত্রতার লক্ষ্যে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমরা অধর্ম্মের পথে অগ্রসর হই—স্বার্থ সাধনের জন্য অপবিত্রতাকে আলিঙ্গন করি—ধন মান ঐশ্বর্য্য লাভের প্রত্যাশায় অসৎ মার্গ অবলম্বন করি—আমরা তাহাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ করিলেও— প্রাণে শান্তি লাভ করিতে পারি না—

রহস্যের কথা একটু ভাবিলেই এই সত্যই হৃদয়ে স্বাভাবিক উজ্জ্বল রূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে।

মানবের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা জন নানা মত প্রচার করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের সুবিজ্ঞ দার্শনিক মতের সত্যাসত্য বিচার করিতে চাই না। আমরা সহজ জ্ঞানের আলোকে বুঝি যে সেই মঙ্গলময় পুরুষ মানবকে "পরিণতি" দিবার জন্য এখানে আনিয়াছেন। সুখে দুঃখে, বিপদে পরীক্ষায় মানব অবিরাম সেই পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। যেরূপেই হউক সেই পরিণতি তাহাকে লাভ করিতে হইবে— নচেৎ গত্যন্তর নাই।

সে পরিণতি, ধন জন, মান বিদ্যা ইহাদের কিছুতেই নাই। পরিণতি অর্থে মানবের সকল বৃত্তির পূর্ণ চরিতার্থতা বা পরিপাক সাধন। সকল আশা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি তাহার চরিত্রের সকল দিকের পূর্ণ বিকাশ।

বিদ্যায় সে চরিত্রের এক অংশ পরিতৃপ্ত হইতে পারে— গৌরবে অন্য অংশ হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন তৃপ্তি এ সকলে অসম্ভব।

যদি মানুষের অনন্ত পিপাসা হয় তবে তাহা অনন্ত সমুদ্র ব্যতীত কে নিবারণ করিতে পারে? অনন্তের তৃপ্তি শুধু অনন্তেই সম্ভবে।

মানবের আশা অনন্ত আকাঙ্ক্ষা অনন্ত; সুতরাং সেই পূর্ণ অনন্ত ব্যতীত আর কেহই তাহার আদর্শ হইতে পারে না।

মানব তাহার পরিণতি এই অনন্তের দিকে চলিয়াছে। এখানে তাহার সহায় কে?

অনন্তই তাহার সহায়। তিনিই উদ্দেশ্য তিনিই উপায়; তিনিই লক্ষ্য, তিনিই আবার লক্ষ্যের পথপ্রদর্শক।

তিনি অন্তরে "বিবেক" ও বাহিরে "প্রকৃতি" রূপে বিরাজিত থাকিয়া মানুষকে তাহার পরিণতির দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন।

এই প্রকৃতির অনেক মূর্ত্তি আছে। কিন্তু সকল মূর্ত্তিতেই সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট। আমরা প্রকৃতির দিকে চাই, দেখি তাহার অতুল্য নিকেতনে সৌন্দর্য্যের মেলা বসিয়াছে। সেখানে সৌন্দর্য্য হাজারে হাজারে ছড়ান। অপূর্ব্ব সুন্দর-সমাবেশ!! প্রকৃতির হাসি সুন্দর, ক্রন্দন সুন্দর; আলো

সুন্দর—ছায়া সুন্দর। কাহার পানে চাহিবে? ঐ দেখ তরঙ্গময়ী তটিনী মৃদুকলতানে সাগর সঙ্গমে ছুটিয়াছে— তটিনী সুন্দর। দেখ পূর্ণচন্দ্র রজত কৌমুদি ধারায় জগতের কণ্ঠে অপূর্ব্ব জ্যোতি হার পরাইয়া দিয়া গগন প্রাঙ্গনে বিরাজিত— চন্দ্র সুন্দর।

মধুমাখা পাপিয়ার সুধাকণ্ঠে আকাশ পরিপূর্ণ; কুসুম সুবাসে মলয় সমীরণ সৌরভাকুল—পাপিয়া সুন্দর, কুসুম সুন্দর। হিম গিরি অনন্ত তুষার মাথায় ধরিয়া যোগমগ্ন; পদতলে ফীণা নির্ঝরিণীর সূক্ষ্ম রজতধারা— হিমাচল সুন্দর—নির্ঝর সুন্দর। সকলি সুন্দর—সকলি শোভাময়!!

এখন একবার এই সৌন্দর্য্যরাশির অন্তরতম স্থলে সূক্ষ্মদৃষ্টি নিক্ষেপ কর এই সৌন্দর্য্যের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেখ— দেখিবে মানবীর হৃদয়ে পবিত্র নাম নামের ন্যায় উহার অভ্যন্তরে স্তরে স্তরে পবিত্রতা অঙ্কিত রহিয়াছে। কুসুম সুগন্ধ অতি গাঢ়ভাবে আঘ্রাণ কর— তাহার প্রাণের প্রাণটুকু শুষিয়া লও দেখিবে পবিত্রতার গন্ধ। চন্দ্রের স্নিগ্ধতা পবিত্রতার স্নিগ্ধতা। পাপিয়ার সুরে পবিত্রতার লহরী। প্রকৃতি সুন্দরী-প্রকৃতি পবিত্রতাময়ী।

* * * *

প্রকৃতি এই রূপে আপনার সৌন্দর্য্য ডালি লইয়া পবিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ডাকিতেছে— এস পরিণতি পথের ব্যাকুল পথিক, আমার সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া আমি তোমাকে আমার সৌন্দর্য্যের মূল উৎস পবিত্র স্বরূপে লইয়া যাইব। ভগবান প্রকৃতির মধ্য দিয়া আমাদিগকে তাঁহার পবিত্রতার অংশ লইতে ডাকিতেছেন। এইবার বাহিরের প্রকৃতি ছাড়িয়া, অন্তর জগতে প্রবেশ করি সেখানে দেখি পবিত্রতার জন্য বিরাট আয়োজন বিবেকের কাঁটা দিক দর্শন সলাকার ন্যায় সর্ব্বদাই এই পবিত্রতার দিকে আমাদিগকে পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহা বিমল আত্মপ্রসাদ রূপে, নির্ম্মল শান্তি সৌভাগ্য রূপে—ভগবানের প্রসন্ন দৃষ্টিরূপে সর্ব্বদাই আমাদিগকে পবিত্রতার লক্ষ্যে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমরা অধর্ম্মের পথে অগ্রসর হই—স্বার্থ সাধনের জন্য অপবিত্রতাকে আলিঙ্গন করি—ধন মান ঐশ্বর্য্য লাভের প্রত্যাশায় অসৎ মার্গ অবলম্বন করি—আমরা তাহাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ করিলেও— প্রাণে শান্তি লাভ করিতে পারি না—

বিবেক সর্ব্বদাই অন্তরে কশাঘাত করিতে থাকে এবং জলদগম্ভীর স্বরে আমাদিগকে এই কথা বলে— হে মানব আপাত মধুর সুখে মোহে মজিও না—তোমার সুখ সম্পদের অন্তরালে ঐ দেখ সয়তান আপনার অন্ধকারময় দলবল লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে অচিরে তোমার বিনাশ সাধন করিবে।— গতি পরিবর্ত্তন কর—মুখ ফিরাও; দেখ তোমার চিরস্থায়ী সুখ—অনন্তকালের তৃপ্তি—তোমার হৃদয়ের আরাম—প্রাণের আনন্দ পবিত্র মূর্ত্তিতে তোমার নিকটে দণ্ডায়মান—উহাই তোমার গতি তোমার মুক্তি তুমি উহাই অনুসরণ কর। আমাদের মোহাচ্ছন্ন প্রাণ চমকিত হয়—আমরা বুঝিতে পারি পবিত্রতা আমাদের আত্মার প্রকৃত কল্যাণ উহা আমাদের পরিণতির এক অংশ এবং শ্রেষ্ঠ অংশ।

এখন দেখা যাউক এই পবিত্রতা বলিলে আমাদের মনে কি ভাবের উদয় হয়।

পবিত্র বলিলে মনে সৌন্দর্য্যের ভাব স্বতঃই জাগিয়া উঠে। যেমন সুন্দর যাহা পবিত্র তাহা, তেমনি পবিত্র যাহা তাহাই সুন্দর। বাস্তবিক জগতে পবিত্র ব্যতীত কিছুই সুন্দর নাই পবিত্রতা ছাড়িয়া সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে না। পবিত্রতায় ও সৌন্দর্য্যে ঘনিষ্ট প্রেমালিঙ্গন। কবি কালিদাস পার্ব্বতীর সৌন্দর্য্যমুগ্ধ মহাদেবের মুখ দিয়াও বলাইয়াছেন—সুন্দর পদার্থ কখনও অপবিত্র হইতে পারে না— হে পার্ব্বতি তোমাকে দেখিয়া আজ একথা আমি নিশ্চয় বুঝিলাম। "পবিত্র-সুন্দর" ব্যতীত সৌন্দর্য্য শব্দের অন্য সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

পুনশ্চঃ পবিত্রতার সহিত কোমলতা এক সূত্রে গাঁথা। যাঁহার হৃদয় পবিত্র— তাঁহার চরিত্র সুকোমল এবং বিনীত। তিনি কুসুম হইতেও পেলব— তৃণ হইতেও "সুনীচ"। তাঁহার মৃদু প্রভাব কোমল কৌমুদী লেখা হইতেও প্রাণ স্নিগ্ধকর।

কিন্তু এই কোমলতা, তেজোহীন অক্ষমতা নহে। পবিত্রতার ন্যায় সহাশক্তি জগতে কি আছে! অগ্নির তেজ সূর্য্যের প্রভাব তাহার নিকটে নগণ্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। যাঁহার হৃদয় পবিত্র, সুনির্ম্মল, তাঁহার বলবীর্য্য অসীম। তিনি Sir Galahad এর ন্যায় গর্ব্বিত তুলিয়া বলিতে পারেন—

My strength is the strength of ten, Because my heart is pure এক দিকে সমগ্র জগত তীক্ষ্ণ তরবারি উত্তোলিত করিয়া দাঁড়াইলেও তিনি Martin Luther এর ন্যায় নির্ভয়ে বলিতে পারেন— Were there as many Devils in Worms as there are roof tiles, I shall on. পবিত্রতা স্বর্গের অগ্নিমন্ত্র—বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ প্রভা—জগত তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়ে। ইহা ভীষণে মধুরে পরিণয়— ইহা আধ্যাত্মিক জগতের অপূর্ব্ব "হর গৌরী" মিলন।

পবিত্রতা শান্তির উৎস। এমন চরিত্র দেখিয়াছ যেখানে পবিত্রতা আছে শান্তি নাই? আবার এমন চরিত্র দেখিয়াছ যেখানে পবিত্রতা নাই শান্তি আছে? বরং জল বিহনে পিপাসার নিবৃত্তি সম্ভব কিন্তু পবিত্রতা বিহনে শান্তি অসম্ভব কথা। উত্তপ্ত সাহারায় কবে কাহার প্রাণ জুড়াইয়াছে! পবিত্রতাই মরুময় জীবনের স্নিগ্ধ ওয়েশিস্। আত্মা এমন আরাম কোথাও পায় না। এমন উন্মুক্ত অনাবিল আনন্দ কোথাও মিলে না। পাপ কলঙ্ক পূতিগন্ধে মানবের মন জড়তা প্রাপ্ত হয়। পবিত্রতা স্বর্গের নির্ম্মল বাতাস মনের জড়ভাব নাশ করিয়া তাহাতে অনুপম আরাম ঢালিয়া দেয়। পবিত্রতাই প্রকৃত মুক্তি— প্রকৃত আরাম।

এই "পবিত্র সুন্দর" মানবাত্মার আদর্শ—নিয়তি। ইহাকে যদি লাভ করিতে পারিলে জীবন সার্থক হইল—যদি না পারিলে—জীবনে কখনও সুখ নাই। ধন জন মান ঐশ্বর্য্য সকলি এক বিহনে অন্ধকার মলিন বোধ হইবে। তোমার দেহের যথেষ্ট আরাম থাকিতে পারে কিন্তু তোমার আত্মা মুহ্যমান এবং অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রাণে পবিত্রতা আসুক—পরিবার পরিজন ধন মান শতগুণে মধুময় হইবে আত্মার অনির্ব্বচনীয় মুক্তি লাভ হইবে, জগতের মুখশ্রী শতগুণে সুশোভন বোধ হইবে। পবিত্রতা আমাদের পরম বন্ধু— পরম বিত্ত— পরম আরাম॥

কিন্তু এই আদর্শ যেমন মহান ইহার সাধন তেমনি কঠোর। সিদ্ধি যত সুখপ্রদ, সাধনা তদনুযায়ী ক্লেশ সাধ্য। কত ঝটিকা বজ্রপাত মাথায় করিয়া, কত অন্ধকার তুফান অতিক্রম করিয়া স্থিরলক্ষ্যে এই আদর্শের দিকে চলিতে হইবে। ইহা একবার তোমার নয়ন সম্মুখে বিমল আলোক

প্রদান করিয়া আবার গাঢ়তর অন্ধকারে লুকাইবে। এই তোমার অতি নিকটে প্রাণের প্রাণে— এই অতি দূরে— অনন্ত আকাশের সুদূর নক্ষত্র লোকে। তারায় তারা হইয়া মিশিবে শূন্যে শূন্য হইয়া মিলাইবে। ইহাই আধ্যাত্মিক জগতের পরীক্ষা।

এই অন্ধকার তুফানে ভয় পাইলে চলিবে না। গোলাপ তুলিতে হাত বাড়াইয়া কাঁটার ভয়ে হাত গুটাইলে সে কুসুম তোমার কণ্ঠে কখনও শোভা পাইবে না। হিমালয়ের পবিত্র শিখর ভূমিতে হরগৌরীর শুভ সম্মিলন দর্শন করিতে হইলে, বরফরাশি বন্ধুর পথ তোমাকে অতিক্রম করিতেই হইবে। চল— পরিণতি প্রয়াসী মানব, ইহাই তোমার শ্রেষ্ঠ নিয়তি এই অন্ধকার তুফানেই তোমার আলোক শান্তি সূচিত; এই রক্তপাতেই তোমার শ্রেষ্ঠ জীবন লাভ। হে শ্রান্ত পথিক, তুমি নিরাশ হইও না— তুমি কাঁদিয়া ফিরিও না, এ ক্লান্তি তোমার ভাবী মুক্তির শুভ লক্ষণ।

কিন্তু হৃদয়ে বল দেয় কে? কে এই ভীষণ তুফানে প্রাণে আশাকে সঞ্জীবিত রাখে? কে নিমজ্জমানকে হাত ধরিয়া তীরে তুলিবে? দুর্ব্বল মানব তাহার কি সাধ্য আছে এই পরীক্ষায় অটল ভাবে দাঁড়াইবে? ভয় নাই, সাধক। এ অতি অপূর্ব্ব রাজ্য। এখানকার অপূর্ব্ব নীতি! এখানে প্রাণ দিলে প্রাণ পাওয়া যায়— হীন প্রাণ দিলে সোনার প্রাণ লাভ হয় ক্ষণস্থায়ী প্রাণ দিলে অক্ষয় অনন্ত প্রাণ মিলে। এখানে যিনি কাঁদান—তিনিই চোখের জল মুছাইয়া দেন— যিনি ক্লান্তি দেন তিনিই হৃদয়ে বল সঞ্চার করেন। এ অগ্নি পরীক্ষায় যিনি নিক্ষেপ করেন তিনিই অগ্নির মধ্যে অমৃতময়ী জননী হইয়া কোলে করিয়া বাঁচান। যিনি নাগরূপে দংশন করেন তিনিই বৈদ্যরূপে প্রাণ রক্ষা করেন। এ রাজ্যে নিরাশা কেন? এ দেশে ভয় কি?

—ডাক তাঁহাকে—সেই পবিত্রস্বরূপকে যিনি সম্মুখে পবিত্রতার ছবি ধরিয়া তোমার মনকে মজাইলেন। তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর তিনি তোমাকে একদণ্ড ছাড়েন না তিনি আদর্শ দেখাইয়া সাধনার সহায় রূপে তোমার সঙ্গের সঙ্গী। তাঁহার কাছে বল প্রার্থনা কর— বল, আমি দুর্ব্বল আমি অসহায় আমায় রক্ষা কর আমার গম্যপথে আমাকে পৌঁছাইয়া দাও। তিনি তোমাকে বল দিবেন।

"হে পবিত্র সাধক তোমার যাহা ইচ্ছা ভগবানের তাহাই ইচ্ছা" একথা মিথ্যা নয়। যদি প্রথমেই ভীত না হও যদি তুফানে শ্রীহরির অভয় নাম স্মরণ করিয়া, তোমার জীবনতরণীকে নির্ভয়ে অকূলে ভাসাইতে পার তবে দেখিবে অচিরে উহা এমন নিরাপদ বন্দরে উপনীত হইবে— যেখানে সকল ঝটিকার অবসান। স্বর্গের সাধু মহাত্মাগণ তোমার মস্তকে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন— তোমার পবিত্র ইচ্ছার সহায়তা করিবেন। তোমার সাধুইচ্ছা কেবল তোমার ইচ্ছা নহে উহা যাবতীয় সাধু আত্মাদিগের ইচ্ছা— উহা দেবলোকের ইচ্ছা— উহা দেবদেব মহাদেবের ইচ্ছা। সে ইচ্ছার কি কখনও পরাজয় আছে? সে ইচ্ছাকে কেহ গলা টিপিয়া মারিতে পারে? সে ইচ্ছা কখনও অপূর্ণ থাকে? বাধা বিঘ্ন অচিরে কোথায় মিলাইবে— অন্ধকার আলোকে ভাসিয়া যাইবে— স্বর্গের দ্বার খুলিবেই খুলিবে— এবং অনন্ত পবিত্রতার মধ্যে মানবের পবিত্রতা আকুল আত্মা চির বিরাম লাভ করিবে। পবিত্রাত্মারা যথার্থই পরমেশ্বরকে দেখিতে পান— যথার্থই তাঁহাতে আপনাদের আকাঙ্খিত আদর্শ লাভ করিয়া ভূমা আনন্দ উপভোগ করেন॥

আমরা যে মহাত্মার অমর বাক্য লইয়া আমাদের বক্তব্য আরম্ভ করিয়াছিলাম সেই মহাত্মার পবিত্র মুখের সেই পবিত্র উক্তির পুনরাবৃত্তি করিয়া আমাদের আলোচ্য বিষয়ের উপসংহার করি—

Blessed are the pure in spirit for they shall see God:

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

—*—

কত স্মৃতি কত দিন কার।

(Moore হইতে অনূদিত।)

কতদিন নীরব নিশীথে, না আসিতে
চক্ষে নামি'গাঢ় নিদ্রাভার
অতীত দুর্ব্বলস্মৃতি ডাকি' আনে চিতে
কত কথা কতদিন কার
শৈশবের হাসি অশ্রু সুদিন দুর্দ্দিন
বাল্য প্রণয়ের কথা কত,
সে সব উজ্জ্বল আঁখি আজি ম্লান জ্যোতিহীন
ছিল যাহা চির স্নেহানত,
আনন্দ অন্তরগুলি 'ছিল যা' সেদিন
ভগ্ন আজি মরণ-আহত।
তাই কত নীরব নিশীথে, না আসিতে
চক্ষে নামি গাঢ় নিদ্রাভার
বিষাদ ব্যথিত স্মৃতি ডাকি আনে চিতে
কত কথা কতদিন কার।
অতীত সে সব কথা পড়ে যবে মনে
সমপ্রাণ প্রিয় বন্ধুগণ
একে একে ঝরে পড়ে হিম আগমনে
শুষ্ক চ্যুত পত্রের মতন,
মনে হয় যেন কোন উৎসব মন্দিরে।
পরিত্যক্ত-শূন্য চারিধার
একে একে দীপগুলি নিভায়েছে ধীরে
পড়ে আছে ছিন্ন ফুল হার—

সঙ্গীহীন শূন্য গৃহে ভ্রমিতেছি একা
পদশব্দ গণি আপনার।
তাই কত নীরব নিশীথে, না আসিতে
চক্ষে নামি গাঢ় নিদ্রাভার
বিষাদ ব্যথিত স্মৃতি ডাকি আনে চিতে
কত কথা কতদিন কার

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

দীপালী।*

আজকাল কোন প্রতিষ্ঠাবান কবির নূতন কাব্য প্রকাশিত হইলেই প্রায় সমস্ত মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্রে তাহার সমালোচনা করা হইয়া থাকে। যে গ্রন্থের এইরূপ সমালোচনা হয় না, সে গ্রন্থ হয় সমালোচনার অনুপযুক্ত, না হয়, সম্পাদক বা সমালোচক, 'ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্', মনুর এই সনাতন নীতির আশ্রয় লইয়া চিরাচরিত রীতির অনুবর্ত্তনে সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ। আবার সমালোচক দিগের মধ্যে কেহ, প্রশংসার কল্পতরু, কবির প্রতিবাক্যে প্রতি বর্ণে কবিতার নিভৃত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলেন, কেহবা, সন্দিগ্ধ চিত্ত, সমস্ত পুস্তক অন্বেষণ করিয়া একবিন্দু কবিত্ব শক্তি না পাইয়া হতাশভাবে, ব্যর্থ চেষ্টার পারিশ্রমিক স্বরূপ কবিকে দু'এক কথা শুনাইয়া দিয়া অন্তর জ্বালার নিবৃত্তি করিলেন। কবিও ভাবিলেন কোন অজানা মুহূর্ত্তে এই স্বাতী নক্ষত্রের জল পাইয়া ধন্য হইব। কবিতার আদর্শ নির্ণয় করা নিতান্ত দুরূহ। অর্থাৎ প্রকৃত কবিতা কাহাকে বলে তাহা স্থির করা একান্ত আবশ্যক হইলেও

* শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

অনেক সময়ে অসম্ভব। ইহা কোন নিয়মাবলীর আয়ত্তাধীন নহে। কাহারও মতে যে কবিতায় জীবনের করুণগীতি স্ফুটতম হইয়া উঠে তাহাই প্রকৃত কবিতা, আবার কাহারও মতে এই সকরুণ ক্রন্দনের জন্য, এই হাহুতাশ দীর্ঘশ্বাস বাহুল্যের জন্যই আধুনিক কবিতা একেবারে অপাঠ্য। কেহ তাঁহার কবিতাকে অব্যক্ত, অস্ফুট, অনির্ব্বচনীয় 'কি যেন কি এক' ভাবে শুধু মুকুলিত করিতে চাহেন, কেহ সে কবিতায়, গাম্ভীর্য্য অর্থ সরসতা এবং পরিস্ফুট মনোবৃত্তির গৌরব দেখিতে ইচ্ছা করেন। ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কবিতার আবির্ভাব হয়। আমার বোধ হয় ইহার জন্য জনসাধারনের রুচিই অধিক পরিমাণে দায়ী। রুচি পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া কবিতাও পরিবর্ত্তনশীল। কিছুদিন পূর্ব্বে মাইকেলের রথচক্র ঘর্ঘর সংবাদিনী উন্মাদিনী কবিতার পরে রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গীত মুখর সরস কোমল ভাষা যেন উষরে তুষার কণার মত সুস্থ ও স্নিগ্ধ বোধ হইয়াছিল। তাঁহার করুণ কোমল বাঁশীর সঙ্গীতে কবিতার যমুনা উজান বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অন্যান্য কবিগণও সেই সুরে সুর মিশাইয়া অনুকূল রুচির মন্দ সমীরণে পালতুলিয়া সচ্ছন্দে অভীষ্ট প্রতিষ্ঠার মূলে উপনীত হইতে লাগিলেন। কিন্তু জন সাধারণের রুচি রবিবাবুকে যেরূপ সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিল, এখন তাঁহার অনুবর্ত্তকদিগের প্রতি সেরূপ অভ্যর্থনা প্রসারিত করিতে ইচ্ছুক নহে। ইহারি মধ্যে একটা Reaction এর ভাব লক্ষিত হইতেছে। আগে যাহা অতি সুন্দর এবং মধুর লাগিত, এখন তাহাতে অরুচি জন্মিয়াছে। এখন কবিতায় 'চাঁদ মলয় পিক পাপিয়া ফুল অলি দেখিলে অনেকের নাসাগ্রভাগ কুঞ্চিত হইয়া আসে। এরূপ রুচি বৈপরীত্য সর্ব্বস্থানে এবং সর্ব্বকালে ঘটিয়া থাকে, টেনিসনের মৃত্যুর পর এখনও দশ বৎসর অতীত হয় নাই, ইহার মধ্যেই ইংলণ্ডে ভবিষ্যৎ কবিতার জন্য স্বতন্ত্র নূতন পন্থা কল্পিত হইতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন এখনকার কবিতা যাহাতে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ এবং উপদেশাত্মক হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য। শব্দ মাধুর্য্যের ও ভাব লালিত্যের আর প্রয়োজন নাই ওসব ছেলেমি। এই গম্ভীর প্রকৃতিক লোকের আশা কতদূর পূর্ণ হইবে তাহা বলা কঠিন। কারণ কেবল জ্ঞানের জন্য লোকে কবিতা পাঠ করে না, উপদেশ পূর্ণ হইলেই

তাহা কাব্য হইতে পারে না, তাহা হইলে এনসাইক্লোপিডিয়াব্রিটানিকা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। বিমল আনন্দ প্রদান করাই কবিতার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। মানবের মনোভাব সরস সজীব ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারিলে কবিতার সাফল্য লাভ হয়, অন্তরের নিভৃত গুহায় যেটুকু অন্ধকার যেটুকু আলো যে আকাঙ্ক্ষা যে নিরাশা, যে শান্তি যে করুণা যে হাসি যে অশ্রুকণা তাহাকে কল্পনার যাদুস্পর্শে ছায়া আলোকের সমাবেশে কবিতার আলেখ্যে প্রতিবিম্বিত করিতে পারাই প্রকৃত কবিত্ব। অনুভব করিতে, পারে সবাই, প্রকাশ করিতে পারে ক'জন? আমার হৃদয়ের যে গুপ্ত বেদনাটী, যে মূল আশাটী ভাষার জন্য আকুলি ব্যাকুলি করিতেছিল কবির কবিতায় তাহার স্ফুরণ দেখিয়া আনন্দে অধীর হইতে হইল, ইহাই কবিতার সার্থকতা।

সাহিত্যদর্পণকার কবিতার স্বরূপ নির্দ্ধারিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি কবিতাকে তিন অংশে বিশ্লিষ্ট করিয়াছেন। শব্দ, অর্থ ও রস, শব্দ কবিতার অঙ্গ, অর্থ কবিতার মন, রস তাহার প্রাণ বা আত্মা। কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং। শুধু শব্দের ঝঙ্কার কাব্য নহে, অর্থ গৌরবও কাব্য নহে, শব্দ ও অর্থের শুভ সম্মিলনে যখন রসের আবির্ভাব হইয়া নির্ম্মল আনন্দে মন আপ্লুত হয়, তাহাই প্রকৃত কাব্য।

বর্ত্তমানে বাঙ্গলা কবিতায় গীতিকাব্যের যুগ চলিতেছে ইহার প্রবর্ত্তক রবীন্দ্র বাবু, ইহার আদর্শ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস। প্রেম এই যুগের যুগধর্ম্ম, উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের নাম করা যাইতে পারে। প্রমথ বাবু ইঁহাদের অন্যতম। প্রমথ বাবু পদ্মা, গীতিকা ও দীপালী এই তিনখানি কাব্যে গীতিকাব্যের সম্পত্তি যথেষ্ট বর্দ্ধিত করিয়াছেন। বঙ্গ ভাষার আধুনিক অবস্থায় গীতি কবিতা যতদূর শক্তি সঞ্চয়ক্ষমা হইতে পারে, রবি বাবু তাহার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, সুতরাং প্রমথ বাবু প্রভৃতির কবিতা যতই প্রশংসার যোগ্য হউক না, তাহাতে বিশেষত্ব সুদুর্ল্লভ। গীতি কবিতা অলঙ্কার ছটায় বৈচিত্রময়ী, সঙ্গীত ঝঙ্কারে কোমল এবং করুণায় মর্ম্মস্পর্শী হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও কাব্যের মধ্যে ইহার স্থান অনেক নিম্নে। ইহা তরল, মুখর, ছন্দোভারে অলস, মহাকাব্যের গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য ও সবলতা ইহাতে

কোথায়? গীতি কবিতা যেন দূরাগত সুন্দর বাঁশীর কোমল তান, ভাসিয়া ভাসিয়া মোহমদিরায় অলস করিয়া আবার মিলাইয়া যায়, হয়ত অতি সকরুণ একটি রেখা হৃদয়ের কোথাও আঁকিয়া রাখিয়া যায়। কিন্তু রণদুন্দুভির প্রাণমাতান শক্তি, কর্ম্মময় জীবনের অনুপ্রাণনী উদ্দীপনা গীতি-কবিতায় সঞ্চার করা অসম্ভব। কোন একটি প্রবৃত্তিকে সুন্দর করিয়া চিত্রিত করিতেই গীতিকবিতা নিপুণ। কিন্তু সমগ্র জীবন, তাহার কোলাহল, সংগ্রাম, জয় পরাজয় জীবন্ত ভাবে অঙ্কিত করা গীতিকাব্যের পক্ষে সুকর নহে। ভাষার উপর প্রমথ বাবুর আধিপত্য জন্মিয়াছে, ভাষা তাঁহার ভাবের অনুগামিনী; সেই জন্যই আমরা এই বিশেষত্ব শূন্য স্বল্পপরিসর গীতিকবিতার ক্ষেত্র অপেক্ষা মহাকাব্যের চরিত্রচিত্রণ চাতুর্য্যে তাঁহার শক্তির পরিচয় পাইতে আশা রাখি।

এই নবপ্রকাশিত কাব্যখানির অনেকগুলি কবিতা বেশ সরস প্রফুল্লতায় সজীব। তাহার এই 'মধুর দীপালীতে' বঙ্গসাহিত্য উজ্জ্বল হইয়াছে,সন্দেহ নাই। ইহার কয়েকটি দীপ এত সুন্দর ও স্নিগ্ধ, যে তাহারা চিরদিন বঙ্গবাসীর হৃদয় উজ্জ্বল করিয়া কবির এই উৎসবের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। কবির ভাষায় তাঁহার 'প্রাণের প্রদীপগুলি',

কোনটী উজল যেন জ্বল জ্বল
তপ্ত বাসনার জ্বালা,
কোনটী আঁধারে অকূল পাথারে
যেন নববিভা আঁকা;
কোনটী চকিত; কোনটী স্তিমিত,
কোনটী কালিতে মাখা।

দীপালীর অনেকগুলি কবিতা কবিতা দেবীর উদ্দেশে লেখা। কবি কবিতাকে যতদূর সম্ভব আপনার করিয়া লইয়াছেন, কখনও নিরাশ হৃদয়ে তাঁহাকে মালা লইয়া সম্ভাষণ করিতেছেন।

সাজাসু বরণ ডালা, হাসি মুখে লও মালা,
লও সাথে কণ্টক কঙ্কর;
হোক্ আজ শ্মশানে বাসর।

কখনও বিনয় নম্রভাবে কল্পনার নিকট স্নেহালোক ভিক্ষা করিতেছেন কখনও বা জগতের হিংসা, দ্বেষ, তর্ক বিচার দূরে নিক্ষেপ করিয়া বিশ্রব্ধ মনে পর্য্যুৎসুকা কবিতার কুঞ্জদ্বারে তাঁহার কবিহৃদয় উপহার দিতেছেন। এই কবিতাগুলি পাঠ করিলে মনে হয় কবি কোন কল্পনার ছায়া আলোক বিচিত্র লোকে আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছেন,— সেখানে পৃথিবীর হীন লালসা, বাসনা প্রভৃতি তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় নাই। সেখানে তাঁহার ক্ষুদ্র বাঁশীটীতে কল্পনার মায়া অঙ্গুলি স্পর্শে প্রতিক্ষণে কত ঝিঁঝিটের উদ্দীপনা ভৈরবীর ঔদাস্য পূর্ণ মুর্চ্ছনা, বেহাগের বেদনা ভরা আবেগ বাজিয়া উঠিতেছে। তাই তিনি সে মায়াবিনী বালার সুখের রাজ্য হইতে এই কর্ম্ম কঠোর সংসারে নামিয়া আসিতে চাহেন না।

সেথা সুধু প্রীতিরাশি, শুধু হাসি, শুধু বাঁশী
দীপে দীপে আলা।

সমালোচক এই কর্ম্ম শূন্য নিষ্কাম কল্পনার সাধনা ভাল বাসেন না, তিনি চাহেন, কবিকে স্বর্ণ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া কল্পনার রাজ্য হইতে বাস্তবের রাজ্যে টানিয়া আনিতে। কিন্তু কবির এ প্রেমে প্রতিষেধ ভাল লাগিবে কেন?

মুক্ত পক্ষ যুক্তিহীন গগনে উড্ডীন লীন
বিহগী আমার,
পায়ে দিয়ে বেড়ীখানি ধুলায় আনিবে টানি,
এই কি বিচার!
সোণার পিঞ্জরে ভরি নিজ মনোমত করি
শিখাইবে বুলি?
তোমার সোহাগ-যত্নে স্বভাব সঙ্গীত-রত্নে
সেকি যাবে ভুলি!

একদিকে সমালোচক খ্যাতি নিন্দা বাঁটিয়া দিবার জন্য মাপকাঠি ধরিয়া আছেন।

অন্য দিকে, প্রিয়া
কুঞ্জের দুয়ার ধরি নিঃশব্দ প্রতীক্ষা করি
আছেন চাহিয়া।

বেণী-বন্ধ গন্ধাকুল সৃজিয়া মধুর ভুল
মাতায় মধুপে ;
আনন্দে পড়িয়া পা'য় নুপুর বন্দনা গায়
ভক্ত বন্দী রূপে ;
অঙ্গের ভূষণ যত বিশ্রম্ভ আলাপে রত ;
হাসে বক্ষ-বাস,
মরমের প্রেম-শশী উজ্জ্বল করিছে বসি
রূপের আকাশ।

এখানে কবি প্রিয়তমা কবিতা সুন্দরীর কথাই বলিতেছেন।

এখন কবি কোনদিকে যাইবেন? অবশ্য কল্পনার এমন কুঞ্জবন আলা ঢলঢল মূর্ত্তিখানি রাখিয়া কবি যে সমালোচকের রুক্ষ নীরস প্রশংসা লাভের জন্য ব্যগ্র হইবেন না একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সমালোচক ইহাতে ভুলিবেন না। সমালোচক কবিকে কল্পনার রাজ্য হইতে আনিয়া বন্দী করিতে চাহেন না, কল্পনার ঐশ্বর্য্যে সমালোচক অন্ধ নহে। বাস্তবের জন্যই কল্পনা লাবণ্যময়ী। বাস্তবই কল্পনার প্রকৃত লীলা ক্ষেত্র। তোমার কল্পনার রাজ্য হইতে বাস্তবের দিকে ফিরিয়া চাও, কল্পনা ও বাস্তবের সমাবেশে, জলকণায় সূর্য্য কিরণ সম্পর্কে ইন্দ্র ধনুর শোভা দেখিতে পাইবে। বিহগী নিবিড় নীল গগণে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া মেঘালোকে মিশিয়া যায় কিন্তু সেখানে সে স্নিগ্ধ সমীরণ আর নির্ম্মল সূর্য্য কিরণ পান করিয়া মর্ত্ত্য জগৎকে একেবারে ভুলিয়া যায় না। সে যতই উচ্চে উঠে, ততই নিম্নের জগৎ সংসারকে সুন্দর দেখিতে পায়, জগতের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির নিকট যে ত্রুটী যে বৈষম্যগুলি প্রকৃতির গুপ্ত সৌন্দর্য্য ঢাকিয়া রাখে, দূরত্ব তাহাদের মুছিয়া দিয়া ধরণীকে নন্দনকাননের সুষমায় পূর্ণ করিয়া দেয়। এক রহস্যময় স্নেহগ্রন্থি অলক্ষ্যে তাহাকে আকর্ষণ করে বলিয়াই সে ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার কুলায়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে, পথ ভুলিয়া যায় না।

দীপালীর 'আত্ম পরিচয়' ও শ্বশুর কন্যার স্তব পড়িয়া দেবেন্দ্র বাবু প্রণীত অশোকগুচ্ছের 'আমি কে' ও শ্বশুর কন্যা শীর্ষক কবিতা দুইটি মনে পড়ে। প্রমথ বাবুর আত্মপরিচয়ে ছন্দ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষত্ব নাই। 'আমি কে'

কবিতাটি যেরূপ সবল, আত্মপরিচয়ে সেরূপ সবলতা নাই। প্রমথ বাবু শ্বশুর কন্যার স্তবে ছন্দ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। যুক্তাক্ষরগুলিকে ইচ্ছামত একাক্ষর বা দ্ব্যক্ষর গণনা করিয়াছেন।

ওগো ও শ্বশুর-কন্যা,
যুগে যুগে তুমি ধন্যা।

* * * *

আনিছ মিলন; হানিছ বিরহ;
কত শুভসন্ধি; মধু বিগ্রহ;
মনোমন্দিরে রহ, তুমি রহ,
সুখালসে অচৈতন্যা!

এখানে 'বিগ্রহ' এবং 'মন্দির' শব্দকে চারি ভাবে গণনা করা হইয়াছে। কিন্তু 'সন্ধি'র বেলায় সে নিয়ম রক্ষিত হয় নাই।

বিপ্র যথা হৃষ্ট পেলে মিষ্ট স্বাদ,
ছেলে যথা তুষ্ট হলে পড়া বাদ,
কণা মাত্র পেলে তোমার প্রসাদ,
বেঁচে যাই, হে শরণ্যা!

উদ্ধৃত কয়েক পংক্তিতে কোন নিয়মেরই অনুসরণ করা হয় নাই। মিলের অনুরোধে বরণ্যা, অতরণ্যা প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে, এগুলিকে শিষ্ট প্রয়োগ বলা যায় না। 'আয়েস' শব্দ আবার কবিতায় আসিল কবে? 'তোমরা ও আমরা' নামে এক অদ্ভুত কবিতায় একবার মাত্র পায়েসের সঙ্গে পাঠকগণ উদরস্থ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আর কোথাও দেখা যায় নাই।

প্রমথবাবু কতকগুলি নূতন শব্দের আমদানী করিয়াছেন যথা চাটুস্বর, অগুন্ঠিতা, খুসীর ফোয়ারা, প্রশংসনেত্র বিজয়িনী ছবি, প্রীতি পিচ্‌কারী, হর্ষফাগ্। ভাষার রক্ষণ শীল দল এগুলি মার্জ্জনা করিবেন কিনা সন্দেহ। 'বাসক-সাজ' (৫৫ পৃষ্ঠা) বিটবী (৬৪ পৃষ্ঠা) বোধ হয় মুদ্রাকর প্রমাদ হইবে। 'উদার' শব্দটী প্রমথবাবুর বড়ই প্রিয় বলিয়া মনে হইতেছে।

উদার দ্বার, উদার ভবন না হয় বুঝিলাম, কিন্তু উদার গৃহিনী নিতান্তই অসহ্য।

নব্য কবিদিগের একটি অপবাদ এই যে তাঁহারা বাক্যময়ী কুহেলিকা সৃজন করিয়া তাহাতে অর্থ হারাইয়া ফেলেন। ভাষার স্রোতে ভাব ভাসিয়া যায়। দীপালীর দুয়েকটি কবিতায় এইরূপ দোষের আভাস পাইয়া মনে করিলাম যে বঙ্গকবিতার নিতান্তই দুর্ভাগ্য। এই দোষ নিবন্ধন 'অসময়', 'পরিবর্ত্তন', 'নিমজ্জিতে'র স্বপ্ন ও 'একটি কথা' শীর্ষক কবিতাগুলি আমরা তেমন উপভোগ করিতে পারিলাম না। 'দিনের কলঙ্কভরা ভাঙ্গা বাঁশী' 'মৌন হুতাশের মায়া' প্রভৃতি প্রহেলিকার মত লাগে।

কবিতা ও চিত্রে ব্যক্ত অপেক্ষা অব্যক্ত সৌন্দর্য্যের আদর অধিক একটি সুন্দর শব্দের সযত্ন সন্নিবেশে কবিপ্রতিভা যে ভাবরাশি প্রকাশ করিতে সক্ষম, একখানি সমগ্র পুস্তকেও তাহা প্রকাশ করিতে পারা যায় না। একটি নিপুণ তুলিকা স্পর্শে যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, হয়ত তাহা শতছবিতেও প্রকাশ করা অসম্ভব। এই অব্যক্ত সৌন্দর্য্য কবিতা এবং চিত্রকলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব। প্রমথ বাবুর দুই একখানি চিত্রে এইরূপ সূক্ষ্ম নিপুণতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নীল জলে তলাইছে বেলা;
ভাসিতে লাগিল মোর ভেলা।
নাই জ্ঞান,—আসে রাত্রি, নাহি কেহ সহযাত্রী;
আনমনে চলিনু একেলা;
ভাসিতে লাগিল মোর ভেলা।
অন্ধকারে জাগিনু শিহরি
তখন জেগেছে বিভাবরী;
স্রোতে গিয়েছিনু ধেয়ে, ফিরিনু উজান বেয়ে,
দুই চক্ষে জল এল ভরি;
ফিরায়ে আনিনু কূলে তরি।

এই কয়েকটি ছত্রে তিনি যে একখানি সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকরের তুলিকারও অযোগ্য নহে। 'নীলজলে তলাইছে বেলা'

এই ছত্রে এবং ইহার পরবর্ত্তী ছত্রে লকার বাহুল্যে একটা অলসতা, এবং দিগ্বলয়ের অন্তরালে সন্ধ্যার নিঃশব্দ প্রয়াণ অতি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 'অনুনয়ে' কবি উষার এইরূপ একখানি হৃদয়গ্রাহী ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। একখানি লজ্জা কণ্টকিত অথচ আবেগপূর্ণ হৃদয়ের অনুনয়,

ভালবাসি কি না বাসি তুমি সুধায়ো না,
তুমি সুধায়ো না!
এখনো যে সুষুপ্ত ভুবন,
ফুলগন্ধে ঢুলু ঢুলু বন,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে স্বপনের গুপ্ত আলাপোনা।
তুমি সুধায়ো না, তুমি সুধায়োনা।
আবেগে কাঁপিছে হিয়া— কিছু সুধায়ো না
মোরে সুধায়ো না!
অরুণ উঠিছে ফুটি ধীরে
নিশান্তের নিঃশব্দ তিমিরে,
নিস্তব্ধ মেঘের প্রান্তে ফলাইছে সোণা!
তুমি সুধায়ো না, তুমি সুধায়ো না!

এরূপ একখানি চিত্রের তুলনা বিরল। বস্তুতঃ এই মনোমুগ্ধকর নৈসর্গিক চিত্রই এ কবিতাটীর বিশেষত্ব; তাহা না হইলে 'প্রবাসী'র কবি অন্যান্য প্রেম কবিতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন ইহার সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইত।

'ক্ষান্ত, দাও প্রেম গীতি আর গাহিয়ো'না
তুমি গাহিয়ো না।

দীপালীতে গম্ভীর ভাবাত্মক কবিতার বড় সদ্ভাব নাই। এত প্রেম কবিতার পার্শ্বে ঐরূপ গোটা কয়েক কবিতা থাকিলে মন্দ হইত না। 'জীবন চিন্তা', 'আবেদন' (মৃত্যুর প্রতি) প্রভৃতি কবিতাও প্রেমের সার্ব্বভৌম প্রতাপ অতিক্রম করিতে পারে নাই।

'পল্লীবালকের জল্পনা' টেনিসনের সে কুইনের প্রতিধ্বনি, সে কুইন পড়িবার পূর্ব্বে মন্দ লাগিবে না। 'একটি অশ্বত্থের প্রতি' পড়িয়া ক্যাম্বেলের Beech tree's petition মনে পড়ে।

দীপালীর চতুর্দ্দশ পদী কবিতাগুলি অতি সুন্দর। স্বভাবের ফুলের মত উহাদের উন্মেষ, বিকাশ ও বিলয় স্বল্পকালস্থায়ী হইলেও পাঠকের মনে সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার স্মৃতি রাখিয়া যায়। নল দময়ন্তীর সনেট্‌গুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। যদিও রাজহংসের দৌত্য (নীরে) কিছু লালসা পূর্ণ বলিয়া মনে হইল।

ছন্দের সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা বলিয়া উপসংহার করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রমথ বাবুর কবিতা ছন্দের বিভবে পূর্ণ। 'খুকুর ঘুম' যেন সঙ্গীত কুহকে বিভোর। কিন্তু 'কবি সম্ভাষণ' 'লোকান্তরিতা' 'পল্লী বালার কথা' প্রভৃতির ছন্দ কবির এত প্রিয় কিরূপে হইল বুঝিতে পারা যায় না। পল্লীবালা হইতে দুই চারি ছত্র পড়িলেই এ অপূর্ব্ব ছন্দের নমুনা পাওয়া যাইবে,

আমি পল্লী নিবাসিনী অনাথিনী দীনা
পিতৃমাতৃ হীনা,
শৈশবে বন্ধনে বাঁধি স্বর্গে গেলা স্বামী
জান অন্তর্যামী।

এ রূপ ছন্দে মাধুর্য্য কিছুমাত্র নাই, অথচ প্রতি পাদের শেষে কবি এবং পাঠক উভয়েরই চিন্তা স্রোত হঠাৎ যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়া থামিয়া যায়। মিল গুলিও 'দায়ে ঠেকিয়া' রকমের হইতে বাধ্য। আরও একটি বিশেষ অসুবিধা এই যে এক পদের মধ্যে একটা ভাবকে (idea) কোন রকমে পূরিতে হইবে। ইহাতে ছন্দ ও ভাব উভয়ই বাধা প্রাপ্ত হয়।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

হিন্দুজাতির কামান ব্যবহার।

(৩)

বস্তুতঃ রামায়ণ, মহাভারতে, যে শতঘ্নী অস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা অতিশয়োক্তি ও অসম্ভব উক্তি মাত্র। তদানীং যুদ্ধ স্থলে, সচরাচর একটি

শর বা বাণ্ দ্বারা একজনকেই বিদ্ধ করা চলিত। ঋষি কোনও কোনও যোদ্ধাকে, অমানুসিক শক্তি সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত, কল্পনাকে ছুটাইয়া, সেই সেই বীরপুরুষের, হস্তধৃত বাণের ক্ষমতাকে, শত বা সহস্র গুণিত করিয়া, শতঘ্নী আখ্যা দিয়াছেন মাত্র। তাঁহাদের সেই অলৌকিক বর্ণনা গুলিকে, ষোল আনা বিশ্বাস করিলে, অনেক অসম্ভব বিষয় সম্ভবপর বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু আশা করি, কোনও যুক্তি পরায়ণ সুশিক্ষিত ভদ্রলোকই সেরূপ অতি প্রাকৃত বৃত্তান্তে, আস্থা স্থাপন করিতে, রাজি হইবেন না। কেবল ভারতে বলিয়া নয়, পুরাতন সমস্ত সভ্য জাতির কাব্যাদিতেই, অতিশয়োক্তি ও অসম্ভব বর্ণনার বাহুল্য আছে। কিন্তু সেগুলির প্রতি বিশ্বাস্ত হইলে, পদে পদে ভ্রান্তপথে বিচরণ করিতে হয় মাত্র। হিন্দু সমাজে এখনও এমন এক সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা,—ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্ব্বকালের এবং সর্ব্বাবস্থায় যথাযোগ্য উন্নতির মূলসূত্রগুলি, ঋষিগণ, যোগ বা জ্ঞান বলে আবিষ্কার করিয়া, পুস্তকমধ্যে নিবদ্ধ রাখিয়া গিয়াছেন—বলিয়া, আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। সম্মাননীয়া দেবী মহোদয়ার, আদিম পিতৃ পুরুষদের প্রতি তত অন্ধ ভক্তি নাই; অতএব এখানেই নিরস্ত হইলাম।

এক্ষণ পৃথ্বীরাজের আমলের, বিচার করা যাউক। পূর্ব্বতন কাল সম্বন্ধে দৃঢ়মত পোষণ করিয়া না থাকিলেও, মহম্মদ ঘোরীসহ, পৃথ্বীরাজের সংগ্রামে হিন্দুপক্ষে যে কামান ব্যবহৃত হইয়াছিল; একথা স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ভাবে পূর্ব্বোল্লিখিত তিনজন সুপণ্ডিত ব্যক্তিই বলিয়াছেন। ১১৯১ এবং ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের, ক্রমান্বয়ে দুইটি মহাসংগ্রাম ঘটে। ইহার প্রথমটিতে, ঘোরীই পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে বিজয় লাভ করতঃ দিল্লীতে এবং তৎসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে, মুসলমান শাসনের মূল পত্তন করেন। এই দুইটি যুদ্ধে এবং কাণ্যকুব্জেশ্বর জয়চাঁদের সঙ্গে, পৃথ্বীরাজের, পৃথক পৃথক সমরে, রাজপুত সৈনিকগণ কামান ব্যবহার করিয়াছিলেন, এই রূপ উক্তি, চাঁদ বর্দ্দাই বা চাঁদ কবির বীরগাথা নামক হিন্দি কাব্যে, লিপিবদ্ধ আছে। আর মূলতঃ সেই গাথা গুলিকে প্রামাণিক ভাবিয়াই, পূর্ব্বোক্ত মনস্বী দ্বয় এবং মনস্বিনী

দেবী, হিন্দুদিগকে কামানের আবিষ্কর্ত্তা স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু এ ধারণাও কি অভ্রান্ত? দ্বিতীয় সংখ্যা "ঐতিহাসিক চিত্রের" পাদটীকায় মাননীয় অক্ষয় বাবু যে মন্তব্য প্রকটিত করিয়াছেন; তদনুসারে বুঝা যায়,—মহামহোপাধ্যায় শ্যামলদাস মহাশয়, চাঁদ কবির বীর গাথা গুলিকে, ষোড়শ খৃষ্টাব্দের রচনা বলিয়া প্রমাণের চেষ্টা পাইয়াছেন; পরন্তু প্রতিষ্ঠাবান্ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এবং সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব যোগ্যতম সম্পাদক, শ্রদ্ধাস্পদ বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়, সেই প্রমাণকে যথার্থতথ্য বলিয়া, বিশ্বাস করিয়াছেন। তাঁহাদের মত বিশ্বাসের কি কিছুমাত্র সার বস্তু নাই? আমি মহামহোপাধ্যায়ের সমালোচনা দেখি নাই; সুতরাং তাহার সমীচীনতা কত দূর, সাহস করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু সমগ্র ভাগ না হইলেও, কামান ব্যবহার প্রতি পাদক গাথা গুলি যে, সুলতান বাবরের, ভারত বিজয়ের পরে, অর্থাৎ ষোড়শ খৃষ্টাব্দের মধ্যাংশে প্রণীত ও মূল কাব্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তৎবিষয়ে কোনও সন্দেহ করি না। কেন? তার প্রমাণ অবশ্যই দিব।

মহম্মদ ঘোরী সহ পৃথ্বীরাজের সংগ্রামে, রাজপুত পক্ষের সৈন্য সংখ্যা ন্যূন তো ছিলই না, অধিকন্তু অনেক বেশী ছিল।* ইহা ভিন্ন দেশে থাকিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য, মুসলমান পক্ষাপেক্ষা তাঁহাদের সাময়িক অবস্থাদিও, অনুকূল ছিল সংশয় নাই। তদুপরি কামান থাকিলে, তাঁহারা পরাস্থ হইলেন কেন? কামান থাকা সত্বেও, অপেক্ষাকৃত অযোগ্য অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত মুসলমান সৈন্যের নিকট, যদি সত্য সত্যই তাঁহারা পরাজিত হইতেন; তবে আর দগ্ধ বদন লুকাইবার স্থান থাকিত না। কিন্তু সুখের বিষয় তা ঘটে নাই। (এস্থানে প্রসঙ্গতঃ বলা ভাল যে, এই যুদ্ধে অন্যায়তঃ মুসলমান পক্ষকে বিশ্বাস হন্তা সাজান হইয়াছে। এবং মুসলমানগণ কেবল বিশ্বাস ঘাতকতার বলেই জিতিয়া ছিলেন, এরূপ অলিক কথাও বলা হইয়া থাকে। আমি তাহা বিশ্বাস করি না, এবং অন্য প্রস্তাবে তার আলোচনা

* মৌলবি আবদুল করিম বি-এ প্রণীত "ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্তের" ৮২।৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করিব।) রাজপুত পক্ষকে সময়ে কেন, তার বহু পরেও কামানের ব্যবহারে সম্যক অপক্ক ছিলেন; তাই নিজ পক্ষের দৌর্ব্বল্য হেতু, তাঁহারা বলবীর্য্য সম্পন্ন মুসলমানদের সঙ্গে, সংগ্রামে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াছেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত আবদুলকরিম বি-এ মহোদয়, মহম্মদ কাশীম ফেরেস্তা ও অন্যান্য মুসলমান ইতিবৃত্তবিদ্দের গ্রন্থাবলম্বনে, "ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত" নামাভিহিত, যে পুস্তকের সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতেও থানেশ্বরের সেই আহবে, হিন্দুপক্ষে কামান প্রয়োগের উল্লেখ নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকদের পুঁথীতে থাকিলে, অবশ্যই তিনিও অনুবাদে তাহা গোপন করিতেন না। আর এক কথা, রাজপুতগণ সে যুদ্ধে কামান ব্যবহার করিয়াছিলেন, যদি তর্কানুরোধে এ অসত্য সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া যায়, তবে যুদ্ধ অন্তে সে গুলি যে বিজয়ী মুসলমান যোদ্ধার হস্তগত হইয়াছিল, তাহাও স্বীকার করিতেই হয়। রাজপুত পক্ষের কামান গুলি করতলগত হইলে, অবশ্যই, কুতবুদ্দিন আইবক্ প্রভৃতি পরবর্ত্তী পাঠান সম্রাটগণ, হিন্দুস্থানের অন্যান্য অংশ বিজয়ে, তাহার প্রয়োগ করিতেন; অথচ মুসলমান ঐতিহাসিক বর্গও, তদুল্লেখে নিবৃত্ত থাকিতেন না। কিন্তু সুলতান বাবরের পূর্ব্ববর্ত্তী, দিল্লীর কোনও পাঠান সম্রাট যে যুদ্ধে কামান পরিচালন করিয়াছিলেন, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কোনও জাতির ইতিবৃত্তেই, তাহার উদাহরণ দেখা যায় না।

হিন্দুজাতির স্বাধীনতা বিধ্বংসী, দৃশদ্বতীর তীরস্থ সেই শোচনীয় সমরে, মিবারের রাণা সমরসিংহ; শ্যালক পৃথ্বীরাজের সপক্ষে, যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সৈন্য পরিচালকদের মধ্যে, একজন প্রধান ছিলেন। সে যুদ্ধে কামান ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে, কেবল চৌহানগণই যে তাহার কৌশলজ্ঞাত ছিলেন, গিহ্লোটগণ ছিলেন না, তাহা অসম্ভব। কিন্তু ঘোরীসহ, পৃথ্বীরাজের সেই যুদ্ধের পরে ও ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে রাণাসঙ্গ বা সংগ্রামসিংহের সহিত, সুলতান বাবরের ভীষণ সমর সঙ্ঘটিত হওয়ার পূর্ব্বে, বহুবার মিবারের রাজপুত ও মুসলমানে কাটাকাটি রক্তারক্তি হইয়াছে এবং তাহাতে সমর বিশেষে উভয় পক্ষেরই জয় পরাজয় ঘটিয়াছে। কিন্তু তার একটি যুদ্ধেও হিন্দুপক্ষে কামান ব্যবহারের কথা রাজস্থানে নাই। মহামতি টড্ সাহেব; রাজপুতনার

ভাট্ ও চারণগণের রচনাবলম্বনেই, প্রধানতঃ রাজস্থান গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অতএব ভট্ট ও চারণদের গাঁথাতে রাজপুত পক্ষে কামান পরিচালনের কিছু নিদর্শন পাইলে তিনি কি তাহা গোপন করিতেন? কখনই নয়। রাজপুতনার ভাট্ ও চারণগণ কামানের প্রসঙ্গ উত্থাপনে সর্ব্বত্রই যে নিস্তব্ধ তাহাও নহে। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে বিয়ানা সন্নিহিত কানুয়া ক্ষেত্রের অনুষ্ঠিত সমরে গোলন্দাজ রুমিখাঁর কল্যাণেই যে সুলতান বাবর সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করেন তাহা এবং অতঃপর সংগ্রামসিংহের পুত্র রাণা বিক্রমজিতের সময় অন্তর্ব্বিপ্লবের সুযোগ পাইয়া গুর্জ্জর সুলতান বাহাদুর ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন চিতোরের উৎসাদন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন তখন যে তাঁহার পক্ষে ফিরিঙ্গি লাব্রি খাঁ (খুব সম্ভব পর্ত্তুগিজ) কামান পরিচালনে ব্রতী ছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁহার গোলা বৃষ্টিতেই দুর্গ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় সে কথাও ভট্টগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। সত্য হইলে রাজপুত সম্প্রদায়ের কামান ব্যবহারের কথা তাঁহারা গোপন করিবেন কেন?

মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে কনোজেশ্বর জয়চন্দ্র পরাহত হইলে হতাবশিষ্ট রাঠোরগণ মারবারের মরু ভূমিমধ্যে এবং দিল্লী সম্রাট পৃথ্বীরাজের পরাভবের পর চৌহান সম্প্রদায় আজমিরে গিয়া বসতি করিতে থাকেন। রাজস্থানে রাজপুত পক্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে কিংবা রাজপুত ও মুসলমানে যে সমুদয় সংগ্রাম ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে তাহার একটিতেও হিন্দু সৈন্য কর্ত্তৃক কামান পরিচালনের কথা কোনও স্থানের ভট্ট ও চারণের গীতিতে স্থান লাভ করে নাই। ইহা দ্বারা স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে পৃথ্বীরাজের আমলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে হিন্দু পক্ষে কামান প্রয়োগের কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা এবং তৎবোধক যে সমস্ত গাথা চাঁদ বর্দ্দাই পুস্তকে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ঐতিহাসিকদের ভ্রান্তি উৎপাদনে সাহায্য করিতেছে, তাহা পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ সুলতান বাবরের সহিত দিল্লীর পাঠান সম্রাট ইব্রাহিম লোদী ও চিতোরের রাণা সংগ্রাম সিংহের সমর সমাধা হইবার অনেক শেষে রচিত।

ক্রমশঃ।

শ্রীরজনীমোহন ঠাকুর।

পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সাহা প্রবর্ত্তিত।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

(বৈশাখ, ১৩০৯)

*** সম্পাদক ***

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

উৎসাহপ্রেশ, রাজসাহী।

শ্রীমহিরুদ্দীন সরকার পৃণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা।

সূচীপত্র।

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
আহ্বান	...	১৫৩
নববর্ষের উপহার ...	শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার বি-এ, ...	১৫৬
মেয়েলি বারব্রত (লক্ষ্মীর কথা)	... ...	১৬৬
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা	... ...	১৬৯
অনন্ত ...	শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ ...	১৭৪
সংক্ষিপ্ত সাহিত্য সমালোচনা	... ...	১৭৭
হিন্দুজাতির কামান ব্যবহার	শ্রীরজনীমোহন ঠাকুর ...	১৮২

—০::§)*(§::০—

উৎসাহ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর সান্যাল প্রণীত

আজগুবি গল্প।

বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগী এমন কৌতুকপূর্ণ হাস্যোদ্দীপক শিক্ষাপ্রদ গল্পের পুস্তক বঙ্গ ভাষায় এই প্রথম। শুধু বালক নয়, বৃদ্ধরাও ইহা পাঠে যথেষ্ট আমোদ পাইবেন। গল্প পড়িবারকালে হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়ি ছিঁড়িয়া যাইবে।

মূল্য ।৵০ আনা। ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা মজুমদার ...ব্যা এবং ...তে ও আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

...লাইে...

ব্রজসুন্দর বা... **শ্রীশ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল।** ১ম খণ্ড ।/০ আনা।

কলিকাতার ...স বাবুর দোকানে ও আমার নিকট পাওয়া যায়।

ঘোড়ামারা পো...জসাহী। } উৎসাহ কার্য্যাধ্যক্ষ।

পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সাহা প্রবর্ত্তিত।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত।

উৎসাহ।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

৫ম বর্ষ। } রাজসাহী, বৈশাখ, ১৩০৯। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আহ্বান।

তোরা আয়, তোরা আয়—
উদয় গিরির কনক শিখর ঐ দূরে দেখা যায়!
আশার আলোকে ঝকিছে দিক্,
কত উৎসাহে ডাকিছে পিক্,
দশ দিক্ নারী রজত গাগরী
অর্ঘ্যে ধরিয়া ধায়,
নীরবে হাসিছে নীরবে ভাষিছে
তোরা আয়, তোরা আয়!

তোরা আয়, তোরা আয়—
উদয় গিরির কনক শিখর ঐ দূরে দেখা যায়!
মলয় বিলাসী চলেছে ব'য়ে
কুসুমে কুসুমে বারতা ক'য়ে;

আঁখি কচালিয়া কুসুম জাগিয়া
হাসি চৌধারে চায়,
দীঠি-ভঙ্গিতে হৃদি-সঙ্গীতে
তোরা আয়, তোরা আয়!

তোরা আয়, তোরা আয়—
উদয় গিরির কনক শিখর ঐ দূরে দেখা যায়!
মুখর ঊর্ম্মি অধীরা নাচে,
তীরে তীরে তীরে কীচক বাজে,
বন বন শির প্রবাহের নীর
আশায় রাঙিয়া যায়,
সাজিয়া মোহিনী ডাকিছে ধরণী
তোরা আয়, তোরা আয়!

তোরা আয়, তোরা আয়—
উদয় গিরির কনক শিখর ঐ দূরে দেখা যায়!
জ্ঞান নির্ঝর স্বতঃ ঝরিছে,
তৃষিত জনের তৃষা হরিছে,
উঠে বেদগান উদাত্ত সান
ঋত্বিক কুল গায়,
বিহগ-কাকলী ডাকিছে আকুলি
তোরা আয়, তোরা আয়!

তোরা আয়, তোরা আয়—
উদয় গিরির কনক শিখর ঐ দূরে দেখা যায়!
দীপ্ত সোণালী কুহেলী মাঝে
ভবিষ্য স্বপ্ন কত কি আছে,
শান্ত সবিতা মুগ্ধ কবিতা
সৌম্য দৃষ্টে চায়,

বিভলা প্রকৃতি হাসে নিরবধি
তোরা আয়, তোরা আয়!
তোরা আয়, তোরা আয়—
উদয় গিরির কনক শিখর ঐ দূরে দেখা যায়!
সাধক ভক্ত যাজক যত
জীবন যজ্ঞে সতত রত,
করিতেছে দান আপনার প্রাণ
জগৎ-কারণ পায়,
পূত হুতাশন ডাকিছে সঘন
তোরা আয়, তোরা আয়!

তোরা আয়, তোরা আয়—
উদয় গিরির কনক শিখর ঐ দূরে দেখা যায়!
ঐ পাদ মূলে বাসনা শেষ,
ও চরণকুল সাধন দেশ,
নিরাকার বেশ অশেষ মহেশ
পাষাণ ব্যাপিয়া ভার,
স্বচ্ছ নীলিমা প্রকাশে মহিমা
তোরা আয়, তোরা আয়!

তোরা আয়, তোরা আয়—
উদয় গিরির কনক শিখর ঐ দূরে দেখা যায়!
দূরে ফেলে রাখ লাজ ও ভান,
বুকে ক'রে আয় মোহ ও প্রাণ,
ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান উড়ায়ে নিশান
চল্ তোরা দ্রুত পায়,
অনাদি বিমান গাহিতেছে গান
তোরা আয়, তোরা আয়!

নববর্ষের উপহার।

(১)

বালিকা লর্ণা সকালে তাহার শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিল। সে ছুটিয়া তাহার দাদার গৃহে প্রবেশ করিল এবং তাহার ক্ষুদ্র সুন্দর মুখখানি দাদার ঘুমন্ত মুখটীর কাছে আনিয়া ডাকিল—"দাদা, এখনও ঘুমুচ্ছ? শীগ্রি উঠ" এই বলিয়া সে বালকের কালো কুঞ্চিত চুলগুলির মধ্যে চাঁপার কলির মত আঙ্গুলগুলি দিয়া একটু টানিল।

বালিকার ডাকে দাদা উঠিয়া বসিল এবং হাত দিয়া তন্দ্রা জড়িত চক্ষু দুটি রগড়াইতে লাগিল। ইত্যবসরে লর্ণা ঘরের জানালা খুলিয়া দিল এবং নবোদিত অরুণ-কিরণ গলিত স্বর্ণের ন্যায় গৃহের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল।

জ্যাক একটু ভাবিয়া বলিল—"ওঃ আজ যে নতুন বছর আসবার পূর্ব্ব দিন!!"

লর্ণা বলিল—"এ দিন তা চেয়ে আরো বেশী সুখের। দাদা, তোমার বুঝি মনে নেই আজ যে বাবার ফিরে আসবার দিন!"

"হ্যাঁ তাই ত! আমি তো প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম! লর্ণা, এ যেন ঠিক স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে, সত্যি বাবা আজ ফিরে আসবেন এটা যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

ভাই বোনে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিল।

আজ ছয় মাস অতীত হইতে চলিল তাহাদের পিতা যুদ্ধে গমন করিয়াছেন। সে যেন ছয় বৎসরের কথা! কত দীর্ঘ সময়! "দক্ষিণ আফ্রিকা"—এই নামটী শুনিলেই ভয়ে শরীরের রক্ত জল হইয়া যায়। পিতা গৃহে ফিরিতেছেন এই সংবাদে ক্ষুদ্র বালক বালিকার প্রাণ আজ আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিল।

তাহারা ভাবিতে লাগিল কেমন করিয়া দিনটী কাটিবে, কারণ তাহাদের পিতার অপরাহ্নের ট্রেনে আসিবার কথা। তাহারা ছুটিয়া আস্তাবলের দিকে গেল এবং হাঁফাইতে হাঁফাইতে কোচম্যানকে বলিল—"কোচম্যান, বাবাকে যখন আনতে যাবে নীল রঙ্গের নতুন গাড়ীটী নিয়ে যেও, আর

সাদা ঘোড়া 'বেনিডিক্ট'কে তাতে জুড়ে নিও। বাবা বেনিডিক্টকে বড্ড ভাল বাসেন, বিদেশ থেকে এসে তাকে দেখলে কত সুখী হবেন।"

"আর ষ্টেশনে যাবার সময় আমাদের নিয়ে যেও কোচমান; আমরা দু ভাই বোনে ষ্টেশনে যাব, বাবা ট্রেন হ'তে নামলে আমরা হাত ধ'রে দুজনে তাঁকে গাড়ীতে তুলব॥— আর কোচমান, তুমি কি জান আমাদের বাড়ীতে একটা কি লুকোন কাজ হচ্ছে?

"কৈ না, আমি তো কিছুই শুনি নেই!!"

"কেন? শোননি? মা বাবার জন্যে নতুন বছরের একটি মজার জিনিস ক'রছেন। তিনি আমাদের পশ্চিম দিকের বড় ঘরে যেতে বারণ করেছেন। কোচমান, আমরা তো ভেবেই উঠতে পাচ্ছিনা মা লুকিয়ে কি ক'রছেন!"

কোচম্যান এ বিষয়ে কিছুই বলিতে পারিল না। খাইবার সময় ভাই বোনের মধ্যে এই "নতুন বছরের মজার জিনিস" সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল।

লর্ণা বলিল—"নিশ্চয়ই মা এমন কিছু ক'রছেন যা দেখে বাবা খুব খুসী হবেন। কিন্তু আমার তো বাবাকে দেখে যেমন আহ্লাদ হবে কোন মজার জিনিসে তেমন হবে না।"

তার পর দুইজনে পরামর্শ হইল তাহাদের ভাল নূতন পোষাক পরিয়া তাহারা ষ্টেশনে বাবাকে আনিতে যাইবে। এমন আনন্দের দিনে পুরাতন পোষাকে যাইতে হয়? ছি!!

লর্ণা বলিল—"আর আমাদের উপহার আমরা ষ্টেশনেই নিয়ে যাব ভাই, বাবা ট্রেন হ'তে নামলেই তাঁর হাতে দিতে হবে, তা হ'লে তিনি খুব খুসী হবেন।"

তখন তাহারা ছুটিয়া দেরাজ হইতে তাহাদের উপহার বাহির করিল— লাল ফিতা বাঁধা দুইটি ক্ষুদ্র পার্শেল। লর্ণা টুপির উপরে সে দুটিকে রাখিল পাছে ষ্টেশনে যাইবার সময় তাড়াতাড়ীতে ভুলিয়া যায়! আর ভাবিল মায়ের মজার জিনিস খুব দামী হবে বটে, কিন্তু বাবা আমাদের উপহারই বেশী পছন্দ ক'রবেন।

(২)

বিকালে বেনিডিক্ট লর্ণা, জ্যাক ও কোচম্যান লইয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিল। বালক বালিকার প্রাণ আনন্দ উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। তাহাদের গাড়ীর মধ্যে চুপ করাইয়া রাখা এক দুরুহ ব্যাপার হইয়া উঠিল। ক্ষুদ্র হৃদয় দুটির যত কথা যেন অনন্ত স্রোতে বহির্গত হইয়া গাড়ী খানিকে প্লাবিত করিয়া তুলিল।

জ্যাক পকেট হইতে একটি জীর্ণ টেলিগ্রাফের কাগজ বাহির করিয়া বলিল—"কোচম্যান, তুমি কখনও এমন টেলিগ্রাফ পেয়েছ যাতে হাত প'লেই মন আনন্দে নেচে উঠে? এই দেখ, আমার এই টেলিগ্রাফটী হাতে নিলেই মনে সুখ হয়। এখানি বাবা যুদ্ধে যাবার সময় রাস্তা হ'তে আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন।"

"না আমার তা হয় না। আমার টেলিগ্রাফ এলেই বুক কাঁপে। কারণ তাতে দুঃসংবাদ ছাড়া প্রায়ই কিছু থাকে না।"

লর্ণা বলিল—ঠিক! সেই আমাদের সেদিনকার টেলিগ্রাফের মতন আর কি! যাতে খবর এল বাবা যুদ্ধে পায়ে আঘাত পেয়েছেন। কিন্তু কোচম্যান, তখন আমরা বুঝতে পারিনি তার মধ্যে কতটা সুখবর ছিল। কারণ সেই জন্যেই তো বাবা বাড়ী আসছেন; বাবা আমাদের সৈনিক পুরুষ আঘাতে তাঁর কোনই কষ্ট হয় না।"

বালিকা আরো বলিল—"দেখ কোচম্যান, আমরা দুজনে বাবার জন্যে কি উপহার নিয়ে যাচ্ছি। মা বাবাকে 'চকোলেট' পাঠিয়ে দিতেন; আমরা দুজনে দুটি পার্শেলে চকোলেট নিয়েছি। বাবার এ দেখে খুব আহ্লাদ হবে, না?

কোচম্যানের শুষ্ক হৃদয়টায় যেন হঠাৎ স্নিগ্ধ বর্ষার নববারিবিন্দু পড়িল। সে আনন্দে বলিল—"হ্যাঁ নিশ্চয়ই হবেন।"

ইত্যবসরে তাহাদের গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিল। জ্যাক ও লর্ণা তাড়াতাড়ী গাড়ী হইতে লাফাইয়া প্ল্যাটফরমের দিকে ছুটিয়া গেল। জ্যাক একখানি রুমাল ঘুরাইয়া আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিল—"এই গাড়ীতে বাবা আসবেন, আমরা তাঁকে আদর ক'রে বাড়ী নিয়ে যাব।"

লর্ণা মৃদুস্বরে জ্যাককে বলিল—"দাদা, দেখ সবাই জানে আজ বাবার ফিরে আসবার দিন। দেখ না তাঁকে দেখতে ষ্টেশনে কত লোক এসেছে! সবাই বাবাকে ভালবাসে, নয়? আমরা যেন বাবাকে এত ভালবাসি ব'লে ভুলিনি—এরাও কিন্তু ভোলে নি!"

ট্রেন আর আসে না। ঘড়ির কাঁটাগুলি যেন হঠাৎ খোঁড়া হইয়া পড়িল—নড়িতে চায় না। দুই ভাই বোনে উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে শূন্য রেলপথের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কতক্ষন পরে দূরে একটু ধোঁয়ার কালো রেখা দেখা দিল। জ্যাক মাথার টুপি খুলিয়া দোলাইতে দোলাইতে চীৎকার করিতে লাগিল—"ঐ ট্রেন! ঐ ট্রেন!!"

যথা সময়ে ট্রেন প্ল্যাট ফরমে লাগিল। ক্যাপটেন হ্যামিল্টন্ একটু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গাড়ী হইতে নামিলেন। ভাই বোনে এক সঙ্গে মহা উৎসাহে বাবাকে তাহাদের উপহার দিয়া বলিল—"দেখ বাবা, আমরা দুজনে তোমার জন্যে এক জিনিস এনেছি।"

পিতা আবেগে পুত্র ও কন্যাকে বক্ষে আলিঙ্গন করিলেন। এবং সস্নেহে মুখচুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমাদের মা কেমন আছেন?'

লর্ণা উত্তর করিল—'মা বেশ ভালই আছেন কিন্তু আজ বড় ব্যস্ত। জানিনা তুমি পশ্চিমদিকের বড় ঘরে যেতে পাবে কিনা—আমরা তো পাই না। মা বলেছেন—যতক্ষণ না মজার জিনিস হয় ততক্ষণ সে দিকে যেতে পাব না। বাবা, মা নতুন বছরের জন্যে একটি মজার জিনিষ তৈরি ক'রছেন।"

প্রীতি সূচক আনন্দ ধ্বনির মধ্যে ক্যাপটেন হ্যামিল্টন্ গৃহ অভিমুখে গাড়ি চালাইলেন। লর্ণা তাঁহার কোলের কাছটিতে—পক্ষী শাবক যেমন জনকের পক্ষপুটের মধ্যে বসিয়া থাকে— চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। জ্যাক গাড়ীর পশ্চাতে পিতার কণ্ঠে আপনার ক্ষুদ্র বাহুটি বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া চলিল। যেন স্বর্গের প্রেম বালক ও বালিকা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রণক্লান্ত সৈনিককে স্নেহের আলয়ে অভিনন্দন করিয়া লইয়া চলিল।

পথে, লর্ণা পিতাকে সকল সংবাদ দিতে আরম্ভ করিল। তার ছোট্ট

মুখখানিতে কথা আর ধরে না! সে ভাবিল নূতন বছরের যা কিছু আয়োজন হইতেছে বাবা সব জানিতে চান; তাঁকে শোনান উচিত।

"আমরা মাকে বলেছিলাম এবার আমরা জেগে বসে থাকবো কেমন করে পুরাণ বছর চলে যায়। আমরা কখনও দেখিনি। তাতে মা ব'লেছিলেন— আচ্ছা তাই হবে। কিন্তু—

এই সময় হ্যামিল্টন অন্যমনস্ক ভাবে বলিয়া উঠিলেন—'সুন্দর মতলব কিন্তু!' লর্ণা তাঁর স্বর শুনিয়া বুঝিল পিতার মন অন্যত্র ঘুরিতেছে তিনি তার কথা শুনিতেছেন না। সুতরাং সে কথা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিল।

(৩)

দেখিতে দেখিতে আপনার স্নেহমণ্ডিত পুরাতন গৃহের পরিচিত দৃশ্যগুলি বিদেশ প্রত্যাগত সৈনিকের চক্ষে পড়িল। গাড়ী বাড়ীর দরজায় পৌঁছিবা মাত্র জ্যাক ও লর্ণা লাফাইয়া বাহির হইল। কিন্তু ফিরিয়া দেখিল— পিতা অতি আস্তে নামিতেছেন। তাঁহাকে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে লাঠি ধরিয়া সিঁড়িতে উঠিতে হইল।

লর্ণা জ্যাককে চুপি চুপি বলিল—'দাদা, ষ্টেশনে আমরা এত আমোদে মত্ত ছিলাম যে বাবাকে খুঁড়িয়ে চ'লতে হয় তা লক্ষ্য করিনি'—এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাবার পায়ে হাত দিয়া দুঃখিত স্বরে বলিল—'বাবা, এখনও তোমার পায়ে খুব ব্যথা রয়েছে না?'

'না মা, বেশী কিছু নয়।'

তার পর তাহারা দেখিল তাহাদের পিতা উপরে উঠিয়াই একেবারে পশ্চিমের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। তাহাদের ইচ্ছা নয় যে বাবাকে এত শীঘ্র ছাড়িয়া দেয়, তাই বিজ্ঞাসা করিল—'বাবা, আমরাও তোমার সঙ্গে ও ঘরে যাব?'

ক্যাপটেন গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'না, তোমরা দুজনে খেলা করগে কিন্তু গোলমাল করো না।'

লর্ণা ও জ্যাক মুখ তাকাতাকি করিল। ভাবিল একি! বাবা আজ গোল করতে বারণ করছেন। আজ সহরের সকলেই তাঁকে দেখে কত আমোদ কচ্ছে, আর আমরা চুপ করে খেলবো!!

লর্ণা বলিল—"দাদা, এ কিন্তু বড় আশ্চর্য্য! আমি একবারও ভাবতে পারিনি যে মা বাবাকে দেখতে আগে হ'তে এসে দরজার কাছে দাঁড়াইবেন না।"

জ্যাক বলিল—"বাড়ীতে কি যেন একটা ষড়যন্ত্র চ'লেছে! সব চুপ চাপ। নতুন বছরের মজার জিনিস এই সবের কারণ। আমার সেটাকে একটুও ভাল লাগছে না। তাতেই তো আমাদের সব আমোদ মাটী হ'য়ে গেল! কোথায় আজ বাবাকে নিয়ে সবাই মিলে হাসব, আমোদ ক'রব, না মা কি ছাই মজার জিনিস ক'রতে উপরের ঘরে বন্ধ হ'য়ে বসে রইলেন!!"

যথার্থই বাড়ীতে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছিল; চাকর চাকরাণীরা পর্য্যন্ত যেন কি মহা কার্য্যে ব্যস্ত! 'নার্স' (Nurse) ছেলেরা আজ কোথায় আছে একবার তাহার খোঁজও লইল না। তখন তাহারা ছুটিতে বাবার উদ্দেশে নীচে নামিয়া গেল। কিন্তু তাঁহাকেও দেখিতে পাইল না।

লর্ণা—"আজকার সন্ধ্যে বেলাটা বড্ড ছাই! আমার একটুও ভাল লাগছে না। আমাদের সবাই যেন ছেড়ে দূরে পালাচ্ছে!!"

জ্যাক—"এস ভাই আমরা চুপটী ক'রে সিঁড়িতে বাবার অপেক্ষায় ব'সে থাকি। আমরা গোল ক'রব না।"

তারা দুটিতে দুটি ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তির মত জানালার ভিতর দিয়া মুখ বাড়াইয়া সেইখানে বসিল। বাহিরে ঝটিকার মধ্যে তুষার কণিকাগুলি শ্বেত পক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতে ছিল।

যখন অবশেষে পিতা আসিলেন তিনি বালক বালিকার মাথায় একবার হাত দিয়াই পরক্ষণে গম্ভীর মুখে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

জ্যাক—"লর্ণা, বাবার মুখ দেখলে? তোমার কি মনে হয়?"

লর্ণা—"ঠিক ব'লতে পারিনা; তবে মনে হয় তিনি কোন বিষয়ের জন্যে বিশেষ অসুখী আছেন। দাদা, বল তো বাবার জন্যে আমরা কি ক'রতে পারি? তাঁর মুখ এমন গম্ভীর দেখতে আমার একটুও ভাল লাগছে না। বাবা আমাদের চকোলেটের সামান্য মাত্র খেয়েছেন, আর সব টেবেলে

প'ড়ে আছে। আমি নিশ্চয়ই ব'লতে পারি আমাদের চকোলেট তাঁর আদতে মনে ধরে নি। আর কিছু দিলে বোধ হয় ভাল হ'তো।"

জ্যাক—"হয়তো তিনি কিছু ভাল চুরুট আশা ক'রেছিলেন। এই জন্যেই তাঁর মনটা ভার ভার। আর ঘরেও তো চুরুট নেই যে তাঁকে দেব!"

হঠাৎ যেন জ্যাকের মনের উপর দিয়া বিদ্যুতের মত একটা চিন্তা স্রোত চমকিয়া গেল। সে সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—"লর্ণা, পুরাণ বছর যাবার আগেই আমি দোকান হ'তে কিছু চুরুট এনে বাবাকে দেব মনে ক'রছি। সবাই জানে আমরা এখানে বসে আছি, আর সকলেই খুব ব্যস্ত আছে, এখন গেলে কেউ টেরও পাবে না।"

লর্ণা দাদার এই কথা শুনিয়া বাহিরের ঝটিকা ও তুষার পাতের দিকে ভয়বিহ্বল নেত্রে একবার দৃষ্টিপাত করিল। রজনী ঘোর অন্ধকারময়ী। সে বলিল—"না দাদা, শুনেছি এমন রাত্রে বাইরে বেরিয়ে অনেক লোক মারা পড়েছে।"

জ্যাক—"না, বরফের জন্যে আমি কিছু ভয় করি না। আমি নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছুতে পারব। বাবার জন্যে একটু কষ্ট স্বীকার ক'রতে হ'লই বা।"

দাদার উৎসাহপূর্ণ বাক্য শুনিয়া লর্ণার মনও আশান্বিত হইল। সে বলিল—"তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাব। যদি বরফে কোন জায়গায় তোমার পা আটকে যায় আমি হাত দিয়া বরফ সরিয়ে দেব। আর আমার কাছে ৪ 'পেন্স' আছে, তাতেই বোধ হয় চুরুট কেনা হবে?"

'তা হবে।'

তখন দুজনে পোষাক পরিয়া প্রাণের আবেগে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। অন্ধকার রাত্রিতে যেন প্রলয়ের অভিনয় চলিতেছিল। একটি তারার ক্ষীণ রশ্মিও সে অন্ধকারে আলোকের রেখাপাত করে নাই।

বাহিরে আসিয়া তাহারা সম্যক রূপে বুঝিতে পারিল সে রাত্রি কি ভীষণ! কিন্তু প্রেমের প্রেরণায় দুটি ক্ষুদ্র শিশু সেই ভীষণ ঝটিকা সঙ্কুল রজনীতে দোকানের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া যখন তাহারা গ্রামে পৌঁছিল তখন—

সর্ব্বনাশ!—দেখিল দোকান বন্ধ!!

বালিকা লর্ণা কাঁদিয়া ফেলিল। সে আশা এতক্ষণ ক্ষুদ্র বুকে বল দিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সে রোদন সম্বরণ করিতে পারিলনা।

জ্যাক প্রবোধ দিল—'লর্ণা, কেঁদনা। ঐ দেখ ঐ দোকানে আলো দেখা যাচ্ছে। ওখানে বোধ হয় চুরুট বিক্রয় হয়— তুমি এইখানে বস, আমি ছুটে গিয়ে নিয়ে আসি।' বালিকা কিছুই বলিতে পারিল না।

জ্যাক সেই দোকানে গিয়াই টেবিলের উপর পেনি কয়টী রাখিল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—'আমাকে এই দামের চুরুট দাও। আমি বাবার জন্যে চুরুট নিতে এসেছি। আমার ছোট বোনটী বাইরে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছে। একটু শিগ্রি দিও।'

দোকানের লোকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইল। একটি ক্ষুদ্র বালক— সর্ব্বাঙ্গ বরফে আচ্ছন্ন— এই ভীষণ রাত্রিতে দোকানে উপস্থিত!!

প্রকৃত পক্ষে সে দোকানে চুরুট বিক্রয় হইত না। কিন্তু অধ্যক্ষ বলিলেন—"বালক, আমি তোমাকে সব চেয়ে ভাল চুরুট দেব। আর যে ছেলেরা বাপ মা কে এত ভালবাসে তাদের কাছে আমরা জিনিসের দাম নিই না"—এই বলিয়া বালকের হস্তে নিজের ব্যবহারের জন্য রক্ষিত একটি উৎকৃষ্ট চুরুটের বাক্স দিয়া, 'পেনি' কয়টী ফিরাইয়া দিলেন।

জ্যাক লাফাইতে লাফাইতে লর্ণার কাছে আসিল। তখন চুরুট পাইয়া সে সব কষ্ট ভুলিয়া গেছে। কিন্তু সে দেখিল লর্ণা শীতে ও বরফে অভিভূত হইয়া আধ ঘুমন্তের মত বসিয়া কাঁপিতেছে।

জ্যাক লর্ণাকে কোলে করিয়া তুলিল, কত নাড়া দিল, তবে তাহার ঘোর ভাঙ্গিল। বেচারা তখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে।

সে দাদার হাতে চুরুটের বাক্স দেখিয়াই আবার যেন সজীব হইয়া উঠিল এবং দাদার কাঁধে ভর দিয়া সেই ঝটিকা ও বরফের মধ্যে গৃহ অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন তাহাদের মনে হইল বুঝিবা সকালের পূর্ব্বে তাহারা কিছুতেই বাড়ী পৌঁছিতে পারিবে না।

কিন্তু প্রেম অদ্ভুত কর্ম্মী বীর। দুটি ক্ষুদ্র শিশুর হৃদয়ে সেই মুহূর্ত্তে প্রেমের যে অমিত বল সঞ্চিত ছিল তাহার সম্মুখে ঝটিকা তো অতি তুচ্ছ—

পর্ব্বতও চূর্ণ হইয়া যায়। তাহারা সেই ক্ষুদ্র বাক্সটীর মধ্যে তাহাদের মহান পবিত্র স্নেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল।

অবশেষে বহু কষ্টে যখন বাড়ীর নিকটে আসিয়া পৌছিল তখন দেখিল—দরজা খোলা এবং দরজার সম্মুখে একখানি গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে।

এই সুযোগে তাহারা দুটিতে গোপনে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই সময় একজন শুভ্রকেশ বৃদ্ধ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং চাকর রিচার্ড দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

(৪)

লর্ণা, পোষাক বদ্‌লান হ'য়েছে?

হ্যাঁ, দাদা ভেতরে এস।

জ্যাক গৃহে প্রবেশ করিল। লর্ণা শুষ্ক বস্ত্রে হাসি মুখে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

জ্যাক জিজ্ঞাসা করিল—'লর্ণা, কাঁপুনি এখন থেমেছে বোন?'

লর্ণা—'হ্যাঁ দাদা, এই দেখনা এখন আমি বেশ আঙ্গুল নাড়্‌তে পারচি। তুমি কি ক'রলে?

জ্যাক—'আমিও চুপ চাপ পোষাক ব'দ্‌লে ফেলে রিচার্ডকে দিয়ে বাবার কাছে চুরুট পাঠিয়ে দিয়েছি। লর্ণা, নতুন বছর আসবার তো ভাই আর সময় হ'য়ে এল। এখনই চারি দিকে ঘণ্টা বেজে উঠবে। তবে চল আমরা নীচে গিয়ে দেখি যদি বাবাকে সেখানে দেখতে পাই।'

দুই জনে নামিয়া যাইবার সময় হঠাৎ থামিল এবং সিঁড়ির থামের মধ্য দিয়া একবার উঁকি মারিয়া দেখিল। লর্ণা আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া দাদার হাতখানি একটু সজোরে টিপিল।

তাহারা দেখিল তাহাদের পিতা প্রফুল্ল মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। আর সে চিন্তান্বিত বিমর্ষ ভাব নাই—আনন্দের আভায় চক্ষু দুইটি যেন হাসিতেছে।

জ্যাক বলিল—"ঠিক লর্ণা, আমরা ঠিক ভেবেছিলাম। চকোলেট বাবার মনে ধরে নেই। দেখনা চুরুট পেয়ে বাবার কেমন স্ফুর্ত্তি হ'য়েছে।"

তখন তাহারা ছুটিয়া গিয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল—

'বাবা আমরা ঠিক বুঝ্‌তে পেরেছিলাম না। যা হোক্ এখন তো তোমার মনে আহ্লাদ হয়েছে?'

পিতা সেই ক্ষুদ্র স্নেহোপহারের দিকে চাহিলেন। কিন্তু কত কষ্টে যে তাহারা উহা সংগ্রহ করিয়াছিল তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি সস্নেহে দুই জনের মুখ চুম্বন করিলেন। তখন তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল—'এইবার বাবা, আমাদের পশ্চিমের ঘরে নিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখনও কোন গোলমাল ক'রতে পাবে না।'

যাইবার সময় লর্ণা কত কি ভাবিতে লাগিল। না জানি কি দেখিবে!! সে কেমন করিয়া পুরাতন বৎসর চলিয়া যাইবে মনে মনে তাহারই একটি কাল্পনিক ছবি আঁকিতেছিল। তাহার মনে হইতে লাগিল পুরাতন বছরের কাছে সে হাত ধরিয়া বিদায় লইবে। আহা! তাহাতে শয়ন কালের বাতিটীর মত নিবিয়া যাইতে দেওয়া বড় নিষ্ঠুরের কায! এরূপ ব্যবহারে না জানি তাহার মনে সে কত ব্যথা পাইবে! নূতন বৎসর নিশ্চয়ই একটি ক্ষুদ্র শিশু। সুন্দর হাসি ভরা মুখখানি দেখিলে সকলেরই তাহাকে চুম্বন করিতে ইচ্ছা হইবে—বোধ হয় একটি পাশে চুপ করিয়া থাকিবে কারণ সে আমাদের কাহাকেও চেনে না—এইরূপ কত কি ভাবিতে ভাবিতে সে চলিল।

ক্যাপটেন হ্যামিল্টন তাহাদিগকে পশ্চিম দিকের একটি বৃহৎ কুঠুরীতে লইয়া গিয়া স্নেহচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলিলেন—"এই দেখ, এইটী আমার নূতন বৎসরের উপহার।"

তাহারা দুইজনে বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—পালঙ্কোপরি একটি সুন্দর শুভ্র শয্যা। আর কিছুই নাই।

লর্ণা তখন ব্যাকুল ভাবে এদিক ওদিক তাকাইয়া রেশমী মশারির ভিতর দিয়া কি দেখিল এবং আনন্দে জ্যাককে বলিল—'ও দাদা, দেখ, দেখ, মশারির মধ্যে কেমন ছোট্ট সুন্দর নতুন বছর শুয়ে রয়েছে!!'

এই সময়ে চারিদিকে নববর্ষের শুভ আগমনসূচক মঙ্গল ঘণ্টাধ্বনি গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সৈনিক পিতা সন্তানদের বলিলেন—ওই শোন, সকলে নূতন বৎসরকে

গৃহে বরণ করিয়া তুলিতেছে।— এই বলিয়া তিনি শয্যাশায়িত ক্ষুদ্র জীবন কণিকার উপর সাদরে একটি স্নেহের চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিলেন।

জ্যাক বলিয়া উঠিল—'ও ভাই, দেখ আমাদেরই জন্যে কিন্তু সবাই আনন্দ ক'রছে—চারিদিকে ঘণ্টা বাজছে। কারণ 'নতুন বছর' তো আমাদেরি বাড়ী এসে গুলেছে।"

লর্ণা বলিল—আর দাদা, সেই যে শাদা দাড়ি বুড়ো লোকটীকে বা'র হ'য়ে যেতে দেখেছিলাম, সেই হচ্ছে "পুরাণ বছর" রাত্রে বাড়ী হতে চলে গেল। না ভাই?

সৈনিক পিতা বালক বালিকার কথা শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া হাসিলেন। কিন্তু তিনি কখনও শিশুদের সরল মনের এই সুন্দর বিশ্বাসটী ভাঙ্গিয়া দেন নাই।*

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

মেয়েলি ব্রতকথা।

লক্ষ্মীর কথা।

(৩)

এক ব্রাহ্মণের তিন পুত্র ও এক কন্যা ছিল। কন্যার নাম মটুকি। প্রতি রজনীর শেষ ভাগে তাহার মাথায় নয়খানি করিয়া সোণার মটুক ফুটিত। তন্মধ্যে তিনখানি স্বর্গে চলিয়া যাইত, তিনখানি রসাতলে যাইত এবং অবশিষ্ট তিনখানি তাহার মাথাতেই থাকিত। তাহার মাতা ও ভ্রাতা বাসি জলের ছিটা দিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া লইত।

---

* Strand Magazine এর ১৯০২ সালের জানুয়ারী সংখ্যা হইতে ভাষান্তরিত।

দেখিতে দেখিতে কন্যা বিবাহের যোগ্যা হইল। মাতা ভাবিতে লাগিলেন, উপযুক্ত পাত্রে কন্যা অর্পণ করিলে, তাহাদের আয়—প্রত্যহ তিনখানি সোণার মটুক বন্ধ হইবে। সুতরাং এক নির্ব্বোধের সহিত দুহিতার বিবাহ দিয়া ঘর জামাই করিয়া রাখা যাক্।

পুত্রের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া জননী, বর অন্বেষণে তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা যাইতে যাইতে দেখে একটি লোক যে ডালে বসিয়া আছে সেই ডালের গোড়াই কাটিতেছে। তাহাকে দেখিয়া তাহারা ভাবিল, ইহার ন্যায় অবোধ আর কেহ নাই, সুতরাং ইহার সহিত মটুকির বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। অতঃপর তাহারা অবোধকে লইয়া বাড়ী আসিয়া, মটুকির সহিত তাহার বিবাহ দিয়া দিল এবং বলিয়া দিল যে, রাত্রি শেষে মটুকির মাথার দিকে যেন সে না তাকায়।

প্রভাত হইলেই মাতা আসিয়া মটুকির মাথা হইতে মটুক তিনখানি ভাঙ্গিয়া লইয়া যায়। একদিন মটুকি তাহার স্বামীকে বলিল, "আমার মাথায় প্রত্যহ তিনখানি করিয়া সোণার মটুক ফুটে। মা আসিয়া তাহা লইয়া যান। তুমি অবোধ, তোমাকে রাত্রে আমার মাথার দিকে তাকাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে, তাইতে তুমি তাকাও না। আজ থেকে তুমি এক কাজ করো, ভোর হইলে বাসি জলের ছিটা দিয়া তুমি মটুক কয়খানি ভাঙ্গিয়া লইও।"

অবোধ তাহাই করিল। প্রত্যুষে মটুকির মাতা আসিয়া দেখে, মটুক নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, যে অবোধ ভাঙ্গিয়া লইয়াছে। তিনি দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রের নিকট যাইয়া বলিলেন, যে অবোধ চালাক হয়েছে। সে আজ মটুক ভাঙ্গিয়া লইয়াছে।

পুত্রগণ অবোধকে দূর করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে বলিল, "আয় অবোধ, ধানের ক্ষেত দেখে আসি।" অবোধ প্রসন্নচিত্তে তাহাদের অনুসরণ করিল। কিয়দ্দূর যাইয়া এক ক্ষেত্রে তাহাকে পুতিয়া রাখিয়া মটুকির ভ্রাতারা ফিরিয়া আসিল। মটুকি স্বামীর কথা ভ্রাতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না।

বৈকালে মটুকি চুল বাঁধিতেছে, এমন সময় একটি কাক তাহার সম্মুখে

যাইয়া ডাকিতে লাগিল। মট্‌কি বিরক্ত হইয়া চিরণী ফেলিয়া উহাকে প্রহার করিল। কাক তাহার চিরণীখান মুখে করিয়া লইয়া উড়িয়া গেল। চিরণী লইয়া উড়িয়া যাইতে দেখিয়া মট্‌কিও তাহার পশ্চাতানুসরণ করিল। কিয়দ্দূর যাইয়া কাক চিরণীখান এক ধানের ক্ষেতের মধ্যে ফেলিয়া দিল। মট্‌কি তথায় যাইয়া দেখে, অবোধ মৃত্তিকা নিম্নে প্রোথিত, কেবল মাথাটা বাহিরে আছে। সে স্বামীকে মৃত্তিকা হইতে উত্তোলন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার আর কে আছে? অবোধ বলিল, মা আছে।

মট্‌কি—চল আমরা সেখানে যাই, এই বলিয়া মট্‌কি তাহার পুত্র দুইটিকে লইয়া অবোধের সহিত পলাইয়া শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গেল।

শ্বশুর বাড়ী যাইয়া মট্‌কি ক্রমে ক্রমে বাড়ীঘর ভাল করিল, হাট বাজার বসাইল, জলাশয় দীঘি প্রতিষ্ঠা করিল। মট্‌কির জয় জয়কার হইতে লাগিল। অবোধের মা যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে, এবাড়ী কার—লোকে বলে মট্‌কির। পুকুর, হাট, বাজার সবই মট্‌কির। শুনিতে শুনিতে শাশুড়ী বিরক্ত হইয়া বলিল,— কি সবই মট্‌কির আমার অবোধের কিছু না, এই বলিয়া সে মট্‌কির সন্তান দুইটি লইয়া যাইয়া কুম্ভকারের সজ্জিত পোনের মধ্যে রাখিয়া আসিল। সেই দিনই কুমাররা পোনে আগুন লাগাইবে, কিন্তু আগুন কিছুতেই লাগাইতে পারে না,—নিভিয়া যায়। অবশেষে একজন পোনের মধ্যে যাইয়া দেখে মট্‌কির পুত্র দুইটি সোণার ভেটা লইয়া খেলা করিতেছে। তাহারা পুত্র দুইটিকে মট্‌কির নিকট লইয়া যাইয়া বলিল, এখনই সর্ব্বনাশ হইত, এমন করিয়া ছেলে ছাড়িয়া দেয়? তাহারা পোনের মধ্যে বসিয়া ছিল, আমরা পোনে আগুন দিয়াছিলাম। আর একটু না জানতে পারলেই সর্ব্বনাশ হয়ে যেত।

মট্‌কি বলিল,— বুঝেছি এসব শাশুড়ীর কাজ।

মায়ে মারিল স্বামী শাশুড়ী মারিল পুত,
প্রাণের ব্যথা কাকে বলি মট্‌কি অবধুত।

অতঃপর মট্‌কি স্বামী ও পুত্রগণ সমভিব্যাহারে স্বর্গে চলিয়া গেল।

—*—

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

যেমন যায়, তেমন হয় না। ভালও না,—মন্দও না। রাম গিয়াছে, রাবণ গিয়াছে,—আর কেহ তেমন হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। যে যায় সে চিরদিনের মত তাহার দোষগুণ লইয়া চলিয়া যায়। ঠিক তেমন মানুষ আর হয় না। ইহার মূলে—ব্যক্তিগত বিশেষত্ব। বঙ্গসাহিত্য হইতে এই রূপ কতকগুলি ব্যক্তিগত বিশেষত্ব চলিয়া গিয়াছে বলিয়া, কেহ কেহ বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় হতাশ হইয়া হাহাকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস,—এসংসারে যাহা গেল, তাহাই ভাল ছিল; যাহা আসিতেছে, তাহা ভাল হওয়া দূরে থাক্, সমকক্ষও হইতে পারিবে না। ব্যক্তিগত বিশেষত্ব ধরিলে ইহাকে সত্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ আশঙ্কা অমূলক। জগতের ইতিহাস তাহার প্রধান সাক্ষী।

বঙ্গসাহিত্যের যে দিন চলিয়া গিয়াছে, তখনকার হিসাবে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দিন;—তেমন দিন পূর্ব্বে ছিল না। যে দিন আসিয়াছে, তাহা একটু পৃথক; কালগত বিশেষত্বে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু স্বতন্ত্র। কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া হাহাকার করিবার কারণ নাই।

তখন অল্পলোকে লিখিত,—যাহারা লিখিত তাহারা সকলেই লিখিতে জানিত না। অনেকের লিপিকৌশল নিতান্তই নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে যে যাহা লিখিত, তাহাই চলিয়া যাইত। এখন অনেক লোকে লিখিতেছে; যাহারা লিখিতে জানে, তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। তথাপি কেহ কেহ বলিতেছেন—ইহারা যাহা লিখিতেছে, তাহা ছাই! এসকল লেখা কি লেখা? লেখা যাহা, তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে,—এ কেবল পুরাতনের চর্ব্বিতচর্ব্বন! নিকৃষ্ট অনুকরণ!

যখন কথা উঠিয়াছে, তখন বিচার আবশ্যক। তখনকার এবং এখনকার

মাসিকপত্রের প্রবন্ধ ধরিয়া বিচার করিতে বসিলে, সর্ব্বাগ্রে একটি কথা লক্ষ্য করা আবশ্যক। তখনকার লেখার মধ্যে শিখাইবার ভাব প্রবল ছিল, এখনকার লেখার মধ্যে শিখিবার ভাব প্রবল হইয়া উঠিতেছে। তজ্জন্য এখনকার লেখায় আর সাহঙ্কার উক্তি তেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তখনকার লেখক কথায় কথায় লিখিয়া বসিতেন,—"যদি না বুঝিতে পার, তবে জানিয়া রাখ, এ প্রবন্ধ তোমার জন্য লিখিতেছি না।" এই প্রবৃত্তি প্রবল থাকায়, তাঁহারা পাঠকের মুখের দিকে চাহিয়া লিখিতেন না, পাঠকের রুচির প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করিতেন না। কলম কিছু অসংযত ভাবেই ধাবিত হইত। তাহার ভাব ভঙ্গীর ভিতর দিয়া পূর্ব্বাচার্য্য-গণের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের আভাসও সময়ে সময়ে অভিব্যক্ত হইত। তুলনায় এখনকার লেখা সংযত হইয়াছে।

তখনকার লেখক ভাষাসৃষ্টি করিতেন, রচনারীতি সংস্থাপন করিতেন; কোন পুরাতন আদর্শ না থাকায়, স্বাধীনভাবে বচনবিন্যাসে বাহাদুরী দেখাইতেন। এখন আর সেদিন নাই; পদে পদে নিয়ম ও রীতির নিগড়! সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত নামমাত্র পরিচয়ের পরিবর্ত্তে ক্রমে ঘনিষ্ট যোগ সংস্থাপিত হইয়াছে; তজ্জন্য পাণ্ডিত্য প্রকাশের প্রগল্‌ভতাও সংযত হইয়াছে।

এখন সাহিত্যের নানা শাখা বাহুবিস্তার করিয়াছে; নানা দিকে স্বাধীন অনুসন্ধিৎসা ধাবিত হইয়া তথ্য সংগ্রহে ব্যাকুল হইয়াছে। না জানিয়া কথা কহিবার সাহস তিরোহিত হইয়া, জ্ঞাতবিষয়ের আলোচনাকেও সংযত করিয়া তুলিয়াছে। এখনকার লেখকের পক্ষে তখনকার লেখকের ন্যায় প্রতিভা প্রদর্শনের সম্ভাবনা ক্রমেই সংকুচিত হইয়া আসিতেছে!

"বিদ্যাসাগরও যদি উত্তরচরিতের মর্য্যাদা বুঝিতে সমর্থ হইলেন না, তবে যদু বাবু, মধু বাবু তাহার কি বুঝিবেন?"—এমন লেখা এখনকার লেখনী মুখে বাহির হইতে গেলে, বাধা প্রাপ্ত হয়। কোন্ লেখা ভাল তাহা বলিতেছি না,—এখন এরূপ লেখা একেবারে অচল! হয়ত লোকের রুচি বিগুড়াইয়া গিয়াছে; তাহারা শিষ্যমুখে গুরুগ্লানি সহ্য করিতে অসমর্থ!

ইহার জন্য আক্ষেপ করা বৃথা।

"নয়টি বৈ রস নয়, কিন্তু মনুষ্যচিত্তবৃত্তি অসংখ্য। রতি, শোক, ক্রোধ, স্থায়ীভাব; কিন্তু হর্ষ, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। স্নেহ, প্রণয়, দয়া ইহাদের কোথাও স্থান নাই;—না স্থায়ী, না ব্যভিচারী,—কিন্তু একটি কাব্যানুপযোগী কদর্য্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকার স্বরূপ স্থায়ীভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে। স্নেহ, প্রণয়, দয়াদি পরিজ্ঞাপক রস নাই; কিন্তু শান্তি একটি রস। সুতরাং এবম্বিধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য্য সম্পন্ন হয় না। আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি—আলংকারিকদিগকে প্রণাম করি।"—এরূপ লেখাও এখনকার লেখনীমুখে বহির্গত হইতে সাহস পায় না। নিজে না বুঝিয়া, অপরকে তিরস্কার বা উপহাস করিয়া, পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। একদিন এ সকল লেখা বেশ চলিয়াছিল, এখন কেহ এরূপ লিখিলে চলে না! প্রতিভা বড় অল্প অধ্যয়ন লইয়া বড় বিস্তৃত ব্যাখ্যা লিখিত; সেদিন চলিয়া গিয়াছে।

পদবিন্যাসে ও ভাববিকাশে যে নৃত্যলালিত্য ছিল, তাহাও সংযত হইয়া আসিয়াছে! এখন নৃত্য অচল! "ও হীরে! ছি! ছি! হীরে! মুখখানিত দেখিতে মন্দ নয়—বয়সও নবীন, তবে হৃদয় মধ্যে এত খল কপট কেন?" জোয়ারের জলকল্লোলের সঙ্গে এই কল্লোলিনী ভাষাও ভাসিয়া গিয়াছে। এখন এরূপ ভাষা দুর্ল্লভ,—কারণ এখন এরূপ ভাষা অচল!

এখন আট ঘাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে; গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া লেখকের পাণ্ডিত্য প্রকাশের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন আর যেমন গিয়াছে, তেমন আসিবার উপায় নাই। এখনকার প্রবন্ধে—পদ্যে গদ্যে—নূতন ধরণ, নূতন চাল চলন, নূতন ভাবের নূতন অভিব্যক্তি। ইহাকে ভাল না বলিতে পার, মন্দ বলিয়া নিন্দা করাও শোভা পায় না। পদ্যে গদ্যে এখনকার লেখায় আর এক শ্রেণীর শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। সে শক্তি সাহিত্যকে বাল্যলীলা পরিহার করিয়া যৌবনের কর্ম্মভূমিতে পদার্পন করিবার জন্য নিয়ত আহ্বান করিতেছে। বৈষ্ণবকবির কান্ত পদাবলী

বড় মধুর লাগিত; কিন্তু তাহাই যদি অদ্যাপি প্রচলিত থাকিত, ভাষা এতদূর হৃষ্ট পুষ্ট হইত না। যাহা গিয়াছে তাহা তখনকার হিসাবে অতুলনীয় ছিল; তাহার পর যাহা আসিয়াছে, তাহাকে অযোগ্য উত্তরাধিকারী বলা যায় না।

বঙ্গদর্শন গেল, আর্য্যদর্শন গেল, বান্ধব গেল, জ্ঞানাঙ্কুর গেল;—কাল-স্রোতে ভাষমান এই সকল বুদ্বুদ ক্ষণকালমাত্র পরিদৃশ্যমান হইয়া বুদ্বুদলীলা পরিসমাপ্ত করিল। কিন্তু সাহিত্য সরোবর বুদ্বুদহীন হইল না;—এক মরিল, আর জন্ম গ্রহণ করিল। নবজীবন, প্রচার—আরও কত নামে কত আকারে কত পত্র বুদ্বুদবৎ ভাসমান হইল। নামের পার্থক্য মাত্র, প্রকৃত পক্ষে তাহারা সেই পুরাতনেরই নবকলেবর! কালে তাহাও আবার ডুবিয়া গেল। এখন তাহার স্থানে নূতন নূতন বুদ্বুদ ভাসিতেছে। এ সকলই বুদ্বুদ— ক্ষণ স্থায়ী— অন্তঃসার শূন্য— অকিঞ্চিৎকর। তথাপি এই সকল বুদ্বুদের উত্থান পতন ও পুনরুত্থানের মধ্যে এক নৈসর্গিক লীলা দেদীপ্যমান। সাহিত্যকে সমুন্নত করিবার চেষ্টাই তাহার মূল। সে চেষ্টা বিরত হয় নাই। তখন সে চেষ্টা যে পথ অবলম্বন করিয়াছিল, এখন তাহার যৎসামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখন পুষ্টিকর খাদ্য অপেক্ষা মুখরোচক মোরব্বার ছড়াছড়ি হইয়াছিল,—তাহা এত মিঠা, যে সময়ে সময়ে তিন্তিড়ী ভক্ষণের প্রয়োজন হইত। শিশুসাহিত্যের পক্ষে তত মিঠা সহিল না!

লোকে বর্ত্তমান লইয়া সুখী হইতে চায় না। ইহার দুই কারণ,—অসন্তোষ ও অতৃপ্তি; অসন্তোষ হইতে অনাদর, অতৃপ্তি হইতে উন্নতিকামনা জন্মগ্রহণ করে। এখনকার সাহিত্য সমালোচনায় অতৃপ্তি থাকিলে আশা ছিল; কালে তাহা হইতে উন্নতিকামনা জন্মগ্রহণ করিত। এখনকার সমালোচনায় কেবল অসন্তোষ! ইহাতে সাহিত্য হীনবল হইয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমান মাসিকপত্রের যাহা যথার্থ দোষ, যথার্থ ত্রুটি, যথার্থ অসম্পূর্ণতা, তাহার কথা চাপা পড়িয়া যাইতেছে; তাহার গুণগুলিও অনাদরে ধূলিলুণ্ঠিত হইতেছে!

এখনকার মাসিক সাহিত্যে উপন্যাস, উপকথা, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ও সমালোচনার চর্চ্চা হইয়া থাকে। সকল লেখা সুখপাঠ্য, সরল, সুমার্জ্জিত না হইলেও, অধিকাংশ লেখাই লেখকের চেষ্টা ও যত্নের পরিচয় প্রদান করে; অধ্যয়ন ও তথ্যানুসন্ধানের অনুরাগের আভাস প্রকাশ করে; ক্রমে আরও ভাল হইবার আশার বিকাশ করিয়া থাকে। দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ও সমালোচনার ন্যায় উপন্যাস উপকথাও নূতন পথে পরিচালিত হইতেছে। বাহ্যপ্রকৃতি ছাড়িয়া মানব প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা বর্ত্তমান উপন্যাস উপকথাকে এক নূতন ছাঁচে ঢালিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন কথোপকথন অল্প, কাব্যকর্ত্তার কথাই অধিক। তখনকার উপন্যাসে নাটকের ছায়া ছিল; এখনি সে ছায়া ক্রমেই বিলীন হইতেছে। নাটকে কথোপকথনের ভিতর দিয়া পাত্র পাত্রীকে চিনিয়া লইতে হয়, কাব্যকর্ত্তা স্বয়ং কিছুই বলিবার অবকাশ পান না। উপন্যাসে তাঁহার সে অবসর উপস্থিত হয়। তিনি স্বয়ং রূপবর্ণনা করিয়া, চরিত্র সমালোচনা করিয়া, কে কেমন তাহা বুঝাইয়া দেন। তখনকার উপন্যাস লেখক পাত্র পাত্রী উপনীত করিবামাত্র তাহাদের বাহ্যরূপের বর্ণনায় ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, দীর্ঘাতিদীর্ঘ সমালোচনায় তাহাদের চরিত্র বুঝাইবার জন্য লেখনীচালনা করিতেন। এখন সে বিষয়েও একটু পার্থক্য প্রবেশ করিয়াছে। বাহ্যরূপের বর্ণনা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না; চরিত্র সমালোচনার ভারও লেখক স্বয়ং গ্রহণ করিতে অসম্মত। সেকালের উপন্যাস সকলেই সহজে বুঝিত, কারণ কাব্যকর্ত্তা পাঠকের শ্রমলাঘবের জন্য সকল কথাই বুঝাইয়া বলিতেন। একালের উপন্যাসের সকল কথা সকলে বুঝিতে পারে না,—কারণ কাব্যকর্ত্তা বুঝিবার ভার পাঠকের উপর ন্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। চিত্র সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে যেমন সৌন্দর্য্য বোধশক্তির উন্মেষ আবশ্যক, এখনকার উপন্যাসাদির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেও সেইরূপ সৌন্দর্য্যবোধশক্তির উন্মেষ আবশ্যক। আমি বুঝিলাম না, অতএব বুঝিবার কিছু নাই,—এ কথা বলিতে অনেকখানি সাহসের প্রয়োজন!

এখনকার দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস সম্বন্ধীয় মাসিকপত্রের প্রবন্ধ অনেক নূতন কথা শিখাইতেছে, অনেক পুরাতন ভ্রমসংশোধনের সহায়তা সাধন করিতেছে। তাহাতে মোরব্বার মিঠা স্বাদের অভাব থাকিলেও,

তাহা সাহিত্যের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য। সে খাদ্যে লোকের রুচি ছিল না,—ধীরে ধীরে রুচির উদ্রেক হইতেছে।

তখনকার ন্যায় এখনও উচ্চশ্রেণীর মাসিকপত্রের প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজন দিন দিন অধিক অনুভূত হইতেছে। সুতরাং এখনকার মাসিক সাহিত্য সমালোচনায় একটু ধৈর্য্যের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

অনন্ত।

কত যুগ যুগান্তর আসে আর যায়,
কেহ তার কূল মূল খুঁজি নাহি পায়
মহাকাল স্রোতে! রাত্রি আসে দিবা শেষে
ছয় ঋতু আসে যায় নব নব বেশে।

পূর্ণকরি বিচিত্রতা আলোকে, আঁধারে
কে যেন পাঠায় তরী মর্ত্ত্যের দুয়ারে
বিশ্বের বাণিজ্যে। ধূলার কাঙ্গাল মোরা,
কেমনে করিব ভেদ ভয়ঙ্করী ঘোরা
অসীম রহস্য মায়া! অনন্তের পিছে
অহর্নিশ কাল চক্র ঘুরিছে ফিরিছে
কোন্ লক্ষ্য আশে; সরলা তটিনী
কি আশায় চির দিন সাগর গামিনী;

কোন্ সাধ কোন্ স্মৃতি জ্বালাইয়া বুকে
দামিনী ছুটিয়া যায় মদমত্ত মুখে
আপনারি অন্তপানে!

কিসের সন্ধানে
হু হু রবে ছুটিতেছে অনন্তে বাতাস,
কি যাতনা বক্ষে লয়ে করিছে হুতাস
কে বুঝে সে মর্ম্ম ধ্বনি; বাজে কোন্ সুর
বিশ্ব যন্ত্রে চির মৌন মঙ্গল মধুর
কি সঙ্গীত ধারা!

আজি আমি আত্মহারা!
ঝিল্লি মন্ত্র মুখরিত সুসুপ্ত ধরণী
শিহরে দক্ষিণ বায়ে; বাসন্তি রজনী
হাসিছে শিয়রে বসি। ওকি শুধু হাসি?
না ও কোন অমরীর অশ্রু মুক্তারাশি,—
অমৃত ধরার!

মনে উঠে বার বার
শত প্রশ্ন, জানিবারে অজ্ঞেয় বারতা,
কে ভাঙ্গিবে মোর কাছে গূঢ় জটিলতা?
আরাম শয়নে সুখে ঘুমায় জগত;
অন্ধ আমি, অন্ধকারে খুঁজিতেছি পথ!

শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ।

সংক্ষিপ্ত সাহিত্য সমালোচনা।

বান্ধব। ১৩০৮

আমাদের বান্ধব আসিয়াছে। চিরদিনই বন্ধুর আগমন বড় সুখের। আর যদি সেই বন্ধু বন্ধুর মত হন তাহা হইলে তাঁহার শুভাগমন-সুখ বর্ণনাতীত। সে আজ কতদিনের কথা—বঙ্গসাহিত্যের সেই এক সমুজ্জ্বল সুন্দর যুগে,—বঙ্কিম, হেম প্রভৃতির পূর্ণউদ্যমের যুগে বান্ধব বঙ্গদর্শনের সহিত বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে সে যুগ স্মরণীয়। বঙ্কিম পাকা মাঝি ছিলেন—তরঙ্গতাড়িত হইয়াও বঙ্গদর্শনকে ছাড়িয়াছিলেন না, কূলের নৌকা কূলে ভিড়াইয়া দিয়া মাঝিগিরি ছাড়িয়া দিলেন। বান্ধব তখনও ছিল। তারপর কালের অপ্রতিহত নিয়মে বঙ্গদর্শনরূপ ক্ষুদ্র বুদ্বুদ অনন্তের শরীরে লয় প্রাপ্ত হইল; বান্ধবও বন্ধুগৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় কোন্ অন্ধকারে আপনার অস্তিত্ব আচ্ছাদিত করিয়া রাখিল—বান্ধব কি মরিয়াছিল? বঙ্গদর্শন মরিয়াছিল, কেহ কেহ বলেন মরিয়াই বাঁচিয়াছিল। বান্ধবের অন্তর্ধানকে আমরা তাহার মৃত্যু বলিতে পারি না; বান্ধব কিছু দিনের জন্য লোকলোচনান্তর্গত হইবেনা স্থির করিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আবার সেই বান্ধব আসিয়াছে—সেই কালীপ্রসন্ন বাবুর বজ্রমুষ্টি আবার বান্ধবতরণীর কর্ণ ধরিয়া রহিয়াছে—ভাষা ও ভাবে আবার বান্ধব সেই বেশেই দেখা দিয়াছে। তাই আমরা বলিতেছি বান্ধব মরিয়াছিল না, আত্মগোপন করিয়াছিল। বান্ধব যদি আত্মগোপন করিয়াছিল তবে আবার দেখা দিল কেন? বঙ্গদর্শন দেখা দিয়াছে বলিয়া কি? না, তাহা নহে। বঙ্গদর্শন নূতন হইয়া নব জন্ম গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। তাহার নামের সহিত একটা সুখের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে বটে কিন্তু তাই বলিয়া বলিতে পারি না যে এই—সেই। সেই ভাল ছিল কি এই ভাল হইয়াছে সে বিচারের

সময় এখনও আসে নাই। তবে সেই—এই নয়, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু সেই বান্ধব আর এই বান্ধব এক। তবে বান্ধব আবার আসিল কেন? তাহারও কর্ত্তব্য এবং প্রয়োজন আছে বলিয়া। প্রয়োজন কি?—

"প্রয়োজন নিয়তি,—প্রয়োজন জীবনের পৃথগ্‌ভূত নির্দ্দেশ। জীবনের প্রকৃত গতি ও পরিণতি বিষয়ে পার্থক্য না থাকিলেও ... ... বড় ছোট মনুষ্য নিচয়, সকলেরই জীবনী শক্তির পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োজন ও পৃথগ্‌ভূত উদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট আছে। বান্ধবের যদি সেইরূপ একটি স্বনির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র প্রয়োজন না থাকিত, তাহা হইলে বান্ধব এতকালের পর, সম্পাদকের এই বৃদ্ধকালে, আবার এই ভাবে, পাঠকের নিকট উপস্থিত হইতে সাহসী হইত না।" সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় আর কিছু বলেন নাই—অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন, দেখিতে বলিয়াছেন; আমরাও অপেক্ষা করিব।

বান্ধবের প্রয়োজন যাহাই হউক, অনেক দিনের পর আবার তাহাকে পাইয়া আমরা সুখী হইয়াছি। বৃদ্ধ বয়সে শ্রদ্ধাস্পদ কালীপ্রসন্ন বাবু যে আবার এত শ্রম স্বীকার করিয়া সাহিত্য সেবায় আয়োজন করিয়াছেন ইহা কম শ্লাঘার কথা নহে। তখনকার সেই এক সময় গিয়াছে সে সময়ে বান্ধব, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি তখনকার ক্ষমতাশালী কার্য্যনিপুণ সাহিত্যসেবী দিগের সাধারণ কর্ম্মক্ষেত্রস্বরূপ ছিল। সেই কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে চাহিলেই সেই যুগের সাহিত্যসেবা এবং সাহিত্যের উন্নতি বুঝিতে পারা যায়। আবার বান্ধব ও বঙ্গদর্শন আসিয়াছে—এ যুগের কর্ম্মক্ষেত্র হইবে বলিয়াই বুঝি আগমন। ভবিষ্যতে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস লেখক এই উভয় যুগের সাহিত্য চর্চ্চার পরিচয় দিতে হইলে এতদুভয় কালের বান্ধব ও বঙ্গদর্শন হস্তে লইবেন সন্দেহ নাই—তুলনা না করিলে কি সমালোচনা করা হয়। যাহাহউক, এই কথা স্মরণ রাখিয়া বান্ধব ও বঙ্গদর্শনের কর্ত্তব্য পালন করা আবশ্যক।

আমরা তিন সংখ্যার বান্ধব পাইয়াছি—বিস্তৃত সমালোচনা করিবার স্থান নাই। প্রথম সংখ্যা হইতেই "কিশোর গৌরাঙ্গ" চলিতেছে—আরও অনেক দিন চলিবে বলিয়া বোধ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনী যতই

আলোচিত হয় ততই দেশের মঙ্গল। মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত সর্ব্বদাই ...ন। কিন্তু "কিশোর গৌরাঙ্গের" উপক্রমণিকা বড়ই দীর্ঘ হইয়াছে। অনেক স্থানে অনাবশ্যক বলিয়াও মনে হয়। "ছায়া দর্শন" একটি দার্শনিক প্রবন্ধ। গীতার—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

ছায়া দর্শনের মূলসূত্র। 'বিজ্ঞান গায়ত্রী' আমাদিগের ভাল লাগে নাই। ...শ্রীহর্ষ' সুলিখিত প্রবন্ধ। সংক্ষিপ্ত হইলেও একটি নূতন তথ্য 'শ্রীহর্ষে' দেখিলাম। "কেন দেখিলাম" পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। 'স্বামী না ত কি?' পাঠ করিবার সময় চিন্তা করিবার বিষয় আছে। একটা বৃথা গল্প বা রসিকতার কথা ভাবিয়া পাঠ করিলে চলিবে না। 'আর্য্য হিন্দুসমাজের সূচনা' একটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ, তাই সমালোচনা চলে না; কিন্তু ...তটুকু দেখিলাম তাহাতে কিছু নূতন পাইলাম না।

নির্ম্মাল্য।

ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩০৮।

এবার দেখিতেছি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবু আবার স্বয়ং আসরে অবতীর্ণ, পত্র সম্পাদনরূপ গুরুভার আবার গ্রহণ করিয়াছেন। দেখিয়া সুখী হইলাম বটে—কিন্তু মেঘান্তরাল হইতে হঠাৎ বাহির হইবার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিলাম না।

এবার নির্ম্মাল্যের বাহ্যদৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—অন্য বিষয়েও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। "শীতের সঙ্কোচ ভাঙ্গি" সুন্দরী বাসন্তী ধরায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন—চরণস্পর্শে ধরণী হাসিয়া উঠিয়াছে, কাননে কুসুম কলিকা ফুটিয়া উঠিয়াছে—নিদ্রাভঙ্গে বিহগকুল আপনাদিগকে কোন্ এক অভিনব রাজ্যে দেখিয়া একবার ভীতিবিহ্বল হইয়াছিল কিন্তু পরক্ষণেই দেখিল এ নূতন জগৎ বড় সুন্দর। তাই কুসুমভূষণশোভিত নবমুঞ্জরিত তরুরাজির

শাখায় শাখায় বসিয়া 'যুগলে যুগল' গাহিয়া উঠিয়াছে "ফুলগন্ধে দিশেহারা ভ্রমর ভ্রমরী"। আমরাও আনন্দে দিশাহারা হইয়াছি। কিন্তু বাসন্তীর চিত্রখানি নিতান্তই সৌন্দর্য্য বিহীন হইয়াছে।

এবারকার প্রবন্ধগুলি প্রায়ই ভাল হইয়াছে। 'নারীজাতির এক অধ্যায়ের' উপসংহারের সহিত আমাদিগের সহানুভূতি আছে। লেখক ঠিকই ধরিয়াছেন—"স্ত্রী পুরুষের পরস্পর শ্রমবিভাগ ও দায়িত্ব বিভাগের উপর আমাদের সাংসারিক শৃঙ্খলা ও সুখ দুঃখ সম্পূর্ণ নির্ভর করে।" শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু কবি চণ্ডিদাসের একটি প্রাচীন পদ তুলিয়া তাহারই নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোন কোন স্থানে আমাদিগের আপত্তি থাকিলেও ভালই লাগিল। 'চাএর ইতিহাস' ও 'উদ্ভিদ জীবনের দুই একটি কথা' সুলিখিত প্রবন্ধ; এবারকার 'কবিতা গুচ্ছ' বড় ভাল লাগিল না—আমাদিগের অদৃষ্ট। 'নিস্তারিণী' শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

'বিজয়-গীতিকা' একটি সমালোচনা। সমালোচনার উপর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। আমরা 'বিজয় গীতিকা' দেখিনাই কাজেই অধিক বলিবারও কিছু দেখিতেছি না; তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা নিতান্তই আবশ্যক। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কৃপা একজনের উপর বড় দেখা যায় না—কিন্তু 'বিজয় গীতিকার' তাহাই দেখিতেছি। সে দৃশ্য দেখিয়া প্রাণে একটা আশার সঞ্চার হয়—'দীনা বঙ্গভাষার' দুর্দ্দশা ঘুচিবে বলিয়া মনে হয়। আমরাও সমালোচক মহাশয়ের সহিত কহিতেছি—

'গ্রন্থ জন্মিতেছে সত্য,—কিন্তু এমন গ্রন্থকার বঙ্গসাহিত্যজগতে এই প্রথম, বঙ্গসাহিত্যের বড় সুখের দিন, যে বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান ভূস্বামী বঙ্গভাষার দীনকক্ষের প্রতি করুণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন!' 'বঙ্গের অদ্বিতীয় ভূস্বামী বর্দ্ধমানের ষোড়শ নৃপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ মহতাব বাহাদুরের' মত গ্রন্থকার আমরা আর কয়জন পাইয়াছি? 'আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে লুপ্ত কোন একটি মহান্ কার্য্যের ও প্রতিষ্ঠার বুঝি ইহাই সূত্রপাত। ভারতী পত্রিকাতেও আমরা মধ্যে মধ্যে নাটোরের মহারাজা বাহাদুরের বাংলা প্রবন্ধ দেখিতে পাইতেছি। এই

সকল দেখিয়া অনুমান হয় বঙ্গসাহিত্যের বুঝি দিন ফিরিল—কপাল ফিরিল।

'বিজয়গীতিকার' কবি ভয়ে ভয়ে আসরে নামিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সে ভয় করিবার কারন নাই। যাঁহার হৃদয়ে মহত্ব আছে তাঁহার কবিতায় তাহার অভিব্যক্তি অপনিই হইবে। একদিনে কেহ সেক্ষপীয়র হইতে পারিবেনা;— বিজয়গীতিকার যে সকল চিহ্ন আছে তাহা আশাপ্রদ এবং তাহারাই বলিয়া দিতেছে যে কবি একদিন কবিত্বরাজ্যের শ্রেষ্ঠ আসন পাইবেন।

প্রদীপ।

চৈত্র, ১৩০৮।

প্রদীপের যেন আর সে তেজ নাই। প্রদীপ এমন স্নেহশূন্য হইয়াছে কেন কে বলিবে? এবার প্রবন্ধ অপেক্ষা প্রদীপের বাহাদুরী চিত্রে!

"যমুনা পুলিনে কুসুমিত বনে
চম্পক আসন মাঝে —
কিশোর কিশোরী আপনা পাশরি
বসিয়া তাহার মাঝে।"

'কিশোর কিশোরী' ত "আপনা পাশরি"তেই পারে— ভাব ও সময়ের গুণ! পাঠক! আপনিও বুঝি সে মিলনের কবিতাপাঠে ও চিত্র দর্শনে আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। সে যে নিভৃত মিলনের এক অঙ্ক! তখন যে—

"বিম্বাধর'পরি নাগর নাগরী
মুগ্ধ চুম্ব—আলিঙ্গনে।"

এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। আর একটু মাত্রা যদি হঠাৎ চড়িয়া যায় তাহাহইলেই হয়ত কোন্ দিনবা প্রদীপ কার্য্যালয়ের সম্মুখে দণ্ডবিধি আইনের ২৯২ ধারার পরোয়ানা ঝুলিবে। আমাদের তাই বড় ভয় হয়! চিত্রে কাগজ পূর্ণকর, মোটেই প্রবন্ধ বা কবিতা কিছুই দিওনা তাহাতেও আপত্তি নাই—কিন্তু দেখিও যাহার জন্য চিত্র সে যেন তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতে পারে।

"মাধুরীর" দ্বিতীয় অঙ্ক চলিতেছে—পূর্ব্বাপর কেমন লাগিতেছে তাহা না বলিলেও চলে। 'টেলিগ্রাফে ছবিতোলায়' নূতনত্ব আছে; 'হাস্যরসের রচনা' সমালোচনার উপযুক্ত নহে—কারণ এখনও অসমাপ্ত। আধুনিক শিক্ষকগণ ভিরোজিওর মত হইলে বিদ্যালয়ের ও ছাত্রদিগের সমধিক উন্নতি হইত।

আষাঢ়ে গল্প।

'আষাঢ়ে গল্প' শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের রচিত একখানি ক্ষুদ্র গল্পের বহি। ইহা তরলমতি বালক বালিকাদিগের জন্যই রচিত এবং স্নেহের উপহার স্বরূপ তাহাদিগের সোণার করেই অর্পিত হইয়াছে।

উপকথার পুস্তক আজ কাল অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। গল্প ও ছবির খাতিরে ছেলেরাও ঐ সকল পুস্তক আগ্রহ সহকারে পাঠ করে। এই সকল পুস্তকের প্রধানতঃ তিনটি উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয়—(১) পাঠে বালকদিগের আশক্তি জন্মান, (২) নীতিশিক্ষা এবং (৩) বিশুদ্ধ আমোদ প্রদান। আমাদিগের দেশে প্রায়ই প্রথম উদ্দেশ্যটি কিয়ৎ পরিমাণে ও তৃতীয়টি পূর্ণ মাত্রায় সফল হইয়া থাকে কারণ গল্পের অন্তর্নিহিত উপদেশ বা নীতি বালকেরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ছেলেদের পিতা মাতাই সে জন্য দায়ী।

জাতীয় উপকথা সংগ্রহ করা মন্দ নহে—জাতীয় চরিত্রের কোন কোন অংশ তাহাতে চিত্রিত আছে। কিন্তু জাতীয় জীবনের সহিত বালকদিগের পরিচয় করাইতে হইলে ইতিহাসের আশ্রয় লওয়া বিধেয়। ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক ঘটনাগুলি তেমন করিয়া বাছিয়া লইয়া সহজ ও সরল ভাষায় লিখিলে বালক বালিকাদিগের অধিক উপকার হইবে এবং বাল্যকাল হইতেই ইতিহাসের প্রতি একটু স্নেহ জন্মিবে বলিয়া মনে হয়। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের যেরূপ দুর্দ্দশা তাহাতে বালকহৃদয়ে প্রথম হইতে জাতীয় ইতিহাসের বীজ বপন করা উচিত। ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিও উপকথার ন্যায় আমোদজনক।

ভূত বা দানবের গল্প বালকেরা আর বিশ্বাস করিতে চাহে না—সুতরাং তদ্রূপ গল্পের মধ্যে কোন নীতিবাক্য থাকিলেও সেদিকে তাহাদের দৃষ্টি পড়ে না। দৈত্য দানবের গল্পে প্রাণে আর দাগ বসে না। সমালোচ্য পুস্তকে 'আত্মদান' যেমন সুকোমল ক্ষুদ্র পাঠকের অনেক দিন মনে থাকিবে, "আবু করিমের চটি জুতা" ততদিন মনে থাকিবে না। যে সকল গল্পে মানব চরিত্রের সরল ও কোমল ভাবগুলি পরিস্ফুট হয় সেই সকল গল্পই শিশুদিগের সমধিক আদরের হইবে বলিয়া মনে হয়। কারণ তাহাদের কোমল হৃদয়ে রেখাপাত করা বড় সহজ। তবে পুস্তকও পাঠের বৈচিত্র ঘটাইবার জন্য প্রকৃত উপকথা দুই একটা থাকিলেই চলে। ভরসা করি হেমেন্দ্র বাবু ভবিষ্যতে ইহারই চেষ্টা করিবেন।

যাহাদিগের হস্তে "আষাঢ়ে গল্প" অর্পিত হইয়াছে, তাহারা উহা আদরে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি—"ভালুকের লেজ কাটা" গল্পটি পাঠ করিয়া যদিও বালক বালিকারা হাসিবে কিন্তু গল্পটি তাহাদের পিতারা পাঠ করিলেই ভাল হয়! উহাতে একটু ভাবিবার কথা আছে।

হিন্দুজাতির কামান ব্যবহার।

(৪)

কেহ কেহ তর্ক তুলিতে পারেন যে, রাজপুত জাতি শারীরিক শক্তির বলে সংগ্রাম করাকেই পুরুষত্ব সূচক বলিয়া মনে করিতেন; আগ্নেয়াস্ত্র সাহায্যে দূর হইতে শত্রু নিপাত করা, তাঁহাদের মতে ভীরুতার নামান্তর

ছিল; তাই সমস্ত কৌশল অবগত থাকা সত্ত্বেও, তাঁহারা পরবর্ত্তী কালে, কামান ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু এ আপত্তি ঐতিহাসিক প্রমাণের বিরোধী। পৃথ্বীরাজের সময়ে, গিহেলোট, চোহান ও রাঠোরগণই দ্বাদশ শতাব্দীতে কামান প্রয়োগ দ্বারা অরি নির্ম্মূল করিয়াছিলেন; কবির বীর গাথার সেই উক্তি বিশ্বাস করিলে, আর কিরূপে মানিয়া লওয়া যায় যে, পরবর্ত্তী কালে, রাজপুতগণ, কামান ব্যবহারকে কাপুরুষতাব্যঞ্জক বলিয়া, ঘৃণা করিতেন? সমরস্থলে বিজয় লক্ষ্মীকে আয়ত্ত করা, তাঁহাদেরও ত মূল লক্ষ্য ছিল। সুতরাং যে অস্ত্রের বলে, অতি সহজে শত্রু পক্ষকে বিতাড়িত করা যাইতে পারে, পরন্তু পূর্ব্বপুরুষগণও যাহার ব্যবহারে ইতস্ততঃ করেন নাই; এরূপ একটি উৎকৃষ্ট যুদ্ধাস্ত্র পরিত্যাগ করতঃ, তাঁহারা বুদ্ধি হীনতার পরিচয় দিবেন কেন? বরং এই অব্যবহার দ্বারাই বুঝা উচিত যে তৎকালে কামান প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী, তাঁহাদের জ্ঞান সীমার সম্যক বহির্ভূত ছিল।

যে সমস্ত বৈদেশিক পুরাবিদ্, সুলতান বাবরের ভারতাক্রমনের পূর্ব্বে হিন্দুগণ, কামানের সমাচার জ্ঞাত ছিলেন না, এরূপ মতাবলম্বী, তাঁহাদের বিরুদ্ধে সম্মাননীয়া শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী ঘোষাল মহাশয়া কিন্তু অন্যায় দোষারোপ করিয়াছেন; অতএব উপসংহার কালে প্রসঙ্গতঃ তৎসম্বন্ধেও কিছু আলোচনা প্রয়োজন মনে করি। তাঁহার বিবেচনায় ইউরোপীয় বর্ত্তমানসভ্যতম জাতির বহুঅগ্রে হিন্দুগণের কামান আবিষ্কারের কথা স্বীকার করিলে সভ্যতাভিমানী জাতিদের সম্ভ্রমনাশের আশঙ্কা আছে জন্যই নাকি উক্ত প্রত্নতত্ত্বগণ কামানাবিষ্ক্রিয়ার হিন্দুজাতির অগ্রবর্ত্তিত্ব মানেন না; নতুবা তাঁহাদের অনুকূলে নাকি দৃঢ়তর কিছু প্রমাণ নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—১৩১২ খৃষ্টাব্দে, মূরেরা সর্ব্বপ্রথম স্পেনে কামান পরিচালন করিয়াছিলেন, ইহা যৌক্তিক রূপে কোন্ অনভিমানী জাতি মীমাংসা করিয়াছেন? মূরদিগকে যাঁহারা কামান প্রস্তুতের শিক্ষাগুরু স্বীকার করিয়া লইতে, অপমান বোধ করেন নাই;—যুক্তি ও প্রমাণমূলক হেতু বিদ্যমানে তদপেক্ষা বহুলাংশে সুশিক্ষিত ও সুসভ্য হিন্দুদিগকে, কামান প্রস্তুতের আচার্য্যজ্ঞান

করিতে তাঁহারা অসম্মত; ইহা অতি হাস্যজনক মীমাংসা বটে।*

শ্রীরজনীমোহন ঠাকুর।

—•—

* বাল্মীকিয় রামায়ণের বালকাণ্ডের পঞ্চমসর্গে অযোধ্যাবর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত আছে ঃ—

"সূতমাগধসম্বাধাং শ্রীমতী মতুলপ্রভাং।
উচ্চাট্টালধ্বজবতীং শতঘ্নীশতসঙ্কুলাম্॥"

এই শ্লোকোক্ত 'শতঘ্নী' যে আগ্নেয়াস্ত্র' তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্য বাণাদি শাস্ত্র শতঘ্নী নামে কথিত হইতে পারে না। প্রাচীন টীকাকারগণ ইহাকে 'প্রাকার সংরক্ষণার্থং আয়োভার নির্ম্মিতাঃ প্রাকারোপরি স্থাপিতা আয়ুধবিশেষা' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। দুর্গপ্রাকার রক্ষার্থে দুর্গোপরি স্থাপিত লৌহনির্ম্মিত শতঘ্নী নামক আয়ুধ বিশেষ যে আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। রামায়ণের ন্যায় অন্যান্য গ্রন্থেও হিন্দুদিগের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়;—স্বর্গীয় ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয় তৎসম্বন্ধে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। আগ্নেয়াস্ত্র ইউরোপের আবিষ্ক্রিয়া নহে;—উহা এসিয়ার প্রবীন চীন জাতির উদ্ভাবনী শক্তি প্রসূত। খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দী হইতে চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং নিতান্ত পক্ষে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যে হিন্দুগণ আগ্নেয়াস্ত্রের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সেকালে কোন দেশেই আগ্নেয়াস্ত্রের অত্যধিক প্রচলন ছিল না। মোসলমান শক্তি সমুত্থিত হইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবার সময়ে বারশত বৎসর পূর্ব্বে আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইবার সূত্রপাত হয়। তৎকালে মধ্যএসিয়া ভারতবর্ষের মন্ত্রশিষ্য হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুশীলনে নিযুক্ত ছিল। মধ্যএসিয়ার বৌদ্ধগণই মোসলমান হইয়া কালে ভারতবিজয়ী মোগল পাঠান নাম ধারণ করিয়াছিল। পাঠান যখন ভারতবিজয়ে অগ্রসর, তখন হিন্দু মোসলমানের সংগ্রামে উভয়পক্ষেই আগ্নেয়াস্ত্র 'নারীগোরী জম্বুর' ব্যবহৃত হওয়ার কথা 'চাঁদকবির পৃথ্বীরাজ রাসৌ' নামক সুবিখ্যাত গাথা গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। অক্ষয় বাবু তাহার কথাই লিখিয়াছেন। তৎপূর্ব্বেও যে হিন্দুগণ আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না, স্বর্গীয় ডাক্তার রামদাস সেনের প্রবন্ধে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত আছে। এই প্রবন্ধ লেখক বাঙ্গালার বিখ্যাত লেখক লেখিকার সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে স্বয়ং এই সকল বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করিলে, বোধ হয় প্রতিবাদ প্রবন্ধ লিখিবার প্রয়োজন বোধ করিতেন না।—— সম্পাদক।

পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সাহা প্রবর্ত্তিত।

উৎসাহ।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯,)

সম্পাদক

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

উৎসাহপ্রেশ, রাজসাহী।

শ্রীমহিরুদ্দীন সরকার পৃণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

সূচীপত্র।

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
অভিমান	শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী	১৮৫
আমার ডায়েরি	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ	১৮৮
ব্যাকুল হৃদয়	শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৭
দুরাশা	শ্রীমতী সরলাবালা সরকার	২০০
জ্যোতিষে বিবর্ত্তনবাদ	শ্রীশশধর রায় এম্, এ, বি, এল্	২০৩
এদিক আর ওদিক	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	২০৫
সংক্ষিপ্ত সাহিত্য সমালোচনা	সম্পাদক	২১০
গঞ্জনা	শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী	২১৪

—০::§)*(§::০—

উৎসাহপ্রেশ।

এই প্রেশে চিঠি, কার্ড, চেক দাখিলা প্রীতি-উপহার প্রভৃতি অতি সুন্দর-রূপে অল্প সময়ে সুলভ মূল্যে মুদ্রিত হয় পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আমাদের নিবেদন।

"উৎসাহ" ৭ম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। কম্পোজিটার প্রভৃতি পীড়িত হওয়ায় উৎসাহ প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইতেছে সে জন্য গ্রাহকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ইহার পর হইতে গ্রাহকদিগকে আমরা রীতিমত ভাবে "উৎসাহ" দিতে সক্ষম হইব এমত আশা করি। আজও যাঁহারা "উৎসাহে"র মূল্য প্রদান করেন নাই, তাঁহাদের নামে উৎসাহ ক্রমে ভিঃ পিঃ করিয়া প্রেরিত হইতেছে। আমাদের বিনীত প্রার্থনা, তাঁহারা যেন ভিঃ পিঃ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন। যে সকল মহাত্মাগণ রীতিমত কাগজ লইয়াও অসঙ্কোচে ভিঃ পিঃটী ফেরত দিয়া থাকেন, তাঁহারা দয়া করিয়া পূর্ব্বেই পত্র দ্বারা ভিঃ পিঃ পাঠাইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইবেন। অযথা ডাকমাশুল বহন করিয়া যেন আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয়।

পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সাহা প্রবর্ত্তিত।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত।

উৎসাহ।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

৫ম বর্ষ। { রাজসাহী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯। } ৭ম সংখ্যা।

অনুতাপ।

কেন মিছে?—দূর হৌক্ শূন্য অভিমান।
চাহিছে লভিতে স্বাস্থ্য এজীর্ণ পরাণ!
আকাশ-কুসুম প্রায় অশেষ বাসনা,
তৃপ্তিহীন, শান্তিহীন, আত্মপ্রতারণা,
অবিশ্বাস, সন্দেহের গর্ব্বিত সঞ্চয়
তিলে তিলে ছাইয়াছে এ দীন হৃদয়।
আমি আজ তবু মিছে দৃপ্ত দম্ভভরে
মুঠি মুঠি ধূলি ফেলি শোকচক্ষু'পরে।
সবারে ছলিয়া আমি রিক্ত আপনাতে,
মলিনতা বহিতেছি সদা মোর মাথে।
এ পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত তরে
আজি মোর তপ্ত চিত্ত চাহে সকাতরে।
হে মোর জীবননাথ, দেবতা মহান,
আমার সুযোগ্য শাস্তি করহ বিধান!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

"আমার ডায়েরি।"*

১০ই ডিসেম্বর।

বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে আমি আসান্‌সোল গিয়াছিলাম। আসান্‌সোল হইতে ফিরিয়া আসিয়াই উড্ সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। তিনি এখন আমাদের ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেণ্টের হেড। আমাকে দেখিয়াই সাহেব একখানি পুলিশ রিপোর্ট আমার হাতে দিলেন। তারপর বলিলেন "বাবু তোমাকে এখনই একবার ৬৫ নং সিমলাষ্ট্রীটে যাইতে হইবে।" সাহেবের সহিত আমার আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। তারপর আমি তাঁহাকে একটি নাতিদীর্ঘ সেলাম করিয়া একখানি তৃতীয় শ্রেণীর ছক্কড়ে চাপিয়া কাঁশারিপাড়া যাত্রা করিলাম। কাল ট্রেনে সমস্ত রাত্রি বাসরজাগরণ হইয়াছে, তাহার উপর কয়েকদিন ধরিয়া পরিশ্রমও বড় কম হয় নাই। তাই তখন আমার শরীর যেন বড়ই অবসন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। কিন্তু কি করি, পয়সার খাতির ও বড় সাহেবের জোর হুকুম—সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য, কর্ত্তব্যজ্ঞানটাও আমার বেশ ভাল রকমই ছিল। তাই "পড়িকি মরি" করিয়াও রামচন্দ্র বাবুর বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তায় যাহা বুঝিতে পারিলাম তাহা এই :—'রাম বাবুর বাড়ী ঢাকা জেলার লৌহজঙ্গ গ্রামে। হাটখোলায় তাঁহার ছোটখাট রকমের একটি আড়ত আছে। বৃদ্ধা মাতার অনুরোধে ও লৌহজঙ্গের জমিদার শরৎচন্দ্র মজুমদারের অত্যাচারে এই ৪।৫ মাস হইল তাঁহার অবিবাহিতা ছোট ভগ্নী সরলা ও বিধবা মাতাকে লইয়া তিনি কাঁশারি পাড়ায় বাস করিতেছেন। রাম বাবু বিপত্নীক। তাঁহার বাসার খুব নিকটেই আর একখানি খালি বাড়ী ছিল। প্রায় দুইমাস হইল বরিসালের

* কর্ত্তব্যানুরোধে নায়ক নায়িকাদিগের প্রকৃত নামধাম ইত্যাদি গোপন করিতে বাধ্য হইলাম।

ডেপুটী অবিনাশ চন্দ্র ঘটক তাঁহার কন্যা সরোজ ও শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে লইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসেন এবং উক্ত খালি বাড়ীটি ভাড়া করেন। অবিনাশ বাবুরও বাড়ী ঢাকা জেলায়। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার সহিত রাম বাবুর বেশ সৌহার্দ্দ্য জন্মে। এমন কি মেয়েরাও পরস্পর এবাড়ী হইতে ওবাড়ী যাতায়াত করিত। সরলার সহিত ডেপুটী-কন্যা সরোজের সদ্ভাব ছিল। উভয়েই দেখিতে বেশ সুন্দরী। সরোজের বয়স ১৮।১৯, সরলা তখন ১১ বছরের। সে অধিকাংশ সময়েই সরোজের কাছে থাকিত। একদিন প্রাতঃকালে অবিনাশ বাবু বলিলেন 'রামবাবু, আজ আমি একবার শিবপুর যাব। ফিরিয়া আসিতে বোধ হয় দুই একদিন বিলম্ব হইবে। আপনি মধ্যে মধ্যে আমার বাসার খোঁজ খবর লইবেন।' সেদিন আবার সন্ধ্যার সময় গঙ্গাস্নানের যোগ। সরোজ সরলা ও সরোজের মাতা এক খানি গাড়ী লইয়া গঙ্গাস্নানে গেল—বৃদ্ধা প্রায় প্রতিদিনই যাইত। ক্রমশঃ রাত্রি হইতে লাগিল অথচ কেহই আর ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া রামবাবু বড় উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। অবশেষে রাত্রি ১টার সময় পুলিষে সংবাদ দেওয়া হইল। কিন্তু সরলা বা সরোজ কাহারও কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। পরদিন প্রত্যূষে অবিনাশ বাবু শিবপুর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া শুনিয়াই অবাক্। তিনিও অনেক অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কোন ফল হইল না। আজ দুইদিন হইল অবিনাশ বাবুকেও আর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

রামবাবু কাঁদিয়া আকুল হইলেন আর তাঁহার মাতার ত কথাই নাই। আমি তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া, একটি কুটিল কুহেলিকাপূর্ণ চিন্তার বোঝা মাথায় তুলিয়া তখনকার মত বিদায় হইলাম। আমি যখন সিমলাষ্ট্রীটের উপর তখন দেখি যে ডাকহরকরা চিঠি লইয়া অবিনাশ বাবুর বাড়ীর দ্বারে ডাকাডাকি করিতেছে। কৌতূহল বশতঃ আমি তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম এবং অবিনাশ বাবুর পত্রখানি নিজেই গ্রহণ করিলাম। এরূপ করিবার একটু কারণও ছিল—পত্রখানা লোকাল্ (Local)। ক্ষিপ্রহস্তে লেফাপা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। ও হরি একি! পত্র যে কোন্ ভাষায় লিখিত তাহা আমি বুঝিয়াই উঠিতে পারিলাম না। পত্রে লেখা ছিল :—

"চচী,

এ' ভৃয়েড় দিত নোটাঝ দেক্ষা নাইনেবিতা ড়েত ? মুটি লীত্র আমিও। মঝজাড়ে ঝাক্ষা দাম্র গাইমাবে। যে ড়াঁদিয়া ড়াঁদিয়া অষ্গিঝা চঝন ডাড়ু ভক নাকানাকি ড়ঝিনেবে। মাড়া একত দিনে শায়তা। ইতি।

তোমারি—
২ গাছি সোণা। "

আমি তৎক্ষণাৎ রামবাবুকে পত্রখানা দেখাইলাম। তিনিও কিছু বুঝিতে পারিলেন না। ক্রমশঃ বেলা হইতেছিল দেখিয়া তাঁহাকে কয়েকটি বিষয় গুপ্ত উপদেশ দিয়া আমি বাসায় ফিরিলাম। কিন্তু এই অদ্ভুত রহস্য আমাকে একেবারে ক্ষিপ্ত প্রায় করিয়াছিল।

সেদিন বিকাল বেলা কোন কার্য্যবশতঃ আমি সোনাগাছি যাইতেছিলাম হঠাৎ রাম বাবুর সহিত গ্রেষ্ট্রীটে দেখা হইল। আমরা উভয়েই সোনাগাছি যাত্রা করিলাম। ভৃত্য আবদুলও সঙ্গে ছিল। আমরা যখন সোনাগাছির মোড়ের উপর তখন সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। ঠিক এমনি সময়ে একখানি ক্রহাম গাড়ী আমাদের পাশ দিয়া সোনাগাছিতে প্রবেশ করিল। যিনি গাড়ী হাঁকাইতেছিলেন তিনিও একজন ভদ্রলোক। হঠাৎ রামবাবু বলিয়া উঠিলেন 'ওই যে গাড়ীর ভিতর ডেপুটী বাবু'। আমি ব্যাকুল আগ্রহে চাহিলাম। কিন্তু সেই জীর্ণ গাড়ীর ভিতরে দেখিলাম—শশী বাঁড়ুয্যে। শশীও আমাকে দেখিল—আমিও তাহাকে দেখিলাম। শশী একজন পাকা বদমায়েস; কাজেই তাহার সঙ্গে আমার পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। আমার ইঙ্গিত অনুসারে আবদুল গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আমরা আবার পশ্চাৎ ফিরিয়া অন্য পথে কিছুদূর অগ্রসর হইলাম। রামবাবুকে বিশেষ করিয়া প্রশ্ন করিলাম। তখন তিনি একটু সন্দেহ রাখিয়া বলিলেন 'আমার যেন বোধ হয় অবিনাশ বাবুকেই দেখিলাম। তা এখন ঠিক বলিতে পারিতেছি না'। এমন সময় আবদুল আসিয়া সংবাদ দিল যে 'গাড়ী ২নং বাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া আছে'। কালবিলম্ব না করিয়া তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারিলাম না।

সদর দরজা বন্ধ ছিল। কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না এমন সময় উপরের সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। আমি আর কোন উপায় না পাইয়া নির্ভিক চিত্তে গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে বসিবার আসনটি (Seat) কিছু বেশী উঁচু ছিল। আমি তাড়াতাড়ি তাহার উপরের ডালাটী তুলিয়া সেই বাক্সটীর ভিতর বসিয়া পড়িলাম। আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিলেই হয়ত আমি ধরা পড়িতাম। গাড়ীতে ২ জন লোক উঠিল। তাহারা নিঃসন্দেহে আমার ঘাড়ের উপরেই আসিয়া বসিল। গাড়ী আবার চলিতে লাগিল। একটু পরেই বাতাসের অভাবে আমার কিছু কষ্ট হইতেছিল। আমার সঙ্গে একখানি ১০ ফলা American knife ছিল। তাহারই একখানি দিয়া আমি ধীরে ধীরে গাড়ীতে দুইটি ছিদ্র করিয়া ফেলিলাম। গাড়ী সমান চলিতেছিল। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া আরোহীদ্বয় কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিল—

"নবিন, আজ যখন আমি আসি তখন প্রভাতকে সোনাগাছির মোড়ের উপর দেখিলাম। তার সঙ্গে রামবাবুও ছিল।"

কিছু বিস্মিত হইয়া নবীন কহিল, "সে কি! ওই প্রভাত শালাকে সরাইতে না পারিলে আর আমাদের কুতুল নাই। সে যেন ছায়ার মত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে।"

প্রথম বক্তা একটু স্পর্দ্ধা সহকারে বলিল, "এবার আর শশী বাঁড়ুয্যের সঙ্গে চালাকি কত্তে হ'বে না। শালাকে বাগে পেলেই হয়। সে কথা যাক্। ভাই মেয়েটিকেত হাত করা গেল, কিন্তু আগে টাকা না পেলে শরৎ বাবুকে দেওয়া হবে না।"

নবীন। "তাত নিশ্চয়ই নয়। মেয়েটি ভাই বেশ সুন্দরী। আমারি ইচ্ছে হচ্ছে বিয়ে করে ফেলি। তা শরৎ বাবুরও ঝোঁক হতেই পারে। ওঃ হোঃ আমি যে একখানা কাগজ ফেলে এসেছি!"

শশী। "কি কাগজ—সে হ্যাণ্ডনোটখানা ফেলনি ত?"

নবীন। না, সেখানা নয়—তোমাদের সেই নূতন ভাষা! চিঠির কলটা আমার হাতে একখানা কাগজে লেখা ছিল। রহিমকে পাটনা থেকে আস্‌বার জন্যে আজ চিঠি লিখ্‌তে হবে।"

শশী। "যাক্ তাতে আর বেশী কিছু হয়নি। আমার মনেই আছে। একখানা কাগজে আগে ক খ থেকে ড় পর্য্যন্ত লিখে নিও। তারপর আবার ড় র নিচে থেকে, ডানদিক থেকে আরম্ভ করে, উপর মুখে বরাবর ক খ লিখো—তাহলেই হলো। ভাই সরোজের কি বুদ্ধি! সাহসও তেমনি। আচ্ছা, এই কথাটা নিয়েকি বাইরে খুব গোলমাল চল্‌ছে?"

নবীন। "আমার বোধ হয় তেমন কিছু হয়নি। গদাত একজন ডিটেক্টিভ; তাহলে সে সব জান্‌তেই পাত্তো।" তারপর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া গেল না। অনেকদূর যাইয়া গাড়ী থামিল। শশী বলিল, "চল এই বাড়ীখানা দেখে যাওয়া যাক। যদি সুবিধা হয় তবে এখানেই—" শশী ও নবীন গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া নেবুতলার ৬২ নং বাড়ীতে প্রবেশ করিল। আমি আর সেখানে বিলম্ব না করিয়া বাসায় ফিরিলাম। তারপর অনেক পরিশ্রমে সেই অভিনব পত্রের রহস্যময় আবরণ উন্মোচিত হইল। পত্রখানা এই :—

"শশী,

এ কয়েকদিন তোমার দেখা পাইতেছি না কেন? তুমি শীঘ্র আসিও। সরলাকে রাখা দায় হইয়াছে। সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অস্থির। শরৎ বাবু বড় তাড়াতাড়ি করিতেছে। টাকা এখন দিতে চায় না। ইতি।

তোমারি—

২নং সোনাগাছি।"

যে অন্ধকারাবরণ এতক্ষণ আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল তাহা একটু সরিয়া যাইতেছে দেখিয়া আমি কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলাম।

১১ই ডিসেম্বর।

৬২ নম্বরের বাড়ীর নিকটেই একটি ছোট রকমের ঘর ভাড়া করিয়া আমি একখানি মদের দোকান খুলিলাম। আবদুল দোকানী হইল। আবশ্যকমত উপদেশ দিয়া ঠিক দুই প্রহরের সময় আমি তাহাকে নেবুতলা পাঠাইলাম।

আমি আজ যত আগ্রহের সহিত রাত্রির অপেক্ষা করিতেছিলাম কোন

প্রেমিক প্রেমিকাও বোধ হয় তেমন করে না। আমার বুকের ভিতর উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসের একটি উদ্দাম চঞ্চল তরঙ্গ ছুটিয়া ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা আসিল। সন্ধ্যার পর রাত্রি। যখন অগণিত সৌধমালা পরিশোভিত কলিকাতার কোলাহল চঞ্চল বুকের উপর দিয়া সাড়ে নয়টার তোপ গর্জ্জিয়া উঠিল তখন আমি বাড়ীর বাহির হইলাম। আমি সাঁতার জানিতাম না তাই সদা সর্ব্বদা আমার সঙ্গে একটি Swimming belt থাকিত। ইহা ছাড়া আমি আজ দুইটি রিভল্‌ভার এবং একখানি ছোরা সঙ্গে লইলাম। এখন আমি একজন ফিট বাবু। আমার পরণে গঞ্জির ড্রয়ারের উপর ফিন্‌ফিনে ঢাকাই ধুতি, পায়ে কাল মোজা আর তাহার উপর চক্‌চকে বার্নিশ করা বিলাতী জুতা। গায়ে ভেনিসিয়ন্ কোটের উপর Ash colourএর একটি Invernise coat আর পকেটে দেল্‌খোসে ভিজান রেশমের রুমাল। আমার সর্ব্বাঙ্গ শরীর দিয়া তখন ভর ভর করিয়া গন্ধ উড়িতেছিল। হাতির দাঁতের একগাছি ছড়ি হাতে করিয়া—একটি সাত্ত্বিক চুরুট মুখে আমি 'ঘরের বাহির' হইলাম। পথের মাঝে এক বোতল 'গ্রিনসিল্' কিনিয়া লইয়া আমি ধীরে ধীরে সরোজের বাটীর সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে দশটা। সদর দরজা পূর্ব্বের মত বন্ধ ছিল—আমি নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অনেকক্ষণ কান পাতিয়া শুনিলাম, কিন্তু কাহারও কোন কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলাম না। তাই সাহস করিয়া কড়া নাড়িলাম। বামা কণ্ঠে ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, "কে গা—?"

আমি আমার প্রকৃত স্বর লুকাইয়া বলিলাম—'শরৎ বাবুর লোক'। দরজা খুলিয়া গেল। আমি আবুহোসেনী মেজাজে সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিলাম। সরোজ আমাকে আদর যত্ন করিয়া বসিতে বলিল। আমিও তখন তাহাই চাই। বেশীক্ষণ বিলম্ব না করিয়া নিতান্ত পরিচিতের মত আমি কহিলাম, 'শশী বাবু আসেন্ নি? তাঁর যে এখনই আস্‌বার কথা ছিল?'

সরোজ। "না, সে আজ সন্ধ্যের সময় নেবুতলা গেছে আর ফেরে নি।"

আমি তখন ধীরে ধীরে আমার Long coatটী খুলিয়া রাখিয়া একেবারে খাটের উপর তাকিয়া ঠেশ দিয়া বসিলাম। যেন আমার বাড়ী আর সরোজের বাড়ী ভিন্ন নহে। আমি প্রথমে সরোজের বুদ্ধির খুব প্রশংসা করিলাম

তারপর রূপের প্রশংসা! রমণীদিগকে সন্তুষ্ট করিবার রূপের প্রশংসা একটি প্রধান অস্ত্র। আমাদের কথাবার্ত্তাটা বেশ জমিয়া আসিয়াছিল, এমন সময় নিচে কে যেন সজোরে কড়া নাড়িতে লাগিল। আমি একটু চমকাইয়া উঠিলাম। সরোজ নিচে নামিয়া গেল। আমিও সেদিন তেমন করিয়া আমার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসি নাই—বিবেচনার আর সময় ছিল না। এমন সময় সরোজ অতিশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমার কাছে আসিয়া বলিল, "আপনি একটু উঠুন, আমার 'বাবু' এসেছে। আপনাকে দেখ্‌তে পেলে আমার মাথা আর রাখ্‌বে না। ওই ও ঘরে সে গিয়েছে।"

আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিলাম। সরোজ আমাকে পার্শ্বের ঘরে ঠেলিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আমি দাঁড়াইবা মাত্রই সেই ঘরের কাঠের মেজে একটু কাঁপিল, একবার একটু দুলিল—পরক্ষণেই কি জানি কোথায়, আমি কোন্ অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। সে আঘাত বড় গুরুতর লাগিল—আমি জ্ঞান শূন্য হইলাম।

* * *

আমার যখন পুনরায় চৈতন্য হইল তখন আমি গাড়ীতে। কোথায় যাইতেছি, কেন যাইতেছি—তাহা জানি না। গাড়ীর ভিতর সূচিভেদ্য অন্ধকার। আমি যেমন ভাবে ছিলাম তেমনি রহিলাম। আমি তখন সকল অবস্থা বেশ বুঝিলাম এবং আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল। নীরব—নীরব! ভূগর্ভস্থ নীরবতার ন্যায় সমস্ত নীরব! কেবল অশ্বখুর শব্দ এবং প্রস্তরময় রাজপথে চাকার ঘর্ঘর শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল না। সেই ভীষণ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া একজন কহিল,

"শালাকে এবার জন্মের শোধ বিদায় কর। নলে যেমন মেরেছে এবার আর উঠ্‌তে হবে না। গঙ্গা আর কতদূরে?"

গাড়ীর দরজা খুলিয়া আর একজন বলিল 'আর বেশী দূর নয়—ওই ত দেখা যাইতেছে। ওস্‌মান নৌকায় আছে না?'

১ম। "হাঁ, ওস্‌মানই আছে। এই ছালার ভিতর পুরিয়া ভাসাইয়া দিতে হইবে।"

আমার মস্তকে তখন ভয়ানক বেদনা। শরীরও খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। আমি নীরবে আমার মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, ইচ্ছা করিয়াই তখন সাহায্যের জন্য চিৎকার করিলাম না। গাড়ী থামিল। উহারা উভয়ে ধরিয়া আমাকে একটি গনিব্যাগের মধ্যে পুরিল। ব্যাগ ছোট ছিল তাই আমার কোমরের অধিক তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল না। ব্যাগটি উত্তমরূপে দড়ি দিয়া জড়াইয়া, ক্লোরোফর্ম্ম নিষিক্ত একখানি তুলার প্যাড আমার নাকের উপর বাঁধিয়া দিয়া, উহারা আমাকে নৌকার উপর তুলিল। আমি নিশ্বাস লওয়া একরূপ বন্ধ করিলাম। কিন্তু মাথা বড়ই ঘুরিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের জন্য বুঝি আমার জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই আমি গঙ্গার বীচিভঙ্গবহুল তুহিন শীতল অতলজলে ডুবিয়া গেলাম।

একটু দূরে গিয়াই আমি ভাসিয়া উঠিলাম। তাইত আমার কোমরে যে Swimming belt বাঁধাছিল। আমি তবে মরিলাম না। কিন্তু হত্যাকারীদিগকে আপাততঃ পলায়নের সুযোগ দেওয়া আবশ্যক বলিয়া আমি আর চিৎকারও করিলাম না। স্রোতের মুখে ভাসিতে ভাসিতে অনেকদূর চলিয়া গেলাম। একখানি জলপুলিসের নৌকা সেই সময় আসিতেছিল। কি একটা ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহারা আমাকে তুলিয়া লইল। তুলিবার পর সকলে দেখিল আমি তাহাদের "প্রভাত গোয়েন্দা"।

১২ই ডিসেম্বর।

আজ সকল সংবাদপত্রে আমার মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হইল। সকলে জানিল প্রভাত গোয়েন্দাকে কে খুন করিয়া ছালায় পুরিয়া ভাসাইয়া দিয়াছে! আমি আজ শয্যাগত। আমার সর্ব্বাঙ্গ শরীরে অসহনীয় বেদনা। আবদুল আসিল না দেখিয়া আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি! হায়, আমার সকল পরিশ্রম বুঝি বৃথা যায়!

২১শে ডিসেম্বর।

এ কয়েকদিন আমি বড় জ্বরে ভুগিতেছিলাম। আজ আবদুল আসিয়াছিল। নূতন কোন ঘটনা ঘটে নাই। বোধ হয় ৬২ নম্বরে সরলা! কাল

আমি যাইতে পারিব।

২২শে ডিসেম্বর।

আজ অতি প্রত্যুষেই আমি একজন খাঁটি মুসলমান। আমার মস্তকে মোগলাই টুপী তাহার উপর পাগড়ী—নয়নে অঞ্জন—পরিধানে পাইজামা—অঙ্গে আচকান আর আংরাখা। চরণে 'রাওলপিণ্ডিকা নাগরা'। একটি দীর্ঘরঞ্জিত গুম্ফ আমার মুখে আজ বেশ মানাইয়াছিল। স্বয়ং পিতৃদেব সম্মুখে আসিলেও আমাকে প্রভাত বলিয়া আজ চিনিতে পারিতেন না।

আবদুল আমার উপযুক্ত ভৃত্য। তাহাকে যেমন যেমন করিতে বলিয়াছিলাম সে ঠিক তেমনি করিয়াছে। তাহার মুখেই শুনিলাম যে সেই ৬২ নম্বরের বাড়ির সম্মুখে দিবা রাত্রি গাড়ী আসিয়া লাগিতেছে আর যাইতেছে। বাড়ির সদর দরজা কখনও খোলা থাকেনা। আর আমার দোকানে মদ ও "চাটের" কাটতিও খুব। আমারই কথা মত আবদুল "নূতন বাড়ীর বাবুদিগকে" পয়সা না লইয়াই বরাবর ধারে জিনিষ দিতেছে।

শুনিলাম আজ রাত্রিতে পার্টি (party) হইবে তাই এক ডজন 'স্যাম্পেন' আর দুই ডবল 'হুইস্কির' করমাস্ আছে। সেই সঙ্গে মুসলমানী খানাও চাই। আবদুল 'খানা' সপ্লাই করিতেও রাজি হইয়াছে।

রাত্রি ১০ টার সময় আমরা মদ ও খানা লইয়া দোকান পাট বন্ধ করিয়া সরোজের বাটিতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমি এখন খান্‌সামা। স্বহস্তে মদ ঢালিতেছি — মুরগি পরিবেশন করিতেছি * * * সরোজ হারমোনিয়মে গান ধরিল—"সেঁইয়া কোন্ লিয়া মেরি জান্———"। তাহার গলায় যেন সাতটি সুর নাচিয়া নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল। এমন গান আমি আর কখনও শুনি নাই। গান গাহিতে গাহিতে সরোজ হঠাৎ থামিল — থামিয়া শরৎ বাবুর দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিল "বাবু, আপনিত কাল সরলাকে বিবাহ ক'রে সুখী হইবেন — কিন্তু আমার বকশিস্।"

শরৎ। সেজন্য তোমার ভাবনা কি? আজ টাকা বেশী সঙ্গে নাই—কাল তোমাকে খুসি করিব। তুমি যাও। কাল নেবুতলায় রাত্রিতে তোমার নিমন্ত্রণ। সিরে দেখ্‌তে যেও। সরোজ একটু মৃদু হাসিল।

আমি আবার মদ ঢালিতে লাগিলাম—আবার নাচ গান আরম্ভ হইল। সেই অগ্নিময়ী মদিরা স্ফটিক পাত্রে সোনার জলের মত জ্বলিতে লাগিল। ধীরে ধীরে সকলেই মাতাল হইয়া পড়িতে লাগিল। শশী ও নবীন খাটের উপর হইতে ঢলিয়া পড়িয়া গেল। আমি মনে মনে হাসিলাম। শরৎ বাবু ঘড়ি খুলিয়া বলিল, "কৈ ওসমান ত এখনও এলোনা। রাম বাবু জানবাজারের বাড়ীতে গেলেইত সে এসে খবর দেবে না?"

একজন বলিল, "না, তারা বরাবর, ভাগলপুর চলে যাবে। খান্‌সামা—"

'হুজুর'—আমি প্রস্তুতই ছিলাম, আর এক গ্ল্যাস ঢালিয়া দিলাম। আমার 'হুজুর' তখন ঢলিতেছিলেন। রামবাবুর জন্য যে ইহারা নিষ্কণ্টক হইতে পারিতেছে না ইহা আমি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম তাই ক্রমশঃ আমি বড় ব্যস্ত হইতে লাগিলাম। শরৎ বাবু আমার হুজুরের গায়ে সজোরে একটি ধাক্কা দিয়া বলিলেন "you rascal, ক'চ্ছ কি? বাড়ীটার নম্বরও ঠিক বলে দিয়েছ?"

হুজুর। "হ্যাঁ বাবা ঠিক দিইচি—১২০ নম্বর। এতক্ষণ তোমার রাম বুঝি রাবণের সঙ্গ ধল্লো। খান্‌সামা—"

আমি আবার প্রস্তুত, "হুজুর—"

আর এক গ্ল্যাস! "হুজুর" শয্যাশায়ী হইলেন। আমি নিমেষ মধ্যে আবদুলকে সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া জানবাজারে ছুটিলাম। রাত্রি তখন সাড়ে এগারটা।

অদৃষ্টক্রমে পথে একখানি গাড়ী পাইয়াছিলাম। তাই জানবাজারে পৌঁছিতে আমার বেশী বিলম্ব হইল না। বাড়ীটী জানাই ছিল। একটু ঘুরে গাড়ী হইতে নামিয়া আমি দ্রুতপদে যাইতেছি—এমন সময় সম্মুখে দেখিলাম রামবাবু! আমাকে দেখিয়া তিনি প্রথমে চিনিতে পারেন নাই। আমি তাঁহার কানে কানে কহিলাম "আমি প্রভাত"। রামবাবু নির্ব্বাক হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন—কারণ আমি যে কয়েকদিন হইল মরিয়া গিয়াছি! একটি বাড়ীর আড়ালে অন্ধকারে যাইয়া আমি তাঁহাকে সংক্ষেপে সকল কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন "আজ সরলার পত্র পাইয়াছি। সে আমাকে একা এই বাড়ীতে আসিতে বলিয়াছে। তা

আপনি এসেছেন—" আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "সে সব কথা পরে হবে। এখন আপনার পোষাক আমার দিন আর আমারগুলি আপনি নিন্।" কাপড় বদলাইয়া, একটি নবীন রহস্যময় প্রহসনের অভিনয় করিবার জন্য আমি একেলা সেই ১২০ নম্বর বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। বাড়ীটী নিস্তব্ধ। উপরে মিট্ মিট্ করিয়া একটি আলো জ্বলিতেছিল। আমি দ্রুতপদে উপরে উঠিলাম। কোথাও কেহ নাই। আমি সেই নির্জ্জন কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়াছি, এমন সময় একজন লোক আমার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল। আমি সতর্কই ছিলাম, নিমেষ মধ্যে তাহাকে মেজেয় উপর আছড়াইয়া ফেলিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দেখি আর একজন—তাহার হস্তে একখানি ছোটালে ছোরা। উভয়েরই মুখোস পরা ছিল। আমি একটু সরিয়া গেলাম এবং চক্ষের নিমেষে রিভল্‌ভার দুইটি বাহির করিয়া বলিলাম—"আমি প্রভাত গোয়েন্দা। যদি ধরা দিতে হয় দাও, নতুবা এখনই গুলি করিব।" আমি বন্দুক উঠাইলাম। তাহাদিগের একজন আমাকে লক্ষ্য করিয়া ছোরাখানা ছুড়িয়া মারিল। ছোরা আমার বাম হস্তের উপর আসিয়া পড়িল। সে দিকে তখন আমার দৃষ্টি ছিল না। আমি আর কাল বিলম্ব না করিয়া রিভল্‌ভার ছুড়িলাম। উভয়েই আহত হইয়া পড়িয়াগেল। আমার মুখ বাঁধিবার জন্য যে "গ্যাগ" (gag) আনিয়াছিল তাহা দিয়া উহাদিগেরই মুখ আমি ভাল করিয়া বাঁধিলাম।

২৩শে ডিসেম্বর।

কয়েকখানি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইল—"জানবাজারে ভীষণ হত্যাকাণ্ড! রামচন্দ্র রায় নিহত হইয়াছে। পুলিশ হত্যাকারীর অনুসন্ধান করিতেছে।" * * *

৩০শে ডিসেম্বর।

আজ বড় সাহেবের সহিত অনেকক্ষণ পরামর্শের পর বেলা ১টার সময় বাসায় ফিরিলাম। ৫টার সময় আবদুল আসিয়া খবর দিল যে নেবুতলার বাড়ীতে বিবাহের সকল বন্দোবস্ত হইতেছে। লণ্ঠন ঝুলিয়াছে—ব্যাণ্ড বাজিতেছে—বিবাহ খুব ধুমধামের। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা একে একে নেবুতলা যাইয়া উপস্থিত হইলাম। বড় সাহেবও সঙ্গে ছিলেন। আবদুল

ছেলেমানুষ তাই কৌশল করিয়া পূর্ব্বেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। বাজনা বাজাইয়া, রোশনাই করিয়া যখন মহা ধুমধামে বর বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল—সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরাও প্রবেশ করিলাম। পুলিশে বাড়িটি ঘিরিয়া ফেলিল। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িল! * * *

আমি ভ্রাতার ক্রোড়ে ভগ্নিকে অর্পণ করিলাম। আর অবিনাশ ডেপুটী ওরফে শশী বাড়ুয্যে হইতে আরম্ভ করিয়া সরোজ পর্য্যন্ত সকলেরই বিধিমত শাস্তি হইল। বলা বাহুল্য যে 'বরের বাসর' সে দিন মুচিপাড়ার থানায় হইয়াছিল।

১০ই ফেব্রুয়ারি।

আমি আজিও গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন পুরস্কার প্রাপ্ত হই নাই। তবে বলিতে লজ্জা করে—আমি সরলাকে পাইয়াছি, সরলা এখন আমার।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

ব্যাকুল হৃদয়।

চাহিয়া চাহিয়া, কত কি করিয়া,
গিয়াছে চলিয়া, মরমে পশিয়া
আকুল ক'রেছে পরাণ মোর!
গিয়েছে চলিয়া, হৃদয় দলিয়া,
পাষাণ হৃদয়া, সে বালিকা ছিয়া
কেমনে জানিবে কি দুঃখ মোর!
দুঃখনেই তাতে যে সুখ তাহাতে

পেয়েছি গো আমি, কেমনে গো তুমি
কণামাত্র তার বুঝিবে বল ?
জানকি তোমরা, কি সুখে আমরা
ছিলাম দুজন; নয়নে নয়ন,
হৃদয়ে হৃদয় যবে গো ছিল !
চোখেতে হাসিয়া, চোখেতে কাঁদিয়া,
কত কি কহিয়া, কত কি গাহিয়া
মিলাত দুঃখের সুখের তানে !
(আমি) চাহিয়া চাহিয়া, সে মুখ দেখিয়া
নয়নের পর নয়ন রাখিয়া
ভাসিতাম ওগো আনন্দমনে !
সুখেতে মাতিয়া, বিভোর হইয়া,
কত কি শুনিয়া, সোহাগে গলিয়া
আদরে নাচিত আমার হিয়া !
চোখেরি কোণেতে কত কি কহিত,
সে সকল কথা মুখে না ফুটিত,
ফুটেনা মানব ভাষাতে যাহা !
চোখে চোখ মিলাইয়া,
হিয়ার মাঝার দিয়া,
কি সুখময় কথাসে
ওঃ পরাণে ঢেলেছে যে !
দুদণ্ডের তরে দেখে,
শুধু চোখে চোখ রেখে
আমারে যে পাগল করেছে সে !
তোমরা কি বল ?—

আমি কি জানিয়া এমন ভাবিয়া
গিয়েছিনু তারি পাশে,
তারি ভালবাসা আশে ?
আমিতো চাহিনে আমিতো দেখিনে
তবে বা সে কেন চাহিল গো হেন ?—
আমারে যে আকুল করেছে সে !
যদি তুমি বল কিবা দুঃখ ছিল
চাহিল, চাহিল; দেখিল, দেখিল;
তাহাতে কি দুঃখ দিয়া
সে গিয়াছে গো চলিয়া ?
ব'ল না ব'ল না জান না জান না;—
তার ডাগর নয়ন দুটি;
(তাতে) কত না অজানা ভাষা ফুটি
আমার মরমে সই পশেছে,
তাতে আমার ব্যাকুল করেছে !
কাতর নয়নে পরাণের কানে
চাহিয়া চাহিয়া কত কি বলিয়া
গিয়েছে গাহিয়া অকুটস্বরে;
আমার পরাণ ব্যাকুল ক'রে !
তাইতো বসিয়া একেলা আসিয়া
এ নিভৃত স্থানে; ব্যাকুলিত মনে
আমি গাহিছি এমনই ক'রে;
গিয়েছে আমায় ব্যাকুল ক'রে !

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুরাশা।

কাল স্বপ্নে দেখেছি রেতে,
ধরা খানি যেন গিয়াছে ভাসিয়া,
করুণা-নদীর স্রোতে।
প্রেম-সিন্ধু পানে ছুটিছে করুণা
জাহ্নবী রূপ ধরি,
পিপাসিত জন সুশীতল নীর
পিয়ে অঞ্জলী ভরি।
শ্রান্ত ক্লান্ত বহুদূর হতে
ছুটে আসে কেহ তথা,
হিমনীর করে পরশি তাহারে
জুড়ান করুণা মাতা।
ধূলা কাদা যত মাখি অঙ্গে, কেহ
করুণার তীরে যায়,
নির্মল নীরে দেহ নির্মল,
ধূলি মলি ধুয়ে যায়।

কাল স্বপ্নে দেখেছি রেতে,
ধরা খানি যেন গিয়াছে ভাসিয়া
করুণা জ্যোৎস্না স্রোতে।
চাঁদ হয়ে' প্রেম উঠেছে আকাশে,
করুণা জ্যোৎস্না তার,
জগত প্লাবিত সে সুধা কিরণে
আঁধার নাহিক আর।
প্রাসাদ শিখরে জ্যোৎস্নার শোভা
দরিদ্রের আঙ্গিনায়,

চিতা নিবি' আছে অঙ্গার রাশি
জ্যোৎস্না ভাতিছে তায়,
কুসুমের দলে জ্যোৎস্নার শোভা
ধনীর উদ্যান কোলে,
কণ্টক-বনে কণ্টকী লতা
তা'তে ও জ্যোৎস্না খেলে।

কাল স্বপ্নে দেখেছি রেতে,
করুণা বায়ুর সুবাসে যেন গো
জগত উঠেছে মেতে।
প্রেম পরিমল ধরিয়া হৃদয়ে
বহিছে জোছনা বায়,
স্বার্থ ঘৃণা দ্বেষ তৃণটীর মত
কোথায় উড়িয়া যায়।
ভাই ভাই বলি করে কোলা কুলি,
সাধু পাপী তাপী মেলে,
জাগিছে জগত যেন ঘুম ভেঙ্গে
মায়ের কোলের ছেলে।

কাল স্বপ্নে দেখেছি রেতে,
করুণা যেন গো নারী রূপ ধরি,
এসেছে ত্রিদিব হ'তে।
ছুটে আসে ছেলে "মা জননি!" বলে'
তুলিয়া লইছে বুকে,
কেহ দূরে যায়, ফিরে নাহি চায়
হাত বাড়াইয়া ডাকে,

ছুটে আসে ছেলে ধূলা খেলা ফেলে
আঁচলে মুছিয়া ধূলি,
দুটি স্নেহ করে বেষ্টন করি
কোলেতে লইছে তুলি।
স্নিগ্ধ মুরতি নয়নে বচনে
ললাটেতে স্নেহ লেখা,
মধুর অধরে উঠেছে ফুটিয়া
স্নেহের হাস্য রেখা।
মনে হয় যেন আপনা হারায়ে
আপনা করেছে পর,
জগতের মাঝে গৃহ বাঁধিয়াছে
ত্যজিয়া আপন ঘর।
বিস্ময় মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া
দেখি সে অপূর্ব্ব ছবি,
কে যেন কহিল কানে কানে মোর,
"ইনিই জননী দেবী।"
এমন সময় শুনি "মা, মা," বলে
ডাকিছে সন্তান মোর,
"আমিও জননী?" ভাবিতে ভাবিতে
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর।

শ্রীমতী সরলাবালা সরকার।

জ্যোতিষে বিবর্ত্তনবাদ।

জীব জগতের ন্যায় জ্যোতিষ্কমণ্ডলেও বিবর্ত্তনবাদের প্রমাণ পাওয়া যায়। উহারা কেহ তেজোময়, কেহ নিস্তেজ, কেহ প্রভাময় কেহ নিষ্প্রভ, কেহ গুরু কেহ লঘু, কেহ স্থূল কেহ সূক্ষ্ম, কেহ ক্ষুদ্র কেহ বৃহৎ। ইহাদিগের বিভিন্ন ইতিহাস বিবর্ত্তনবাদের সাহায্যে এক সূত্রে গ্রথিত ও হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

প্রথমে চন্দ্র মণ্ডলের কথা বিবেচনা করা যাউক। চন্দ্র নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ; কিন্তু চিরদিন এইরূপ ছিল না। ইহার কলঙ্ক সকল আগ্নেয় গিরির ন্যায় অগ্ন্যুৎপাতের প্রমাণ দিতেছে। অতীত কালে উহার অভ্যন্তর এতাদৃশ তেজোময় ছিল যে তথা হইতে সময় সময় অগ্নি ও গলিত ধাতু প্রস্তরাদি নির্গত হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ ও পৃষ্ঠদেশে বিকীর্ণ হইত। টলেমিয়স্ নামক যে গহ্বরটী একণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত তাহার ব্যাস ১১৫ মাইল। কিন্তু কাল ক্রমে চন্দ্র এক্ষণে নিতান্ত তেজোহীন হইয়াছে।

আমরা চন্দ্রের এক দিক মাত্র দেখিতে পাই, অপরার্দ্ধ অদৃশ্য। ইহা হইতেও প্রমাণ হয় যে চন্দ্র পূর্ব্বে দ্রব ছিল, কালে এক্ষণে কঠিন হইয়াছে। সুতরাং তৎকালে উষ্ণ ও এক্ষণে শীতল হইয়াছে। বিবিধ উপায়ে এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

আকাশে কেবল চন্দ্রই যে কালক্রমে এইরূপ তেজোহীন, প্রভাহীন, কঠিন, শীলাপিণ্ডবদবস্থায় পরিণত হইয়াছে তাহা নহে; আরও অনেক ভ্রাম্যমান গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন তেজোহীন পিণ্ডের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এক্ষণে সূর্য্যমণ্ডলের কথা বিবেচনা করা যাউক। এই বিশাল জ্যোতিষ্ক অসাধারণ তেজোময় ও প্রভাবান। ইহার উত্তাপ অতীব প্রখর। কিন্তু তাপের স্বভাব এই যে উহা ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হয়; এবং তজ্জন্য উত্তপ্ত বস্তুর তাপ ক্রমশঃ কমিতে থাকে। এই নিয়মাধীনে সূর্য্যও কালক্রমে তাপহীন হইয়া যাইবে। কতিপয় কারণে (তন্মধ্যে তাপ লাঘবতা হেতু সূর্য্যমণ্ডলের সঙ্কোচনই প্রধান) সূর্য্যের বহিস্তাপ রক্ষা না হইলে এতদিন সূর্য্য এরূপ

প্রখরতেজা আর থাকিতে পারিতেন না। যাহাহউক কালক্রমে সূর্য্য নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইবে, ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

এইরূপে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণের বিষয় আলোচনা করিলে একই ইতিহাস জ্ঞাত হওয়া যায়। প্রথমে অত্যুষ্ণ সুতরাং ধূমবৎ; পরে উষ্ণতাহীন, সুতরাং কঠিন ও পিণ্ডবৎ। বস্তুতঃ অনন্ত আকাশপথে অতীন্দ্রিয় অত্যুষ্ণ বাষ্পময় নীহারিকা হইতে, স্থূল তেজোহীন বিশাল পিণ্ড পর্য্যন্ত বিবিধ জ্যোতিষ্ক সকল দ্রুত অথবা মন্দ বেগে ভ্রমণ করিতেছে। আর এই দুই সীমার মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় অসংখ্য জ্যোতিষ্কগণ স্ব স্ব ভ্রমণ পথে বিচরণ করিতেছে।

এইরূপ বিবিধ অবস্থাপন্ন জ্যোতিষ্ক সকলকে একত্রে বিবেচনা করিতে গেলে ইহা স্বতঃই মনোমধ্যে উদয় হয় যে অত্যুষ্ণ সূক্ষ্ম নীহারিকা কালক্রমে উষ্ণতাক্ষয়ে বিবিধ অবস্থার মধ্য দিয়া অবশেষে তেজো বিহীন নিষ্প্রভ পিণ্ডে পরিণত হইয়াছে।

সাধারণতঃ তাপে আয়তনের বৃদ্ধি ও ঘনত্বের লাঘবতা, এবং তাপক্ষয়ে আয়তনের সঙ্কোচ ও ঘনত্বের বৃদ্ধি হয়;——ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ। এক্ষণে আকাশপটে একটি অত্যুষ্ণ অতি সূক্ষ্ম নীহারিকা কল্পনা করা যাউক; আর ঐ নীহারিকা দ্রুত বেগে আপনার মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, এইরূপ মনে করা হউক। কালক্রমে উহার উষ্ণতার হ্রাস, সুতরাং আয়তনের সঙ্কোচন হইবে। তাহা হইলেই পূর্ব্বাপেক্ষা ঘনত্বের বৃদ্ধি হইল। এই সঙ্কোচনের ফলে উপরের লিখিত আবর্ত্তন গতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ক্রমে আয়তনের যতই ক্ষুদ্রত্ব হইবে; ঘনত্ব এবং আবর্ত্তন গতিও ততই বৃদ্ধি হইবে। ক্রমে ঘনত্বের বৃদ্ধি হওয়ায় ঐ বাষ্পময় নীহারিকা কালে দ্রবাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। তখন আবর্ত্তন গতির প্রভাবে উহা প্রায় গোলাকার (বৃত্তাভাস) হইয়া উঠিবে। ক্রমে আরও তাপক্ষয় হওয়ায় পূর্ব্ববৎ সঙ্কোচন ও গতির বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। তখন কেন্দ্র বিরোধী শক্তির বলে উহার ক্ষুদ্রাংশ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইবে। বিক্ষিপ্ত অংশ সকল মূল জ্যোতিষ্কের তুল্যাভিমুখী আবর্ত্তন গতিতে ঘুরিতে থাকিবে; এবং কেন্দ্র বিরোধী ও কেন্দ্রাভিমুখী গতির ফলে মূল জ্যোতিষ্কের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ

করিবে। ক্রমে এইরূপ পুনঃ পুনঃই হইতে থাকিবে। তাপক্ষয় সঙ্কোচন ও ঘনত্বের বৃদ্ধি পূর্ব্ববৎ অবিরাম চলিতেছে। সুতরাং নিক্ষিপ্ত অংশ সকল ন্যূনাধিক কঠিন নূতন নূতন গ্রহে উপগ্রহে পরিণত হইবে। সৌর জগতে এই অবস্থাই সংসাধিত হইয়াছে। এবং আকাশের অসংখ্য স্থানে অসংখ্য সৌর জগতে এইরূপ হওয়ায় আকাশপট গণনাতীত নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহে পরিশোভিত হইয়াছে। ইহাই জ্যোতিষে বিবর্ত্তনবাদ।

শ্রীশশধর রায়।

এদিক আর ওদিক।

(একটি চিত্র।)

আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগ; রাজঘাটে। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে কাশীধামের পথঘাট অগ্নিময়। অপরাহ্ণ তিনটার মেল ট্রেনের অপেক্ষা করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে রাজঘাট ষ্টেসনে বসিয়া আছি। ষ্টেসনের বাহিরে চতুর্দ্দিকের প্রস্তর কণিকা ও ধূলি সমূহ ঝাপটাইয়া লইয়া প্রবল শুষ্ক বায়ু 'হুহু' বহিতেছে, সে এক প্রাণান্তকর ব্যাপার! প্রতি মুহূর্ত্তে ঘটিকার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছি,—কখন তিনটা বাজিবে—মেল ট্রেন আসিবে, এ প্রাণান্তকর কষ্টের অবসান হইবে!

পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর শ্রীল পানিপাঁড়ে ঠাকুর ভ্রূকুটি কুটিলকটাক্ষে অতি বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া 'বিড়্ বিড়্' করিতে করিতে তাহার নাক্কাতার আমলের সেই ভাঙ্গা 'লোটা' আর জীর্ণ রজ্জুবদ্ধ অর্দ্ধ জলপূর্ণ 'বাল্টি' হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে কি কাণ্ড!—আবালবৃদ্ধ বনিতা যত উপস্থিত যাত্রী সেই আধ বাল্টি জলের

উপর ঝুঁকিয়া পড়িল! পানিপাঁড়ে বড় চতুর,—দাঁতমুখ খিঁচিয়া বকিতে বকিতে 'বাল্টি' হইতে অর্দ্ধলোটা জল উঠাইয়া তাহাই সূক্ষ্ম সূত্রের ধারে অমৃতের ন্যায় অতি অকিঞ্চিৎকর মাত্রায় তৃষ্ণার্ত্ত যাত্রীদিগকে বিতরণ করিতে লাগিল।

আমার ভাগ্যে আর সে অমৃত ঘটিয়া উঠিল না। অন্তঃপ্রদেশে অপর্য্যাপ্ত শৈবাল মণ্ডিত বাল্টিস্থ কর্দ্দমাক্ত সেই বিসদৃশ গঙ্গোদক—অথবা 'লকো-মোটিভে'র জল সংগ্রাহক সেই স্থূল চর্ম্মবিনির্ম্মিত সুদীর্ঘ নল নিঃসৃত পূত 'কলোদক' বলিতে পারি না—পানিপাঁড়ে রূপ ব্রহ্মার অক্ষয় কমণ্ডলুতে বরং গুপ্ত থাকুক বলিয়া উদ্দেশে নমস্কার করিলাম!—যাঁহাদের ভগীরথের ভাগ্য ছিল, তাঁহারা হয়ত মাদৃশ সুকৃতীহীনকে অভিশাপ প্রদান করত নেপথ্যে স্ব স্ব শঙ্খ ঘণ্টিকার স্বর সংযোগ করিয়া দিবেন! কিন্তু সেই অমৃত বিন্দু বঞ্চিত হতভাগ্য আমি, যাত্রাকালে রাঙ্গাদিদির সযত্ন সস্নেহ প্রদত্ত পর্ণ পাত্রটি (পানের ডিবা) পকেট হইতে বাহির করিয়া, দুইটি পান উঠাইয়া মুখ গহ্বরে নিক্ষেপ করিব,—তৃষিত রসনা ও দশনপংক্তি যুগপৎ তাহাদিগকে আক্রমন করিতে উদ্‌গ্রীব,—এমন সময় সম্মুখে অদূরে আমারই ন্যায় আরও একজন যুবক 'অভগীরথ' স্থির দাঁড়াইয়া স্মিতবদনে প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমারই দিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য করিতেছেন, দেখিতে পাইলাম।

মুখগহ্বরোদ্দেশে উর্দ্ধোত্থিত হস্ত আমার সহসা কি স্তম্ভিত হইল?—তবু, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটি পান অলক্ষিতে চকিত লম্ফনে ঈপ্সিত আসন্ন মৃত্যুর জন্যই যেন আমার দারুণ তীক্ষ্ণ দশনপংক্তি পরিশোভিত মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হইল! সেই পানটি চিবাইতে চিবাইতে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যুবক সরল দৃষ্টিতে আমার দিকে পূর্ব্ববৎ চাহিয়া রহিলেন—কিবা প্রশান্ত চাহনি! দিব্য 'ফুটফুটে' সুশ্রী বাঙ্গালী যুবকটি, মস্তকে নিবিড় কৃষ্ণ 'গোছা গোছা' কুন্তল জাল,—তখন বুঝি বাজারে কুন্তলীনের তেমন প্রচলন হয় নাই, নতুবা নিশ্চয় বলিতাম যুবক উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন! যুবকের মুখে ঈষৎ গোঁফের রেখা দিয়াছে————সেখানে কেহ ভারত চন্দ্র থাকিলে সেই জনতা মধ্যে যুবককে লইয়া মহা মুস্কিল বাধিত! যুবকের পরিধানে জরির কারুকার্য্য শোভিত পাড়যুক্ত 'ফুরফুরে' ঢাকাই ধুতি; হস্তে একটি

রেশমের ছাতা, পায়ে কাল চকিং—'পম্পসু'! আমার বড় কৌতুহল হইল, দ্বিতীয় পানটি মুখে ফেলিয়া দিলাম, আর দুই পানটি হাতে লইয়া যুবকের নিকট গিয়া বলিলাম—"মহাশয় পান খাবেন?"

অপরিচিতকে—কৌতুহল ও উগ্র হৃদয়াবেগের বশবর্ত্তী হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হঠাৎ এরূপ ভাবে 'পান সাধিয়া' আমার যেন কেমন বোধ হইতে লাগিল, আমি বড়ই অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম; কিন্তু যুবক তৎক্ষণাৎ অম্লান বদনে হাসিয়া বলিলেন—"দিন্ মহাশয়, বাঁচিলাম, উঃ যে গরম!—মহাশয়, আপনি কোথেকে আস্‌ছেন? যাবেন কোথা?"—

আমি বলিলাম—"মহাশয়, আমি বাঙ্গালী টোলা দেবনাথপুরা হ'তে আস্‌ছি, বক্সার যাব, আপনি মহাশয়?

যুবক সাশ্চর্য্যে উত্তর করিলেন—"আপনি জানেন না? আমি শ্যামনগরে আজ একহপ্তা আছি; আমার নাম মৃগেন্দ্র, আজ সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে এপারে বেণীমাধবের ধ্বজায় উঠেছিলেম আর এই ষ্টেসনে আস্‌ছি! আচ্ছা, বেণীমাধবথেকে বারাণসীর Sceneryটা ভারি সুন্দর কি বলেন মহাশয়?" এই বলিয়া মৃগেন্দ্র তাঁহার সুচিক্কণ লোহিতাভ রেশমী পঞ্জাবীর পকেট হইতে একটি 'সিগার' বাহির করিয়া পার্শ্বস্থ জনৈক যাত্রীর অগ্নিমুখ কলিকায় তাহাতে অগ্নি সংযোগের চেষ্টা করিতে করিতে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—অতি দুর্ভাগ্য বশতঃই দেশালাই আনিতে তিনি দৈববশে ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন!

এতক্ষণ কৌতুহলে কথায় কথায় নিদাঘের তীব্রতাপ প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। দেখিলাম, মৃগেন্দ্র তাঁহার নামের প্রথমাংশের সার্থকতা সম্পাদনে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন!—সেই 'চাঁদপানা' বদনে চঞ্চল চক্ষু, চঞ্চল অথচ সদানন্দ প্রকৃতি—যেন প্রকৃতিক্রোড়-লালিত স্বাধীন কুরঙ্গ, আপন ভাবে আপনিই আত্মহারা! কিন্তু সে চাঞ্চল্য বুঝি সীমাতিক্রম করিয়াছিল—অক্ষুণ্ণ হর্ষভাবোদ্দীপ্ত সে চাঞ্চল্য বুঝি দিগ্বিদিকে ছুটিয়া পড়িতেছিল, হৃদয়বৃত্তি সমূহ সে মধুর চঞ্চলতা নিরোধ করিতে পারিতেছিল না! তবুও কেন জানিনা মৃগেন্দ্র সঙ্গে আমি সকল কষ্ট ভুলিয়া গেলাম, মনে কেমন আনন্দ বোধ হইতে লাগিল!

সিগার ধরাইয়া মৃগেন্দ্র বলিলেন—"মহাশয়ের অভ্যাস আছে ত ?—

আমি কাতরভাবে উত্তর করিলাম—"মহাশয়, ক্ষমা করিবেন, আমি আশৈশব এরসে বঞ্চিত !"—আমার কথা শুনিয়া মৃগেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—"বটে ! আপনি তবে নিরামিষাশীর দলে ? যান, ঋণটা তবে অপরিশোধ রহিয়া গেল !"—

আমি মৃদু হাসিলাম, বলিলাম—"কিসের ঋণ ?"—

"দেখুন ত টাইম কত ?" বলিয়া মৃগেন্দ্র আপনিই ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন—"Oh ! Just half-past two o'clock, half an hour more—very bothering and troublesome !— মহাশয়, আপনি জ্যোতিষ জানেন ?"—এক নিশ্বাসে এই কথাগুলি বলিয়া মৃগেন্দ্র আমার উত্তর প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম—"কেন বলুন দেখি ?"

মৃগেন্দ্র বলিলেন—"দেখুন, কোন্ দিকে গেলে আমার কি হবে বলেদিতে পারেন—হয় এদিক না হয় ওদিক ?

আমি বলিলাম—"সে কেমন ? বুঝিলাম না !"

"এইটে আর বুঝলেন না ? এই,— হয় এদিকে চূড়ান্ত, না হয় ওদিকে !—'এস্পার কি ওস্পার' ! The problem means— একটা উপায় এমন, হঠাৎ খুব বড়দরের কোন সার্বিস (service) পেয়ে রাতারাতি বড় মানুষ, না হয় এমন একটা উপায়—কোন এক মহাপুরুষ সাধুর সঙ্গ লাভ করে একেবারে রাতারাতি চরমমোক্ষলাভ !—বলতে পারেন ?"—

আমি অবাক ! আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলাম—"একি কখনও সম্ভব ?"

"কাঁহে নেহি লেড়্কে ?"

পশ্চাদস্থ দেয়ালের পার্শ্বে এইরূপ একটা শব্দ হইল। সাশ্চর্য্যে ফিরিয়া চাহিতে জনৈক দণ্ডী সাধু আমাদের মধ্যে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

দণ্ডী পুরুষ আবার বলিলেন—"কাঁহে নেহি বেটা ? দোঠো রোপেয়া জল্দি মুজকো মিলে তো ম্যায় বাতায় দিউ কাঁহা তেরা পন্থ হ্যায় !" আশ্চর্য্য, মৃগেন্দ্র তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে দুইটি রৌপ্যমুদ্রা দণ্ডীর হস্তে প্রদান করিলেন ! পার্শ্বস্থ যাত্রিগণ ঠেসাঠেসি করিয়া এ ব্যাপার বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিল।

দণ্ডী মৃদুস্বরে বলিলেন—"বাচ্চা ! যব্ তু মুজ্‌কো খোস কিয়া, তব্ তেরাভি পন্থ হো যা'গা ; যা বেটা সিমলামে অভি চলাযা, মেরী বাৎ কভি ঝুটী নেই হোগী, যা তু সিমলামে যা !"—

আমরা মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিলাম; দণ্ডী পুরুষ নিঃশব্দে ষ্টেসনের বাহির হইয়া গঙ্গার তীর প্রান্তে চলিয়া গেলেন।

"ঢং ঢং ঢং !"

টিকিটের ঘণ্টা পড়িল ; শিকরোল হইতে ট্রেন ছাড়িয়াছে। স্থির সমুদ্রে সহসা ঝটিকা বহিলে যেমন চকিতে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ যুগপৎ ছুটিতে থাকে, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের নির্ব্বাত জলধি সহসা ভীমবীচিবিক্ষোভিত হইয়া উঠে, অথবা দৌড়ের (race) বাজী জিতিবার নিমিত্ত বালক দলকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড় করাইয়া "Three" বলিবা মাত্র যেমন বালকগুলি সহসা চঞ্চল ভাবে একের উপর আর ছুটিয়া যায়,—তদ্রূপ এই নিস্পন্দ ষ্টেসন-সমুদ্রে সহসা যাত্রীর ঢেউ উঠিল, ঘণ্টাধ্বনি হইবা মাত্র বালকদলের ন্যায় যাত্রীদল সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল—একের উপর আর পড়িতে পড়িতে টিকিটঘরের ছুটিয়া চলিল !—মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের ঘটনা, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের শান্তভাব তাহারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে !

আমি বলিলাম—"মৃগেন্দ্র বাবু এখন করিবেন কি ?" "সিমলা যাইব" বলিয়া মৃগেন্দ্র বাবু সিগার টানিয়া আর একবার হাসিলেন, মুখগহ্বর হইতে ধূমশ্রীব বাহির হইয়া তপ্ত বায়ুতে ছুটিতে লাগিল।

আমি একখানি টিকিট লইয়া আসিয়া আবার বলিলাম—"সিমলায় সবইত সাহেব সুবোর কাজ, সেখানে আপনার কোন্‌দিকের কি হইবে জানি না, যাহাহউক মৃগেন্দ্র বাবু, ভুলিয়া যাইবেন না। C. of ষ্টেসনমাষ্টার বরাবর লিখিলেই চিঠি পাইব; আপনি সিমলা পৌঁছিয়াই ঠিকানা জানাইবেন।"

মৃগেন্দ্র বলিলেন—"তাকি আর বলতে ? মহাশয় স্মরণ রাখবেন !"

আমি বলিলাম—' বিলক্ষণ !—"

"খটাঙ্" শব্দে 'গেট' খুলিয়া গেল; ট্রেণ প্লাটফরমে। "তবে আসি"

বলিয়া কৌতুহল পূর্ণ হৃদয়ে—একটা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার হৃদয় মধ্যে রুদ্ধ করিয়া মৃগেন্দ্রের নিকট বিদায় হইয়া ট্রেনে উঠিলাম। বিদায় কালে মৃগেন্দ্র চঞ্চল করে আমার 'হ্যাণ্ডসেক্' করিলেন।

দেখিতে দেখিতে ট্রেন পুল পার হইয়া দ্রুত বেগে মোগলসরাই অভিমুখে ছুটিল। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি জাহ্নবী-তটশোভা চিরপুণ্যধাম বারাণসীর সে অপূর্ব্ব দৃশ্য চিত্রলেখার মত ক্রমে দূরে বিলীন হইয়া গেল,—উদ্দেশে নমস্কার করিয়া ভাবিলাম—"না জানি আবার কত দিনে!—"

শ্রীদক্ষিণারঞ্জণ মিত্র মজুমদার।

—০ঃ০ঃ০—

সংক্ষিপ্ত সাহিত্য সমালোচনা।

(ক) মাসিক সাহিত্য।

প্রদীপ।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯।

মলাট উল্টাইয়াই দেখিলাম "ক্লিওপেট্রা"—মনঃ সংযম করিয়া পাঠ করিলাম, কিন্তু কি পড়িলাম? বুঝিলামই বা কি? 'শব্দ ওসঙ্গীত'—সংক্ষিপ্ত সার। "কুহকচতুরস্র" মন্দ লাগিল না—একটুখানি চিন্তাশীল বটে। তারপরই দেখি সর্ব্বনাশ! আবার "কাশীনাথ"; ক্ষুদ্রতম অক্ষরে কাশীনাথের 'দ্বিতীয় পর্ব্ব'। যাহা হউক কাশীনাথের "স্বর্গারোহণ"পর্ব্ব এই সংখ্যার প্রদীপেই আছে দেখিয়া সুখী ও নিশ্চিন্ত হইলাম। "প্লেগাসুর" শিক্ষাপ্রদ—আমরা আরও শুনিতে চাই, আরও জানিতে চাই। পড়িয়া আশা মিটিল না। "মুরলা-ক্রমশ"—সুতরাং সমালোচনাও "অপ্রকাশ্য।" গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের বিস্তৃত জীবনী পাঠকের সন্তোষজনক হইবে বলিয়া মনে হয়।

তারপর 'মাধুরী' যাহা বলিবার পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এবার আবার দেখিলাম "natural death" "সহজ-মরণ" হইয়াছে!! "শিল্প প্রদর্শনী"—ভাবিয়াছিলাম নূতন কিছু জানিবার, শিখিবার ও শুনিবার থাকিবে এখন দেখিতেছি শুধু কথা! হা হুতাশ অনেক দিনই শুনিয়াছি, "জাতীয় মহাসমিতির উদ্যোক্তাগণ এই শিল্প সমিতির অনুষ্ঠান করিয়া ভারতবাসী প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন"—তাহাও বহুপূর্ব্বেই বুঝিয়াছি। প্রবন্ধ পাঠে নূতন কি বুঝিলাম?

প্রবাসী।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯।

কোলারের স্বর্ণখনি প্রবন্ধটি বেশ হইয়াছে, জ্ঞাতব্য বিষয়ের আরও একটু বিস্তৃত আলোচনা থাকিলে যেন ভাল হইত। 'মুক্তা' শীর্ষক প্রবন্ধেও জানিবার বিষয় আছে বটে কিন্তু কিছুই নূতনত্ব দেখিলাম না,—এসব বিষয় ইংরেজি ম্যাগাজিনে বহুপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, ছবিগুলিও বুঝিবা সেই সকল পুরাতন পত্রিকা হইতেই সংগৃহীত। অপূর্ব্ব বাবুর বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে আরও নূতন কথা নূতন রকমে শুনিতে ইচ্ছা হয়। 'পাঞ্জাবে বাঙ্গালী' সুখপাঠ্য, জ্ঞাতব্যতথ্যে পূর্ণ। "ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিতে" অক্ষয় বাবু মৃচ্ছকটিকের প্রাচীনত্ব সংস্থাপন করিতেছেন। এরারকায় প্রবাসীর চিত্র অতুলনীয়।

আরতি।

আষাঢ়, ১৩০৯।

প্রাচীন সংস্কৃত ও বঙ্গসাহিত্যে নারী মর্য্যাদা সুন্দর হইয়াছে। পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের একটি জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। আরতির পক্ষে আরতি ভালই চলিতেছে।

নবপ্রতিভা।

বৈশাখ।

'ভারতের ইংরাজি শিক্ষা', 'কোথায়' ও 'মোগলরাজত্বে পুলিশ' প্রবন্ধ তিনটি ক্ষুদ্র বটে কিন্তু মন্দ নহে। 'মায়া' ভালই চলিতেছে। 'একান্নবর্ত্তিতা' ভাল লাগিল না। ভারতীর অনুকরণে লিখিত হইলেও লেখকের চেষ্টা

সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। নবপ্রতিভার মাসিক সাহিত্য সমালোচনাও পরের হাতে, সম্পাদক মহাশয় কি করেন?

অতিথি।

আষাঢ়।

'অতিথি' বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগী সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ৭৭নং দিগ্‌বাজার রোড, ঢাকা হইতে গত বৈশাখ হইতে বাহির হইতেছে। আমাদের দেশে শিশু পাঠ্য মাসিকপত্রের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। যে এক আদখান এই উদ্দেশ্য সফল জন্য হাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না। 'মুকুল' এখন 'রচা' কথাতেই এক রকম পূর্ণ। কাজেই এ সময়ে অতিথির আবির্ভাব সুখের বিষয়। আলোচ্য সংখ্যার প্রবন্ধগুলি সুখ পাঠ্য। আমরা নবীন সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

(খ) পুস্তক সমালোচনা।

অরুণ,—শ্রীদেব কুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। বঙ্গের সাহিত্যাকাশে 'অরুণ' আসিয়াছে। 'অরুণ' এখনও তরুণ—তাই ভয়ে ভয়ে, কম্পিত পদে আসিয়াছে। কবি প্রথমেই গাহিয়াছেন,—

আমি এই নানা ফুলে গাঁথিয়াছি মালা!
সভয়ে এসেছি দ্বারে— দাঁড়ায়েছি এক ধারে;
লহ তুলি' নিবাইয়ে জ্বালা—
যত্নে গাঁথা ছোট মোর এই ফুলমালা!'

তরুণ অরুণের নবীন কবি যতখানি ভীত হইয়াছেন তাহার আবশ্যকতা ছিল না। কবি অবশ্য বড় দুঃখেই বলিয়াছেন—

মনের কথা কইলে দুঃখে নাথ,
"সমালোচকে" দেশ্‌টা গেছে ভরে'।

সত্যই 'সমালোচক'—বিশেষ বঙ্গীয় সমালোচক এক শ্রেণীর নিষ্ঠুর জীব। সত্যই—

সবাই স্বার্থে মগন তোমার দেশে
কারুর প্রাণে নাইক বিন্দু স্নেহ।

অরুণের ছাপা ভাল, কাগজ ভাল, মলাট সুন্দর ও সুদৃশ্য। আধুনিক ফ্যাসানে বাঁধা। বাহ্য সৌন্দর্য্যের সহিত ভিতরেরও বেশ মিল আছে। অরুণের কবি চিন্তাশীল ও ভাবুক। অরুণে একটুখানি নূতনত্ব আছে। আজকালকার কবিতায় আমরা প্রেমের কথা, বিরহের গান, প্রণয়ের অভিমান, উপেক্ষিতের হতাশ ও নৈরাশ্যের হা হুতাশ শুনিতে শুনিতে নিতান্তই উৎপীড়িত হইয়া পড়িয়াছি। আধুনিক অনেক কবিতারই ছন্দ "চিম্‌নি" (chimney) এবং ভাব এতই সূক্ষ্ম যে নাই বলিলেও চলে! অরুণে আমরা তেমন দেখিলাম না। ইহা একটা সুখের কথা বৈকি?

কবির সনেটগুলি আমাদিগের নিকট ভাল লাগিল। তাহাদিগের ভাব উচ্চ ও পরিস্ফুট, সরল ও সুন্দর। কবির প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিতে আয়াস পাইতে হয় না।

'প্রার্থনা', 'মহাশক্তি', 'সংকল্প', 'লজ্জা', 'ভারতীমাতার প্রতি' প্রভৃতি কবিতাগুলি প্রশংসার যোগ্য।

স্থানে স্থানে যে দোষ নাই তাহা নহে। তবে কবি নবীন বলিয়া আমরা তাহার সবিশেষ উল্লেখ করিলাম না। উপমা ব্যবহারে কবিকে আমরা একটুখানি সতর্ক হইতে বলি।

উদার নীলাম্বু শুধু ছিল চারি দিকে
কোমল গালিচা সম বিস্তৃত উদাস!

প্রভৃতি আমাদের নিকট ভাল লাগে নাই।

ভারতীমাতার চরণে কবির নিবেদন বড়ই আশাপ্রদ। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি কবির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। তিনি যেমন বলিয়াছেন,—

তোমার তরেতে চিরদিন আমি জাগিয়া রহিব দেবি,
শ্রান্তি আমার হবে না কখনো তোমার ওপদ সেবি।

তাই যেন হয়। তাহা হইলে কবিরও মঙ্গল আমাদিগেরও মঙ্গল, দেশেরও মঙ্গল।

গান,—শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক রচিত ও সুরে গ্রথিত। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই অতি উৎকৃষ্ট। প্রমথ বাবু একজন সুকবি ও সুগায়ক। গান সমাজের উন্নতি ও অবনতির প্রাণ। প্রমথ বাবু সঙ্গীত দ্বারা সমাজ

উন্নত করিতে চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। তাঁহার গানগুলি তাঁহার উদ্ভাবিত সম্পূর্ণ নূতন সুরে বাঁধা ও প্রত্যেক গানের বিস্তৃত স্বর লিপি-থাকায় শিক্ষার্থীদিগের উপযোগী হইয়াছে। উহার এক দিকে সেই 'প্রাণভরা প্রেম,' সেই 'ভুবন ভুলান হাসি', সেই বনভরা ভাল বাসাবাসির কথা, আবার অন্য দিকে সেই 'তৃষায় আতুরা' 'হিয়া বিধুরা' ছল ছল আঁখি জলের কথা। এইসব ভাবের সহিত রচনা চাতুর্য্য ও শব্দ যোজনা পারিপাট্য তাঁহার রচিত সঙ্গীত বড় শ্রবণ মধুর করিয়া তুলিয়াছে। ইহা ছাড়া গানের মধ্যে 'আকিঞ্চন' 'শ্যামলা' 'বঙ্গবন্দনা' 'অবসাদ' 'অভিযোগ' 'আগমনী' প্রভৃতি গান অতি উচ্চ অঙ্গের এবং চিরদিন বঙ্গসাহিত্য উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। বঙ্গবন্দনা হইতে পাঠকগণের তৃপ্তির জন্য একটি চরণ উদ্ধৃত করিলাম,—

আনন্দে জাগ অয়ি কাঙ্গালিনি।
কিসের দুঃখ মাগো কেন এ দৈন্য
শূন্য শিল্পতব বিচূর্ণ পণ্য ?
হা অন্ন হা অন্ন কাঁদে পুত্রগণ ?
ডাক মেঘমন্দ্রে সুষুপ্ত সবে
চাহ দেখি সেবা জননী গরবে
জাগিবে শক্তি উঠিবে ভক্তি
জননী আপনার সন্তান শালিনী।

গঞ্জনা।

জন্মভূমি অয়ি,
তোর নামে চোখে আসে জল;
হে আনন্দময়ী,
তোর বুকে আজি চিতানল!

অতীত-মহিমা,
তোর কথা স্বপন এখন;
শ্রীহীন-প্রতিমা,
হয়ে গেছে তোর বিসর্জ্জন!

ঐক্যে বিরাজিতা,
তোর সখ্যে নাই কিন্তু প্রাণ;
জগত পূজিতা,
পদে পদে তোর অপমান!

বেদের বন্দিতা,
আজ তোরে বক্তা করে স্তব;
অরণ্য নন্দিতা,
স্বার্থ আজ তোর সাম রব!

গীতার জননী,
আছ শূন্য ধর্ম্ম—ধ্বজা তুলি;
সভ্যতার খনি,
পর-চাক চিক্যে গেছ ভুলি!

গুণীর লক্ষিতা,
বণিকের লক্ষ্য এবে তুমি;
হিংসাস্ত্রিরক্ষিতা,
ধন্য মান' পদধূলি চুমি'!

সাগর বসনা,
আজ তোর নাহি ঘুচে লাজ;
বিশ্বের বাসনা,
ভোগের পুতলি তুমি আজ!

করুণা ভূষিতা,
তোর গোলা দেশে দেশে লুটে;
সেবা—নিঃশেষিতা,
আজ তোরি অন্ন নাহি জুটে!

দান পুণ্যবতী,
সন্তান বিক্রয় কর আজ;
জ্ঞানে সরস্বতী,
জ্ঞান আজ মুখস্থে বিরাজ!

শান্তি সমাহিতা,
আজ বাঁট উকিলে জীবিকা;
স্বাস্থ্য বলান্বিতা,
আজ লক্ষ বৈদ্যের পালিকা!

ভকত বৎসলা,
আশীর্ব্বাদে নাই তোর বল;
সজলা সফলা,
দগ্ধ মাঠ কাঁদে,—'কোথা জল'!

রত্ন প্রসবিনী,
অন্ধে খঞ্জে ভরিতেছে দেশ;
স্নেহ পাগলিনী,
আদরে করিছ সবে শেষ!

হে কবি মোহিনী,
তোরে ছাড়ি,—হেন সাধ্য নাই,
কিন্তু, অভাগিনী,
স্তুতি তোর খুঁজে নাহি পাই!

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

—o—

পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সাহা প্রবর্ত্তিত।

উৎসাহ

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

(আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩০৯)

সম্পাদক
শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল ভক্তি বিনোদ।

উৎসাহপ্রেশ, রাজসাহী।

শ্রীমহিরুদ্দীন সরকার প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা। এই যুগ্ম সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা।

সূচীপত্র।

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
কত কথা ...	শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার বি-এ,	২১৭
প্রাচীন ভারতে বৈদেশিক বণিক...	শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত	২১৯
সন্ধ্যা ও প্রভাত ...	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	২২২
মশ্‌তান সা	শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	২২৪
রমণীর প্রাণ ...	শ্রীমতী মৃনালিনী গুপ্তা	২২৮
আস্তিক ও নাস্তিক মত	শ্রীরমদারঞ্জন মিত্র	২৩০
পিসীমা ...	শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩৫
প্রাচীন ভারতে হিন্দু চিকিৎসক...	শ্রীশরদাচরণ সেন কবিরত্ন	২৪৪
সংক্ষিপ্ত সাহিত্য সমালোচনা	... ...	২৪৮
মাসতী ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	২৪৯
মুসলমান প্রভৃতির ভারতাধিকারের হেতু...	শ্রীরজনীমোহন ঠাকুর	২৫১
চারুশীলা ...	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন	২৫৬
শিশু—"নবীন পান্থ"...	শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক এম্, এ	২৬৭
রঙ্গালয় ও তাহার সংস্কার	শ্রীপ্রেমসুন্দর বসু বি-এ,	২৬৮
বাণী (সমালোচনা) ...	... ...	২৭৩

—০::§)*(§::০—

সংবাদ।

হাওড়া 'আলো' সমিতি হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজ সুন্দর সান্যালকে 'ভক্তি বিনোদ' উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎসাহ-সম্পাদক প্রণীত

আজগুবি গল্প। মূল্য ।৵০ আনা।

আজগুবি গল্প একখানি উপকথার পুস্তক। এখানি ব্রজ সুন্দর বাবুর লেখনী-প্রসূত। উপকথাচ্ছলে বালক বালিকাগণকে সাহিত্য পাঠে আসক্তি জন্মান—নীতিশিক্ষা ও বিশুদ্ধ আমোদ প্রদান করা, এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ব্রজ বাবুর সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। "আলোচনা।"

মজুমদার লাইব্রেরীতে ও উৎসাহ কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সাহা প্রবর্ত্তিত।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত।

উৎসাহ।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

৫ম বর্ষ; { রাজসাহী, আষাঢ় ১৩০৯ } ৮ম সংখ্যা।

কত কথা।

সখা,

কত কথা পড়ে মনে,
আজি এ বিজনে!
তার হাসি আঁকা মুখ,
ভ'রে আছে বুক,
আমি বিভোর তাহারি স্বপনে।

কত কহিতাম কথা নয়নে,
কত গোপনে!
নীরব প্রেমের মধু আলাপন
চলিত নীরবে দুজনে!
তার নয়ন নলিন হ'ত বিকশিত
প্রণয়-মহিমা-কিরণে।

সে আমার কি যে
তাকি বলা যায়;
তারে পেয়েছি কত তপস্যায়!
সে যে কল্যাণ রূপিনী
প্রেম বিলাসিনী,
সে যে দেবী হৃদি অমরায়;

সে গো সফলতা হ'য়ে
করিছে বিরাজ
আমার বিফল জীবনে।
কত কথা পড়ে মনে
আজি বিজনে!!

বুঝি সখা
মম জন্ম জন্মান্তরে
আছিল সুকৃতি সঞ্চিত,
তাই বিষময় নিয়তি বিটপী
এ ফল ধ'রেছে বাঞ্ছিত।

তৃষিত পরাণে তার সুধাধারা
পান ক'রে আমি আছি মাতোয়ারা,
অমৃত দায়িনী, জীবন পালিনী,
রাজরাণী দীন ভবনে;
কত পড়ে মনে বিজনে!

যেন জনমে জনমে ছিল পরিচয়,
ছিলাম অনাদি মিলনে,

দুইটী লহরী যুগ যুগ ধরি
ভেসেছি অকূল জীবনে—

এত প্রেম সখা, এত আকর্ষণ,
শুধু এ জীবনে হয় কি কখন?
যুগ যুগান্তের এ যে আয়োজন,
অমর জীবনে মরণে;
আজি কত কথা উঠে বিজনে!!

প্রাচীন ভারতে বৈদেশিক বণিক।

প্রাচীন রোমানগণ দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কখনও ভারতবর্ষে তরবারি হস্তে উপস্থিত হন নাই। একারণ কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে প্রাচীন রোমানজাতি ভারতবর্ষের বিষয় অনবগত ছিলেন। এ অনুমান যথার্থ নহে। প্রাচীন রোমানজাতি ভারতবর্ষের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। বহুসংখ্যক প্রাচীন রোমান গ্রন্থকার ভারতবর্ষের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ স্ব স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পুরাকালে উভয় দেশ মধ্যে বাণিজ্যস্রোত বহমান ছিল, ভারতবর্ষজাত নানাবিধ সূক্ষ্মবস্ত্র ও অন্যান্য বিলাস সামগ্রী রোমান নাগরিকগণের বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিত।

ভারতবর্ষীয় পণ্যদ্রব্য জল ও স্থল উভয় পথেই রোমে নীত হইত। স্থল পথে বণিকগণ ব্যাকট্রিয়া, বাল্ক, পালমিরা ও লিভাণ্ট প্রভৃতি উত্তীর্ণ হইয়া

পণ্যদ্রব্য সহ রোমে উপস্থিত হইতেন। এপথ বিপদ সঙ্কুল ও দুর্গম ছিল। এজন্য বণিকগণ সাধারণতঃ জলপথেই গমনাগমন করিতেন। পুরাকালে লিভাণ্টের উপকূলে টায়ার নামক স্থানে এক সমৃদ্ধ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফিনিসিয়ান জাতি এই রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। ফিনিসিয়ানগণ বণিগ্বৃত্তি অবলম্বী ছিলেন। ভারতবর্ষের বৈদেশিক বানিজ্য তাঁহাদের হস্তগত ছিল। ইহাই তাঁহাদের তাদৃশ সমৃদ্ধির কারণ ছিল। ফিনিসিয়ানগণ জলপথেই বানিজ্য করিতেন মহাবীর আলেকজেন্দারের হস্তে ফিনিসিয়ান জাতি বিনষ্ট হইলে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বানিজ্য নূতন খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। আলেকজেণ্ডার মিশর দেশে আলেকজেন্দ্রিয়া নামক সমুদ্র কূলবর্ত্তী বন্দরের প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় পণ্যদ্রব্য প্রথমতঃ আলেকজেন্দ্রিয়াতে প্রেরিত হইত; তারপর তথা হইতে ইউরোপের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িত। বানিজ্য সৌকার্য্যার্থ মিশররাজের বিপুল নৌবল ছিল।

পারসীকগণও ভারতজাত পণ্যদ্রব্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমদানি করিতেন। কিন্তু এ সকল দ্রব্য তাঁহারা নিজেরাই ব্যবহার করিতেন; বিক্রয় জন্য ভিন্ন দেশে প্রেরণ করিতেন না। আরাম প্রিয় পারসীকগণ নৌবানিজ্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু কালক্রমে তাঁহারা ভারতবর্ষের বানিজ্যে সম্পূর্ণরূপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময় কনষ্টাণ্টিনোপলে এক সমৃদ্ধিশালী খ্রীষ্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। পারসীগণ কনষ্টাণ্টিনোপলে ভারতবর্ষজাত রেশমী বস্ত্র প্রেরণ করিতেন। কনষ্টাণ্টিনোপলবাসিগণ সৌন্দর্য্যপ্রিয় ও বিলাসপটু ছিলেন। তাঁহারা বহু মূল্যে এই সকল বস্ত্র ক্রয় করিয়া বিচিত্র পরিচ্ছদে অঙ্গ শোভা বর্দ্ধন করিতেন। একারণ ইউরোপে ভারতবর্ষজাত রেশমী বস্ত্র অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠে। দুই জন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক রেশম উৎপন্ন করিবার প্রণালী শিক্ষার্থ চীনদেশে গমন করেন। তাঁহাদের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে অচিরে গ্রীশ, ইটালী ও সিসিলিতে রেশম উৎপন্ন হইতে থাকে। একারণ ইউরোপে ভারতীয় রেশমী বস্ত্রের আদর হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের আদর সম ভাবেই ছিল।

ইহার পর এই বাণিজ্যস্রোত হটাৎ মন্দগতি হইয়া পড়ে। এসলাম ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পর মোসলমানগণ খ্রীষ্টানের পবিত্র তীর্থ জেরুজিলাম

অধিকার করেন; মোসলমানের কালগ্রাস হইতে ধর্ম্মক্ষেত্র উদ্ধার করিবার জন্য ইউরোপের সমস্ত খ্রীষ্টানজাতি সমবেত হইয়া মোসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। ইহার নাম Crusade বা ধর্ম্মযুদ্ধ। এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল ব্যাপী ছিল। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য স্রোত মন্দগতি হইয়াছিল।

ভিনিসিয়ানআদি বণিকগণ Crusade লিপ্ত খ্রীষ্টান সৈন্যের বস্ত্রাদি যোগাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সুযোগে এই সকল বণিকগণ ভারতবর্ষের সমস্ত বৈদেশিক বানিজ্য হস্তগত করেন। কালক্রমে সমস্ত বানিজ্য একমাত্র ভেনিসিয়ান বণিকগণের হস্তেই পতিত হয়। তাঁহাদের উৎকট সাধনায় ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের আদান প্রদান পুনর্ব্বার পূর্ণ মাত্রায় আরম্ভ হয় এবং সমগ্র ভেনিসিয়ান সম্প্রদায় একান্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন। কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই ভেনিসিয়ান বণিকগণের অদৃষ্টচক্র নিম্নগামী হয়। গ্রীসও জেনোয়ার অধিবাসিগণ সমবেত হইয়া তাঁহাদিগকে সঙ্কুচিত করিয়া তুলেন।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভেনিসিয়ান, গ্রীক, ও জেনওয়াইস বণিকগণ ভারতবর্ষের বাণিজ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ ছিলেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ক্লোরেণ্টাইনগণ পিছা অধিকার করেন। পিছা অধিকার কালে লেগহরণ নামক প্রসিদ্ধসমুদ্র বন্দরও তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছিল। ক্লোরেণ্টাইনগণ লেগহরণ অধিকার করিয়া ভারত বানিজ্যে অবতীর্ণ হইয়া অর্থোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করেন এবং সন্ধি সংস্থাপন করিয়া ভেনিসিয়ান বণিকগনের তুল্যঅধিকার প্রাপ্ত হন। ইউরোপের বিভিন্ন জাতি ভারতীয় বানিজ্য ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দীরূপে প্রবলোৎসাহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ইহাতে কিছু মাত্র বৈচিত্র্য ছিল না। কারণ ভারত বানিজ্য একান্ত লাভজনক ছিল। প্রথমে ভূমধ্যসাগরের কূলবর্ত্তী দেশ সমূহেই ভারতবর্ষজাত দ্রব্য সকলের আদর ছিল। Crusade উপলক্ষে সমগ্র ইউরোপের বীরবৃন্দ এসিয়ার পশ্চিমপ্রান্তে সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভারতীয় সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রভৃতি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের অনুকরণে সমগ্র ইউরোপবাসী ভারতবর্ষজাত

দ্রব্য সকলের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। এই আদর দেখিয়া ইটালিয়ান বণিকগণ ভারতবর্ষজাত পন্য দ্রব্য পূর্ণ পোতসহ ইংলিস চ্যানাল, জর্ম্মান সাগর ও বালটিক সাগরে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন।

কালক্রমে ইউরোপের উত্তর ভাগে ও নৌবানিজ্য লালসা উপস্থিত হয় এবং তদ্দেশীয় বণিক সম্প্রদায় ভূমধ্যসাগরে বানিজ্যপোত প্রেরণ করিয়া ইটালিয়ান বণিকগণের নিকট হইতে ভারতবর্ষজাত দ্রব্য সকল ক্রয় করিয়া আনিতে আরম্ভ করেন।

এই সময় ভারতীয় বানিজ্য ক্ষেত্রে যে সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় অবতীর্ণ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে জেনওয়াইস বণিকগণের প্রাধান্য ছিল। কনষ্টাণ্টিনোপল তাঁহাদের বানিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মোসলমানগণ কনষ্টাণ্টিনোপল বিজয় করিয়া তথায় স্বাধিকার স্থাপন করেন। কনষ্টাণ্টিনোপলে খ্রীষ্টানের আধিপত্য বিলুপ্ত হওয়ায় জেনওয়াইস বণিকগণ নিষ্প্রভ হইয়া পড়েন। ভেনিসিয়ান বণিকগণ পুনরায় প্রাধান্য লাভ করেন। কিন্তু তাঁহাদের এই প্রাধান্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া ছিল না। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্ত্তুগিজগণ বণিকবেশে ভারতবর্ষে উপনীত হন এবং তাঁহাদের আগমনে ভারতবর্ষে বৈদেশিক বানিজ্যের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়।

—০—

সন্ধ্যা ও প্রভাত।

বঙ্গভারতি!

গত আজি শ্যাম সন্ধ্যা বেলা,
অনন্ত তারকা চন্দ্র পরার্দ্ধ দীপিকা সম
অযুত আলোক সাথে করে ধীরে খেলা,—
তোমার আরতি!

পুনঃ দীন মর্ত্ত্যধামে
অযুত সন্তান তব অযুত দীপিকা করে
দয়িত চরণে নমি' গাহে তব নামে,—
তোমার আরতি!

ধীরে ধূপগন্ধ পূত
অনন্ত আলোক সাথে প্রসারিত দিকে দিকে,
তা'র মাঝে আত্মহারা তবলক্ষ সূত,—
তোমার আরতি!

* * *

আজি তরুণ প্রভাতে
আকুল আহ্বানেতব অযুত মুগধ সূত
গাহিল মধুরে জাগি' বিহগের সাথে
তোমার প্রভাতি!

সেই ব্যোমস্পর্শী স্বরে
অনন্ত অরুণ-ভাতি-বিগলিত পূতধারা
ত্রিদিবে মর্ত্ত্যের সাথে একীভূত করে,—
তোমার প্রভাতি!

শুভ প্রভাতে নবীন
জগৎ জাগিয়া দেখে ত্রিদিব মর্ত্তের সনে
অপূর্ব্ব মিলনে মরি! হয়ে গেছে লীন!
নমিল প্রকৃতি;—

নবীন জ্যোতির মাঝে দিব্যভাবে মাতি'
সহস্র সন্তান তব গাহিল আকুলে
তোমার প্রভাতি !!

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

মশ্‌তান সা।

মশ্‌তান সা কত দিনের লোক, ঠিক তাহা বলা যায়না। খৃষ্টীয় ১৮৫৭ অব্দের সুপ্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহের অনেক বৎসর পূর্ব্বে এবং অনেক বৎসর পরে তাঁহাকে অনেকে দেখিয়াছিল। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম গুল্-এ-গুল্ মশ্‌তান সা, কিন্তু তিনি মশ্‌তান সা নামেই বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহাকে লোকে "পিশাচ সিদ্ধ" (জিন্নী) বলিয়া বিশ্বাস করিত। বাস্তবিক, আশ্চর্য্য প্রদীপের সহায়তায় আরব্য উপন্যাসের আলাউদ্দীন যেমন অনেক অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, মশ্‌তান সা তেমনি অসংখ্যাসংখ্য অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া তৎসাময়িক লোকদিগকে বিস্ময় সাগরে নিঃক্ষেপ করিতেন। পথ দিয়া চলিয়া গেলে ছোট ছোট বালকেরা তাঁহার পশ্চাত পশ্চাত দলে দলে দৌড়িয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে বলিত "সা সাহেব! সা সাহেব! বোম্বায়ের দশটা পাকা আম খাওয়াও।" সা সাহেব, ছোট ছোট বালকদিগকে বড় ভাল বাসিতেন, কিন্তু তখন পৌষ মাস, সুপক্ক আম্র ফল কোথায় পাওয়া যাইবে? শিশুরা ইতিপূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল, মশ্‌তান সা ইচ্ছা করিলে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল প্রভৃতি যে কোনও স্থান হইতে যে কোনও পদার্থ আনিয়া বা আনাইয়া দিতে পারে। অনেকক্ষণ হাসি খুসী করিয়া, মশ্‌তান সা আকাশের দিকে নয়ন

নিক্ষেপ পূর্ব্বক, "হজ্‌রৎ" "হজ্‌রৎ" "হজ্‌রৎ" বলিয়া তিনবার বিকট চিৎকার করিতেন, দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে আকাশ হইতে ভূতলে পাকা আম পড়িয়া যাইত। এই রূপে তাল, খর্জ্জুর, দ্রাক্ষা, আম, আনারস প্রভৃতি কত প্রকার ফল আনাইয়া শিশুদিগকে খাওয়াইতেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল অলৌকিক ক্রিয়া সম্ভূত ফল, তাঁহাকে কেহ কখন খাইতে দেখে নাই, তিনি অপরকে দিতেন, নিজে কখনও খাইতেন না। তাঁহার লম্বা দাড়ী ছিল, মাথার চুল খুব পাৎলা, অনেক স্থানে টাক পড়িয়া গিয়াছিল। গলা হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত শার্দ্দুল চর্ম্মের তৈয়ারী অপরূপ "চোগা", কোমরে গৈরিক বসনের বহির্ব্বাস, গলায় বড় বড় স্ফটিকের মালা এবং মাথায় তুরস্ক দেশীয় লোহিত বর্ণের দীর্ঘাকার টোপি। স্কন্ধ দেশে কাল রঙ্গের প্রশস্ত ফিতা সহযোগে অতি ক্ষুদ্রাকার একখানি আরব্য কোরাণ সদাসর্ব্বদাই লম্বমান থাকিত। তাঁহার মাতৃভাষা উর্দ্দু; ধর্ম্ম বিশ্বাস ইসলামানুবর্ত্তী এবং আহার ব্যবহার মুসলমানের মত ছিল। তাঁহাকে কেহ কখন ছাতা বা লাঠি ব্যবহার করিতে দেখে নাই। তিনি কখনও রৌপ্য, সুবর্ণ বা তাম্র স্পর্শ করেন নাই। মশতান সা জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন, সুরাকে অতি ঘৃণিত পদার্থ বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল।

মশতান সার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তিনি অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন। রেলের সৃষ্টি হইবার পরে, একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনি একদা ট্রেণ যোগে স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। ভদ্রলোকটি পিপাসায় কাতর হইয়া উঠিয়াছিলেন, অথচ কোন ষ্টেশনেই জল প্রাপ্তির সুবিধা ঘটে নাই। অবশেষে তাঁহার আত্যন্তিক কাতরতা দেখিয়া মশ্‌তান বলিলেন "তোমার ঘটিতে জল রহিয়াছে, জল খাইতেছ না কেন?" ভদ্রলোক নিশ্চয় জানিতেন, তাঁহার ঘটীতে এক বিন্দুও জল ছিল না এবং জল দিবার অথবা জল আসিবার কোন উপায়ও ছিল না, কিন্তু সা সাহেবের অনুজ্ঞামত ঘটির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, অতি নির্ম্মল ও শীতল সলিলে তাঁহার ঘটি পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই রূপ অনেক সময়ে অনেক প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা

মশ্‌তান সা অনেককে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাকে কুঠুরির মধ্যে কয়েকবার কতিপয় লোকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু স্বল্প সময় পরেই দেখা গেল, তিনি প্রকাশ্য পথে পদচারণা করিয়া সমীরণ সেবন করিতেছেন!! তিনি কোনও রোগীকে ঔষধি দেন নাই অথবা ঔষধের ব্যবস্থা করেন নাই, তাঁহার শ্রীমুখের কথা (আশির্ব্বাদ) শ্রবণ মাত্রেই শত শত লোকের দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি আরোগ্য হইয়া গিয়াছিল। তিনি গুড়ের সরবৎ পান করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এবং এক স্থানে অধিক কাল বসিয়া থাকিতে সম্মত হইতেন না। একবার ট্রেণে ভ্রমণ করিতে করিতে সায়াহ্নের সময়ে রেলশকটখানি একটা ষ্টেশনে আসিয়া অপেক্ষা করিল; অতি দ্রুতপদে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া মশ্‌তান সা, "অজু" ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক, প্লাটফরমে নমাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। নমাজ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ড্রাইভার গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পথিকেরা মশ্‌তান সাকে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে চড়িয়া বসিতে বলিলেন, কিন্তু সে কথায় সা সাহেব কর্ণপাৎও করিলেন না। ইঙ্গিতের দ্বারা বুঝাইলেন, "এই গাড়ী এই ষ্টেশনে অতি শীঘ্রই আবার ফিরিয়া আসিবে, আমি আবার এই গাড়ীতে চড়িয়াই গন্তব্যস্থানে পৌছিব, তোমাদিগকেও ফিরিয়া আসিতে হইবে।" সাধুর কথা সত্য হইল; জানিনা, কি গোলযোগ বশতঃ, সেই গাড়ীর ড্রাইভার টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইয়া, গাড়ী ফিরাইয়া আনিলেন, সেই গাড়ীতেই আরোহন করিয়া মশ্‌তান সা তিন ঘণ্টা পরে আবার ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মশ্‌তান সার গায়ে বাঘের চামড়ার "চোগা" থাকিত, তাহার উপরে একখণ্ড পুরাতন ও ছিন্ন কৃষ্ণবর্ণের কম্বলখণ্ড ঢাকা থাকিত। তিনি টাকা কড়ি বা পয়সা স্পর্শ করিতেন না, কিন্তু কাহাকেও কিছু দিবার আবশ্যক হইলে—যাহা কিছু দিবার আবশ্যক হইত—কম্বল নাড়িলেই ঠিক তাহাই ভূতলে পতিত হইত। লোকে ভাবিয়া ছিল, ঐ ছেঁড়া কম্বলের ভিতর টাকা লুকান থাকে। সহস্র লোকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, ইহাতে একটি পয়সাও ছিল না।

সা সাহেবকে দেখিলে ৫০ বৎসর বয়স্ক বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত বয়স কত ছিল কেহ তাহা কখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই।

তাঁহার কোথায় জন্ম হইয়াছিল অথবা কোথায় তিনি সমাধিস্থ হইয়াছেন তাহাও অদ্যাপি কেহই জানে না। তাঁহার শরীর কৃশ কিন্তু খুব দৃঢ় ছিল।

মশতান সাহেবের সর্ব্বাপেক্ষা অলৌকিক ক্রিয়া এখনও জগতে অকিদিত। আধ্যাত্মিক তেজে তেজীয়ান মহাপুরুষ দিগের অসামান্য লীলাবলী যদি সকল মানুষেই বুঝিতে পারিত তাহা হইলে জগতের এত দুর্গতি থাকিত কি? খৃষ্টীয় ১৮৫৬, ১৮৫৭ এবং ১৮৫৮ এই তিন বৎসর ব্যাপিয়া ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র শস্ত্রধারী সিপাহীবৃন্দ এবং তাহাদের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষকবর্গ যে মহাভীষণ বিদ্রোহাগ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছিল, মশতান সা, দেওশর্ম্মাজী, দেবানন্দ, হরকিশোর প্রভৃতি "মহাত্মাগণ" (অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, দরবেশ, পরমহংস প্রভৃতি মহাপুরুষেরা) ইংরেজের সহায় না থাকিলে, বৃটিশ বিক্রমসূর্য্য এতদিনে অতীতের স্মৃতি মেঘে লুকাইয়া যাইত। আধ্যাত্মিক সামর্থবলে, যোগশক্তির সহায়তায় এই সকল মহাত্মারা এক স্থান হইতে অপর স্থানে মুহূর্ত্ত মধ্যে গমন করিয়া ইংরাজ সমরনায়কদিগকে বিপদের বিবরণ জানাইয়া দিতেন এবং বিপক্ষবর্গের গতিবিধির সংবাদ দিতেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত ইংরাজ ইহাদিগকে চিনিতে পারেন নাই; নানা সময়ে নানা বেশে, অতি আশ্চর্য্য ভাবে, এবং এমন অল্প সময় মধ্যে কার্য্য সমাধা করিয়া এই সকল মহাত্মা ইংরাজ শিবির হইতে অদৃশ্য হইতেন যে, সমর বিভাগের লোকেরা তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। মহাত্মারা যোগবলে জানিতে পারিয়াছিলেন, ইংরাজের হস্ত হইতে রাজ্য গেলে, ভারত একেবারে উচ্ছন্ন যাইবে, ইংরাজের সহিত ভারতের সংস্রব এখনও বহুবর্ষ ব্যাপিয়া অক্ষুণ্ণ রাখা আবশ্যক।

মশ্‌তান সা একজন প্রকৃত মহাপুরুষ ছিলেন, তিনি একজন "সিদ্ধপুরুষ" রূপে মানব সমাজে দেখা দিয়াছিলেন। কালে সকলই ফুরাইতেছে, এখন সেকালের মত মহানুভবেরা আর দর্শন দেননা, এখন মশ্‌তান সার মত একটি "সিদ্ধ মহাপুরুষের" দর্শন লাভ করা কঠিন হইতেও কঠিনতর। ভারত ভাগ্যহীন; সৌভাগ্য বিনা কি মহাপুরুষের দর্শন স্পর্শন হইতে পারে?

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

রমণীর প্রাণ।

(তুলনা)

কোথা সেই ভারতের রমণীর প্রাণ ?
যে প্রাণে সারল্য আঁকা,
ছিল প্রেম প্রীতি মাখা,
ঝরিত পরের দুখে করুণ নয়ান;
কোথা সেই ভারতের রমণীর প্রাণ ?

কোথা সেই ভারতের রমণীর প্রাণ ?
যে প্রাণে আপনা ভুলি,
পর কাছে প্রাণ খুলি,
দেখা'ত হৃদয়রাজ্যে স্বরগ সোপান;
কোথা সেই ভারতের রমণীর প্রাণ ?

কোথা সেই ভারতের রমণীর প্রাণ ?
যে প্রাণ দয়ায় ভরা,
মমতার মোমে গড়া,
পরহিত ব্রতে দিত আত্ম বলিদান;
কোথা সেই ভারতের রমণীর প্রাণ ?

কোথা সেই ভারতের রমণীর প্রাণ ?
যে প্রাণে দেবতা জ্ঞানে,
পূজিত জগত জনে,
সুর পুরবাসিগণ করিত সম্মান;
কোথা সেই ভারতের রমণীর প্রাণ ?

কোথা সেই ভারতের রমণীর প্রাণ ?
যে পরাণে পবিত্রতা,
ছিল প্রীতি প্রফুল্লতা,—
পুণ্য জ্যোতির্ম্ময় চির নির্ম্মল বয়ান;
কোথা সেই ভারতের রমণীর প্রাণ ?

কোথা সেই ভারতের রমণীর প্রাণ ?
যে প্রাণ পরের দুখ,
নিয়েছে পাতিয়া বুক,
অম্লান বদনে ভুলি আপনার জ্ঞান;
কোথা সে অমৃতময় রমণীর প্রাণ ?

কোথা সেই ভারতের রমণীর প্রাণ ?
যে প্রাণ পুলকে মাতি,
গাহিত স্বরগ—গীতি,—
উঠিত গগনভরি সুমধুর তান;
কোথা সেই ভারতের রমণীর প্রাণ ?

কোথা সেই ভারতের রমণীর প্রাণ ?
যে পরাণ প্রফুল্লিত,
সুর পারিজাত মত,
ছড়া'ত সৌরভ কত অমৃত মাখান;
কোথা সেই ভারতের রমণীর প্রাণ ?

কোথা সেই ভারতের রমণীর প্রাণ ?
প্রজ্জ্বলিত চিতানলে,
যে প্রাণ অবাধে ঢেলে,
লভেছিল স্বরগের সর্ব্ব উচ্চস্থান;
কোথা আজি সে পবিত্র রমণীর প্রাণ ?

শ্রীমতী মৃনালিণী গুপ্তা।

আস্তিক ও নাস্তিক মত।

"নাস্তি" (নাই) যদি বল তবে রবে না বালাই
"আছে" যদি বল, তার সব বুঝা চাই।

মহাত্মা আস্তিকের মত,—'এবমস্তি' অর্থাৎ 'এই সৃষ্টি ও ঈশ্বর আছেন।' বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্রের দ্বারা যাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

মহাত্মা নাস্তিকের মত,—"এবমনাস্তি" অর্থাৎ "সৃষ্টি ও ঈশ্বর অথবা কোনও কিছুও নাই।" চার্ব্বাক্, গৌতম প্রভৃতি ঋষি প্রমুখ মহাত্মাগণ যে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে উভয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতেছেন। সুতরাং উহার মীমাংসা আসিবে কিরূপে ? কিন্তু জগতের সমুদয় কার্য্যই যখন আলো-আঁধার রূপ দুইটি বৈষম্য ভাব দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে তখন ইহারও মীমাংসা থাকিবে। সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ গ্রন্থ রচয়িতা মহর্ষি বাল্মিকী লিখিয়া গিয়াছেন। "শীলা তরতি পানীয়ং গীতং গায়ন্তি বানরাঃ।" কিন্তু পরবর্ত্তী পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাত্মা চাণক্য এবং কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর; সর্ব্বসাধারণে প্রচার করিয়াছেন যে,

"ঐরূপ বাক্য কখনও মুখের বাহির করিবে না। কারণ উহা সম্পূর্ণ রূপে অবিশ্বাস্য।"

এখন ভাব দেখি কাহার বাক্যে আস্থা বা অনাস্থা প্রদর্শন করিবে ? একটু ভাবিয়া দেখিলে সহজেই ইহার মীমাংসা আসিতে পারে। চাণক্য এবং ভারতচন্দ্র সকলকে কার্য্য-কারণ বা কাল, দেশ পাত্র বিবেচনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যে স্থলে ক্ষুদ্র বীজটিতে বৃহত্তর বৃক্ষের অস্তিত্ব (অবস্থিতি) জানা যাইতেছে হয়ত সেইরূপ স্থলে জলেও প্রস্তর ভাসিতে পারে। কিন্তু উহা সর্ব্বত্র সকল সময়ে সকল অবস্থায়ও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তজ্জন্যে সর্ব্বত্র বা সকলের পক্ষে উহা বিশ্বাস যোগ্যও হইবে না। অধিকন্তু; যাহাকে নিজে প্রত্যক্ষ দ্বারা আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা গিয়াছে তাহাকে অপরে অপ্রত্যক্ষ জনিত অধিকতর আশ্চর্য্য বোধ বা সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করিবে, ইহাতে সন্দেহ কি ? সুতরাং সাধারণের নিকটে হাস্যাস্পদ হওয়াপেক্ষা সেরূপ স্থলে বরং মহামতি তুলসীদাসের "সব্‌সে ভালা চুপ" এই উপদেশ বাক্যটি রক্ষা করাইত কর্ত্তব্য। যাহাই হউক, একণার যেন মীমাংসা জানা গেল। কিন্তু মহাত্মা আস্তিক এবং নাস্তিকদিগের মতের মীমাংসা আছে কি ? আস্তিকগণ বলেন,—"তুমি-আমি কিম্বা তোমার-আমার এইরূপ জ্ঞান যখন আছে; তখন কার্য্য এবং তৎকারণ স্বরূপে সৃষ্টি এবং ঈশ্বর অবশ্যই আছেন।"

আরো কিছু বিস্তার করিয়া বলিতে গেলে এইরূপ বলিতে হয় আমি জানিতেছি যে অথবা আমার জ্ঞান-বিশ্বাস যে আমি আছি অর্থাৎ মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত প্রভৃতি; অন্তর্দাহ— জ্ঞানেন্দ্রিয় সমন্বিত এবং উৎসাহ চেষ্টা বিরতি রূপ ত্রিবিধ কর্ম্ম যুক্ত আমার এই দেহ (আকৃতি) যাহা বর্ত্তমান সময়ে (এইমাত্র) তোমার, আমার, তাঁহার সকলেরই দৃষ্টির (সুস্পষ্ট জ্ঞানের) বিষয়ীভূত তাহার অস্তিত্বে কাহারো সন্দেহের কোন কারণ কোথায় ? 'আমার দেহ আছে', যখন ইহা স্বীকার করা যাইতেছে তখন আমিও (দেহী) আছি, নতুবা দেহের পরিচয় পাই কি রূপে ? অতএব আমার দেহ এবং আমি চিরকালই আছি এবং থাকিব। শীত-গ্রীষ্মাদি চিরকালই অনুমিত হইতেছে। কারণ যে একটিবার (এখন) থাকিলে বারম্বার কিংবা

চিরকালই থাকিব। অথবা আমাদের পরিবর্ত্তন ঘটিলেও, দেহের সহিত আমার বা আমার সহিত দেহের চির সম্বন্ধ কখনই অপনীত হইতে পারিবে না। জল-দেহ শুকাইয়া গিয়া অথবা জমাট বাঁধিয়া, পুনরায় বাষ্প কিংবা বরফ-দেহেই পরিণত হয়। সুতরাং দেহের সহিত জলের ক্ষণ মাত্রও বিচ্ছেদ হইতেছে না। উভয়ের কেবল পরিবর্ত্তনই ঘটিতেছে (জ্ঞান করা যাইতেছে)। আমার দেহ কিংবা আমি যদি থাকিলাম আমাদের কার্য্য-প্রয়োজন-ইচ্ছাও থাকিবে। নতুবা, আমাদের সিদ্ধি পাইবে কি? বিশেষতঃ পদার্থের অস্তিত্বদ্বারা তাহার স্থায়ীত্ব এবং স্থায়ীত্বের দ্বারা ক্রিয়া গুণ (সম্পূর্ণ অবস্থা) বিকাশ পাইয়া থাকে। কার্য্য প্রকাশ দ্বারাই কর্ত্তা ব্যক্ত হইতেছেন। ফলতঃ আমার দেহকে বা আমাকে প্রকাশ করিয়া আমাদের কর্ত্তা ঈশ্বরও ব্যক্ত হইতেছেন। অতএব, সৃষ্টি এবং ঈশ্বর আছেন" ইহাই মহাত্মা আস্তিকের মত।

কিন্তু নাস্তিকগণ বলিতেছেন "তোমার, আমার, তাঁহার বা সকলেরই আত্মা (প্রাণ বা ঈশ্বর) নিত্য অর্থাৎ অবিনাশী। তাঁহার আবির্ভাব, বিদ্যমান, তিরোভাব অর্থাৎ থাকা না থাকা কোনও রূপ অবস্থা প্রাপ্তি জ্ঞান করা যায় না। যিনি সদা কাল স্বরূপ,— অথবা সর্ব্বব্যাপী তাঁহাকে তুমি, আমি, তিনি প্রভৃতি কোন রূপ উপাধিই দেওয়া যাইতে পারে না। এবং অসীমের স্থায়ীত্ব অসীমত্বে ব্যতিত যে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে কিংবা পাত্রে কল্পনা করা যাইতে পারে না। সীমাবদ্ধ জগতে (উৎপত্তি দ্বারা যে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে) অসীম আত্মার বা ঈশ্বরের স্থায়ীত্ব সঙ্কুলন হইবে না। এ নিমিত্তই তিনি অসিদ্ধ '[ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ]' অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বে কোন প্রমাণ [প্রকৃষ্ট জ্ঞান] নাই। সৃষ্টি, কিংবা তুমি, আমি বলিতেও কেহ নাই। সমস্তই স্বভাব অর্থাৎ নিত্য বা আবহমান।" ইহাই মহাত্মা নাস্তিকের মত। এখন ভাব দেখি "তুমি-আমি কিংবা তোমার-আমার" এই যে স্পষ্টতঃ জ্ঞান আসিতেছে, এই প্রত্যক্ষিভূত বিষয়টিও কি স্বপ্নবৎ অলীক বা কল্পনা প্রসূত বুঝিতে হইবে? দেখা যাউক শাস্ত্রের দ্বারা ইহার মীমাংসা কিরূপ দাঁড়ায়। তন্ত্র শাস্ত্রে এই দুইটি মতের এইরূপ মীমাংসা প্রাপ্ত হইতেছি। যথা;—

"দিবা ন পূজয়েদ্দেবীং রাত্রৌ নৈবচ নৈবচ।
সর্ব্বদা পূজয়েদ্দেবীং দিবা-রাত্রৌ ন পূজয়েৎ॥"

তাৎপর্য্যার্থ—"দেবী যিনি সগুণ ব্রহ্ম বা কার্য্য-কারণের সামঞ্জস্য কর্ত্রী [নিয়ন্ত্রী]। অথবা সৃষ্টির আদিকাল (১) স্বরূপে যাঁহাকে অনাদি-অনন্ত-অব্যয়-সদাশিব মহাকালের (নিত্য বা সর্ব্বদা কালের) মহিয়সী শক্তি বর্ণনা করা যাইতেছে, তাঁহাকে দিবা রাত্রি রূপ সংজ্ঞা দ্বারা ভেদ জ্ঞান করা অথবা কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় রূপে (অংশতঃ বা সামান্যাকারে) চিন্তা করিবে না।"

স্মৃতি এবং জ্যোতিষাদি শাস্ত্র নিম্নলিখিত রূপে উহা মীমাংসিত হইয়াছে।—

প্রতিদিন, দিবা রাত্রি ক্রমে (৬০ দণ্ডে) দ্বাদশটি রাশির (তেজের) উদয়াস্ত কাল নিরূপণ করা যাইতেছে। সমষ্টির অবস্থা বা অনন্ত কালের ক্রিয়াগুণ ব্যষ্টি ভাবের (সামান্যতঃ) জ্ঞান দ্বারা সম্যক প্রকারে অবগত থাকা যায় না অর্থাৎ যুগপৎ সমষ্টির অবস্থা জানা যাইতে পারে না, এজন্য তাঁহাকে (অনন্ত কালকে) দ্বাদশটি রাশির আকারে (২) বিভিন্ন সংজ্ঞা দ্বারা সীমা বদ্ধ বা

(১) সৃষ্টি আবহমান বিধায়, সৃষ্টির আদি কালটিও কোনও নির্দ্দিষ্ট রূপে সীমা বদ্ধ নয়।

(২) আকৃতি না থাকিলে কিছুরই চিন্তা আসিতে পারে না। কেহ কেহ প্রশ্ন করেন যে;—"বায়ু এবং আকাশের আকৃতি কি?" বায়ু— আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। অর্থাৎ; স্পর্শেন্দ্রিয়ই তাহার ক্রিয়াগুণ অনুভব করিয়া থাকে। যাহাতে ক্রিয়াগুণ আছে; তাহাকেই আকৃতি বিশিষ্ট "পদার্থ" সংজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে। সুতরাং বায়ু কিংবা আকাশ আমাদের চাক্ষুষাদি অন্যবিধ প্রত্যক্ষে না আসিলেও তাহাদের আকৃতি নাই একথা কিরূপে স্বীকার করিব? বস্তুতঃ জ্ঞানের অগোচরে কিছুই নাই। আকাশ,—যদিও কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নয় তথাপি, কল্পনা-জগতে লুকাইতে পারিতেছে না। অর্থাৎ কল্পনা তাহার আকৃতি গড়িয়া লইতেছে। কল্পনার ত্রুটি কিংবা তাহাকে অলীক বুঝিলে পদার্থ-জ্ঞান আসে কি রূপে? বিশেষতঃ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ কৌশল ক্রমে উভয়েরই (বায়ু ও আকাশের) আকৃতি আবিস্কার করিতে এখন সমর্থ হইতেছেন।

পৃথক্ করা হইয়াছে। কোনও বিষয়ের সীমা নির্দ্ধারণ করিবার সময়ে তাহার আরম্ভকেই ধরা যায়; আদি নির্দ্দেশিত না হইলে, তাহার মধ্য কিংবা অন্ত নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না। অথবা তন্নিমিত্ত সমগ্র রাশি-মাণের সর্ব্বপ্রথম অংশটি কল্পনা করিয়া; তাহাকেই "মেষ" সংজ্ঞাটি দেওয়া গিয়াছে (১)।

অবশিষ্ট সমস্তের বৃষ-মিথুনাদি পর্য্যায় ক্রমে সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশটি সংজ্ঞা দেওয়া গিয়াছে। এবং সে সমস্তের নিরন্তর বৃত্তাকারে (২) পরিক্রমণ জনিত (৩) সমস্তের উদয়াস্ত কাল নিরূপা দ্বারা যথা ক্রমে "দিবা রাত্রি" সংজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে, কারণ একটিকে দিত হওয়ার পরে তাহার অস্ত গমন দ্বারা অন্যটি প্রকাশ পাইয়া থাকে, অথবা একটি অবস্থা প্রকাশ পাইলে তাহার পূর্ব্বের অবস্থাটির অভাব প্রতিপন্ন করা প্রকৃতির ধর্ম্ম (স্বভাব)। এনিমিত্ত মেষ রাশির প্রথম উদয় কালকে "দিবা" এবং তাহার অস্ত গমনের পর অব্যবহিত পরবর্ত্তী বৃষ রাশির উদয় কালকে "রাত্রি" সংজ্ঞা দিয়া সমুদয় রাশি-লগ্নমানকে পর্য্যায় ক্রমে "দিবা-রাত্রি সংজ্ঞায় বিভাগ করা গিয়াছে। উহার "দিবা-রাত্রি" রূপ সংজ্ঞা দুইটি ত্যাগ করিলে মাত্র সন্ধি কাল (সংযোগ স্থল) গুলিই অবশিষ্ট থাকে। সে সমস্ত এতই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম যে, নির্ণয় করা বড় সহজ নয়। প্রবাদ আছে যে;— "গো-শৃঙ্গোপরি সর্ষপটির অবস্থিতি কাল মাত্র দেবী (সন্ধিকালটি এক স্থিরভাব) আবির্ভূতা থাকেন।"

ক্রমশঃ।

শ্রীরমদারঞ্জন মিত্র।

---

(১) মেষ সংজ্ঞাটি দিবার অন্যবিধ কারণ থাকিলে তাহা জ্যোতিষ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

(২) অংশ সমস্তের অবিচ্ছেদে স্থায়ীত্ব দ্বারা, বৃত্তাকার কল্পিত হয়।

(৩) জগতেই স্থির ভাবটির অস্তিত্ব নাই।

পিসী মা।

কলিকাতায় মার এক পিসী ছিলেন। তিনি আমাদের বড় ভাল বাসিতেন। মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ী আসিতেন। আমরাও কলিকাতায় যাইলেই তাঁহার বাটিতে আশ্রয় লইতাম। তাঁহার অনেক টাকা ছিল। কি সূত্রে যে তিনি এই টাকা পাইয়াছিলেন তাহা আমরা ঠিক জানি না। কেহ কেহ বলিত, তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি এই টাকা পাইয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলিত তাঁহার পিতা মৃত্যু কালে তাঁহাকে অনেক টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি যে সূত্রেই এই টাকা পাইয়া থাকুন না কেন তাহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে তাহার অনেক টাকা ছিল এবং তদুপযুক্ত অনেক সদানুষ্ঠানও ছিল। বহুসংখ্যক পতি পুত্রহীনা রমণীকে তিনি অন্ন দিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরো অনেক প্রকার দানধ্যান ছিল। মার পিসীকে ছেলে বেলা হইতে আমিও পিসী বলিয়া ডাকি। পিসীর বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হইবে; কিন্তু এখনও তাঁহার দেহ বেশ সবল আছে।

কোন কারণ বশতঃ এক সময় আমি কলিকাতায় আসিয়া প্রায় মাসাবধি কাল পিসীর বাটীতে থাকি। একদিন দুপুর বেলা আমি উপরের একটি ঘরে খাটে শুইয়া আছি, আর পিসী মেজেয় বসিয়া মহাভারত পড়িতেছেন। এমন সময় একজন ভিক্ষুক "মা, দুটি ভিক্ষে পাই গো মা?" বলিয়া চিৎকার করিল। পিসী নিজেই সকলকে ভিক্ষা দিতেন। চিৎকার শুনিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। আমি পূর্ব্ববৎ খাটেই শুইয়া রহিলাম। কিছু পরেই যেন শুনিতে পাইলাম কে জিজ্ঞাসা করিতেছে, হ্যাঁ গা, তোমার কি করুণা বলে একটি বোন ছিল গা? গলার স্বরে বুঝিলাম ভিক্ষুকই এই প্রশ্ন কর্ত্তা। পিসী যেন বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, হ্যাঁ, ছিলো। তা সে কথায় তোমার দরকার কি?

ভিক্ষুক—না; তাই বলি, তাই বলি। তোমার কি নীরোদ বাবু ব'লে কোন ভাই ছিলো?

পিসী। হ্যাঁ, ছিলো। তা কি হয়েছে? তোমার তাতে কি দরকার? তুমি ভিক্ষে করিতে এসেছ, ভিক্ষে নিয়ে চলে যাও।

ভিক্ষুক। না, তাই বলিতেছি। তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন। যে তাঁর সঙ্গে একবার আলাপ ক'রেছে সে কি আর তাঁহাকে ভুলিতে পারে! হ্যাঁ গা, তিনি কি ক'রে মারা গেলেন গা? শুনেছি কে নাকি তোমার ভাইকে আর বোনকে খুন করেছে। সত্য কি গা? আহা, নীরদ বাবু বড় ভাল লোক ছিলেন!

পিসী। তুমি সে সব কথা কি করে জান্‌লে? কে তোমাকে বলেছে। যা'হোক তুমি চ'লে যাও আর ওসব কথা ব'লে আমাকে জ্বালাইও না।

ভিক্ষুক। যে মেরে ফেলেছে আমি তার কাছ থেকে শুনেছি। সেই আমাকে ব'লেছে।

পিসী। কি বল্লে, যে মেরে ফেলেছে তার কাছ থেকে শুনেছ! তবে কি সে নর ঘাতক আজও জীবিত আছে!

ভিক্ষুক। আছে, সে মৃত্যু শয্যায় শুয়ে আছে। তার অন্তিম কাল উপস্থিত। সেই আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। জিজ্ঞাসা করিয়াছে—যদি তুমি আমাকে ক্ষমা কর তবেই সে শান্ত চিত্তে মরিতে পারে, নতুবা তার মরিয়াও সুখ নাই। তোমার উত্তর শুনিবার জন্যই এখনও তাহার শ্বাস বহিতেছে।

পিসী। আমার উত্তরের প্রতীক্ষায় সে এখনও জীবিত আছে! সে পাষাণ আমার নিকট কি উত্তর প্রত্যাশা করে? তুমি তাহাকে বলিও সমস্ত জগতের বিনিময়েও আমি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিব না। নর-ঘাতকের আবার ক্ষমা কিসের! সে কি জানে না যে একটি বাণে সে তনটি প্রাণীর প্রাণ হনন করিয়াছে। আর আমি তো বজ্রাহত শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় দণ্ডায়মান আছি মাত্র। সর্ব্বদা রাবণের চিতা বুকে ধরিয়া বেড়াচ্ছি তাহা কি সে জানে না!

ভিক্ষুক। সে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। একটু কৃপা কর। অনুতপ্ত হৃদয়কে ক্ষমা কর।

পিসী। ক্ষমা, ক্ষমা। তা কখন পারব না। প্রাণ থাক্‌তে পারব না।

ভিক্ষুক। সে বড় কষ্ট পাইতেছে। তোমার নিকট ক্ষমা চাহিয়া পাঠাইয়াছিল, তুমি তাহাকে ক্ষমা করিলে না। একটি মুখের কথাতেও তাহাকে শান্ত করিলে না। জানিও অনুতপ্ত হৃদয়কে ভগবানও ক্ষমা করেন। সে আর তোমার নিকট ক্ষমা চায় না। বিশ্বপতি তাহাকে ক্ষমা করিবেন। এখন সে নরঘাতককে দেখিতে চাও? দেখ, সে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। চিনিতে পারিতেছ না? আমিই সেই—মহেন্দ্র।

পিসী। নরহত্যা! নরহত্যা!! খুন! খুন!! কে কোথায় আছ দৌড়িয়া আইস। শীঘ্র আইস। খুন! খুন!! নরঘাতক! নরঘাতক!! ম'লাম! ম'ল্যাম!! খুন! খুন!!

এই চিৎকার শুনিয়া আমি দৌড়িয়া আসিলাম। আমার নামিয়া আসিতে মিনিট ২।৩ লাগিয়াছিল। আসিয়া দেখিলাম পিসী মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া আছেন। আমি মুখে জলসিঞ্চন করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার সংজ্ঞা হইল। ধরাধরি করিয়া ঘরে লইয়া গিয়া শোয়াইলাম।

দুই চারি দিবসের মধ্যে পিসী বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। সে দিবস এই ঘটনা দেখিয়া অবধি ইহা জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছিল। এক দিবস কথায় কথায় আমি পিসীকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার নিকট বিশেষ কিছুই জানিতে পারিলাম না। পিসী আমার নিকট গোপন করিলেন দেখিয়া ইহা জানিবার জন্য আমার কৌতূহল দ্বিগুণিত হইল। সপ্তাহ কাল পরেই আমি বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

এই রহস্যোদ্ঘাটন করিবার জন্য আমার মন বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিল। আজ দুইদিন হইল বাড়ীতে আসিয়াছি। মার নিকট এই প্রসঙ্গোত্থাপন করিতে এখনও অবসর পাই নাই। অদ্য আহারাদি করিয়া শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছি। এমন সময় দেখি মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া সাংসারিক নানা কথার উত্থাপন করিলেন। তাঁহার কথা সমাপন হইলে আমিও আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার সুযোগ পাইলাম। পিসীর বাটীতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহার আদ্যপান্ত

সমস্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম; "মা! আমি এই রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছি না। সবিশেষ জানিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া মা বলিলেন, "বুঝিয়াছি;—সে অনেক কথা। তুমি কি তাহা জান না? আচ্ছা শোন। পিসীরা দুই বোন, এক ভাই। পিসীর নাম যমুনা, পিসীর বোনের নাম করুণা আর ভাইটীর নাম নীরদবরণ। পিসী সকলের বড়, পিসীর কোলে নীরদ, নীরদের কোলে করুণা। পিসীর বাপ যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতায় এক সাহেবের আফিসে চাকরী করিতেন। মাসে বেশ দশ টাকা উপার্জ্জনও করিতেন। পিসী এখন যে বাড়ীতে আছেন উহা তাঁহার বাপেরই বাড়ী। ওই বাড়ীর পাশে শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নামে কোন এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। শিবনারায়ণ বাবুর মহেন্দ্র নামে এক পুত্র ছিল। সে করুণার ক্রীড়া সহচর। করুণাতে তাহাতে আড়াই বৎসরের ছোট বড়। বালক বালিকা উভয়ে উভয়কে বড় ভাল বাসে। ক্রমে যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে সে ভালবাসা গাঢ় হইতে লাগিল।

যদু বাবু মহেন্দ্রের সহিত করুণার বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন, শিবনারায়ণ বাবুও সম্মত হইলেন। তবে বলিলেন, 'আর বছর দুই না গেলে আমি এখন মহিনের বিয়ে দিব না।' কথাবার্ত্তা সমস্ত ঠিক হইয়া রহিল। আর দুই বৎসর পরে মহেন্দ্রের সহিত করুণার বিবাহ হইবে।

"দুঃখের বিষয়, ইহার তিন মাস পরেই শিবনারায়ণ বাবু বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিলেন। মহেন্দ্রকে চারি বৎসরের রাখিয়া তাহার মা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। স্ত্রী বিয়োগে শিশু মহেন্দ্রের সমস্ত ভারই শিবনারায়ণ বাবুর উপর পড়ে। মহেন্দ্র ব্যতীত এসংসারে শিবনারায়ণ বাবুর আর কেহ ছিল না। মহেন্দ্রই বৃদ্ধের একমাত্র সংসার বন্ধন। অনেকগুলি পুত্র সন্তান মারা যাওয়ার পর বৃদ্ধ বয়সে মহেন্দ্রকে লাভ করেন, কাজেই মহেন্দ্র বড় আদরের। মহেন্দ্রকে এক মুহূর্ত্তও চক্ষের আড়াল হইতে দিতেন না।

"শিবনারায়ণ বাবুর অনেক দেনা পত্র ছিল। কাজেই তাঁহার মৃত্যুর পর বাড়ী ঘর সমস্তই বিক্রয় হইয়া গেল। যদুনাথ বাবু মহেন্দ্রকে বাড়ীতে

রাখিয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র প্রায় এক বৎসর কাল যদু বাবুর বাড়ীতে থাকিল। পরে ধনোপার্জ্জন তৃষ্ণা বলবতী হইয়া উঠাতে পশ্চিম যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইল। মহেন্দ্র পশ্চিম যাত্রা করিবে শুনিয়া করুনা বড়ই বিমর্ষ হইল। সে দিন দিন শুখাইয়া যাইতে লাগিল। পশ্চিম যাত্রা করিবার পূর্ব্ব দিন রাত্রে মহেন্দ্র করুণার সহিত সাক্ষাৎ করিল।

করুণা মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল; শুনিতেছি কাল না কি তুমি পশ্চিমে যাইবে?

মহেন্দ্র। দেখ, করুণা! তোমার পিতা আমার সহিত তোমার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। তুমি ধনীর কন্যা। চিরকাল সুখে পালিত। দুঃখ কাহাকে বলে জাননা। আমি দরিদ্র, আমার সহিত তোমার বিবাহ হইলে তোমাকে অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। তুমি আমার হাতে পড়িয়া দুঃখ পাইবে ইহা ভাবিলে আমি অস্থির হইয়া পড়ি। আমার পিতার একজন বিশেষ—বন্ধু এলাহাবাদে রেল আফিসের বড় বাবু। তাঁহাকে ধরিলে নিশ্চয়ই একটি চাকরী পাইব। আর কতদিন অন্যের গলগ্রহ হইয়া থাকিব? অবশ্য তোমার পিতা আমাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে যত্ন করেন। আমিও তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি। তবে নিজের অবস্থা পরিবর্ত্তনের কি চেষ্টা করা উচিত নয়? আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে আমি তোমাকে বিবাহ করিব না। তোমাকে দুঃখ দেওয়া আমার অভিপ্রেত নহে। আমার নিজেরই অন্নসংস্থান নাই, এ অবস্থায় আমি তোমাকে কি করিয়া বিবাহ করি?

করুণা। তুমি আমার জন্য ভাবিতেছ কেন? তোমার সঙ্গে থাকিতে পাইলে আমি একবেলা একমুঠা খাইয়াও সুখে থাকিতে পারিব। আর তোমরা পুরুষ মানুষ তোমাদের ভাবনা কিসের। এখানে চেষ্টা করিলে কি আর একটা চাকরী জুটিবেনা।

মহেন্দ্র। না, করুণা। আর আমি অপেক্ষা করিতে পারি না। অপরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে আমার আর এক মুহূর্ত্তও ইচ্ছা নাই। পশ্চিমে যাইলে আমার চাকরীলাভের নিশ্চয়তা আছে। কিন্তু কলিকাতায় চেষ্টা করিলে চাকরীলাভ ঘটিবে কি না কে বলিতে পারে? তুমি কি ইচ্ছা কর না যে আমি আমার অবস্থার উন্নতি করি!

করুণা। তাহা আর ইচ্ছা করি না? তোমার উন্নতি হইবে ইহা কি আমার অসাধ? তবে— আর বলিতে পারিল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। মহেন্দ্রনাথ করুণার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "ছিঃ অমন ক'রে কাঁদিতে আছে! তোমাকে সুখী করিবার জন্যই তো বিদেশে যাইতেছি। যদি তোমার চক্ষের জল না মুছাইতে পারিলাম তবে আর আমার বিদেশ যাইয়া ফল কি!" করুণা বাষ্পগদ্গদ স্বরে বলিল; "বিদেশে যাইলে যদি তোমার উন্নতি হয় তাহাতে কি আমি বাধা দিতে পারি? তবে বলিতেছিলাম সেখানে গিয়া হয় তো আমাদের ভুলিয়া যাইবে। আর কতদিন তোমার দেখা পাইব না!" মহেন্দ্র করুণার চিবুক ধরিয়া কহিল, "করুণা! তুমি কি আমাকে এতই অকৃতজ্ঞ ভাব যে আমি তোমাদের ভুলিয়া যাইব। আর বিশেষ তোমার কথা তো চিরকালের জন্য আমার স্মৃতিতে বিজড়িত হইয়া গিয়াছে। আমি প্রত্যহই তোমাদিগকে চিঠি লিখিব; প্রত্যহই আমার সংবাদাদি দিব। দুই তিন মাস পরেই সপ্তাহ কালের জন্য ছুটি লইয়া এখানে আসিব। আর আসিবার সময় তোমার জন্য কত নূতন নূতন খেলনা আনিব।" এইরূপে বালিকা করুণা দেবীকে শান্তনা দিয়া মহেন্দ্রনাথ কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে আজ এক বৎসর অতীত হইয়াছে মহেন্দ্রনাথ পশ্চিম যাত্রা করিয়াছেন। প্রথম প্রথম দুই একমাস বেশ রীতিমত চিঠি পত্রাদি লিখিতেন। এখন একশতখানি পত্র লিখিলেও একখানি উত্তর দেন না। অনেক চিঠি লেখার পর মধ্যে আজ প্রায় চারি মাস হইবে একখানি চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছিলেন তিনি সুস্থ আছেন, তবে ব্যস্ততা নিবন্ধন পত্রাদি দিতে পারেন নাই।"

যমুনা কখন কখন করুণাকে জিজ্ঞাসা করিত "আর মহিনের কাছ থেকে চিঠি আসছে না কেন?" করুণা উত্তর করিত, "তিনি ভাল আছেন। রোজ রোজ আর এক কথা কি লিখিবেন। ঈশ্বর না করুন, যদি কোন বিপদাদি ঘটিত তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই সংবাদ দিতেন। তিনি ভালই আছেন।" করুণা যদিও মুখে এই কথা বলিত, কিন্তু ভাবনায় তাহার অন্তরাত্মা দগ্ধ হইতেছিল।

একদিন দুপুর বেলা দুই ভগিনীতে বসিয়া কথা কহিতেছেন। এমন সময় একজন চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, "বাহিরে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। তিনি হাত দেখিতে পারেন। আপনারা বলেন তো তাঁহাকে ডাকিয়া আনি।"

যমুনা বলিলেন, "আচ্ছা, তাঁহাকে ডাকিয়া আন। আমরা হাত দেখাইব।" চাকর চলিয়া গেলে করুণাকে বলিলেন, "একবার মহিনের খবরটা জিজ্ঞাসা করিলে হয় না?" করুণা কোন উত্তর দিলনা; কেবল দিদির মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুই ভগিনীই সন্ন্যাসীঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসী ঠাকুর করুণার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মা, তুই স্বাধ্বী—সতী। এজগতে তোর পুরস্কার হইবে না। দেতো মা, তোর হাতখানি দেখি।" সন্ন্যাসীজি অনেকক্ষণ ধরিয়া করুনার হাতখানি দেখিয়া মুখ বিকৃত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। যমুনা জিজ্ঞাসা করিল, "সাধুজী কি দেখলে।"

সন্ন্যাসী—"কি দেখবো আর। মায়ের আমার এখনও বিবাহ হয় নাই। যাঁহার সহিত বিবাহ হইবার কথা ছিল তিনি বিদেশে গিয়াছেন। সেখানে গিয়া তিনি অনেক ধনোপার্জ্জন করিয়াছেন। আগামী বৃহস্পতিবার তদ্দেশীয় কোন ধনী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে।"

সন্ন্যাসীঠাকুর যতক্ষণ কথা বলিতেছিলেন করুণা কাতরদৃষ্টে তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়াছিল। তাঁহার কথা শেষ হইতেই ধীরে ধীরে ভূমিতলে দৃষ্টি নত করিলেন। যমুনা বলিলেন, "সাধুজি, এর কি কোন উপায় নাই।"

সন্ন্যাসী—"ভগবানকে ডাক। যদি কোন উপায় থাকে তো তিনিই ক'রে দিবেন।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

কি অশুভক্ষণেই সন্ন্যাসীঠাকুর যদু বাবুদের বাটীতে আসিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী যাইবার পর এক দিনের জন্যও আর কেহ করুণার মুখে হাসি দেখিল না। সে মুখ যেন দিন দিন শুখাইয়া যাইতে লাগিল। অর্দ্ধস্ফুটিত

কুসুম তীব্র রৌদ্র তাপে কোরকেই শুখাইয়া গেল।

সপ্তাহ কালের মধ্যেই করুণার জ্বর হইল। জ্বর দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে বিকারে পরিণত হইল। অনেক বড় বড় ডাক্তার দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু জ্বর আদৌ উপশম হইল না। ডিলিরিয়ম হইল মাথা খারাপ হইয়া গেল। যা'তা' আবোল তাবোল বকে। একদিন গভীর রাত্রে হটাৎ চিৎকার করিয়া উঠিল, "তুমি সুখী হবে, হও। যাতে সুখী হও, তাই কর। আমাকে পায়ে ঠেলিবে, ঠেল। আমি তোমার সুখের পথে কণ্টক হইয়া থাকিতে চাহি না। আমি গেলে তুমি সুখে ঘরকন্না করিতে পার; আচ্ছা, আমি যাইতেছি।" এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এমন সময় হটাৎ একজনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে ধরিয়া ফেলিল; নতুবা আজ কি হইত কে বলিতে পারে!

প্রায় এক মাসকাল পরে জ্বরটা একটু কমিয়া আসিল। মাথার গোলমাল সারিয়া গেল। ক্রমে অনেকটা সুস্থ হইয়া আসিতে লাগিলেন। জ্ঞান হইল। তবে জ্বর একেবারে যাইতেছে না। আরো ১৫ দিন যাইল, কিন্তু জ্বর এখনও সম্পূর্ণরূপে গেল না। একদিন ডাক্তার বুক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ফুস ফুস খারাপ হইয়া গিয়াছে।

একদিন প্রাতে করুণা শুইয়া আছে। যমুনা পার্শ্বে বসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতেছে। এমন সময় চাকর আসিয়া যমুনার হাতে একখানি পত্র দিয়া গেল। পত্রখানি ডাকে আসিয়াছে। পত্রখানি পাঠ করিতে করিতে যমুনার ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কেমন যেন অস্থির হইয়া পড়িলেন। পত্রখানি রাখিয়া ব্যাকুলভাবে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ইত্যবসরে করুণা তাহা কুড়াইয়া লইয়া পাঠ করিল।

এলাহাবাদ

"শ্রীমত্যা যমুনা দেব্যা——তাং—

আপনার ভ্রাতা নীরদবরণ বাবুর দ্বারা আদিষ্ট হইয়া আমি এই পত্রখানি লিখিলাম। মহেন্দ্র বাবু এখানে আসিয়া একজন কণ্ট্রাক্টারের সহিত ভাগে কাজ করিতেছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন

করিয়াছেন; কিন্তু তিনি এক ধন উপার্জ্জন করিতে গিয়া অন্য ধন হারাইয়াছেন। তাঁহার চরিত্র কলুষিত হইয়াছে। সম্প্রতি একটী বিধবা বিবাহের আয়োজন করিয়াছেন। নীরদ বাবু এই কার্য্যে বাধা দিয়াছিলেন, এবং তাহার পরিণামে আজ তাঁহাকে হাঁসপাতালে বাস করিতে হইতেছে। তিনি বলিতেছেন আপনাদের যদি তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা থাকে তো পত্র পাঠ মাত্র শেষ দেখা দেখিতে আসিবেন। তাঁহার জীবন শঙ্কটাপন্ন।

নিবেদক—

শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু।"

পত্র পাঠান্তে তাঁহার মুখ প্রাবৃটকালের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় গম্ভীর হইল।

অদ্য রাত্রেই আবার তাঁহার জ্বর বৃদ্ধি হইল। এ জ্বর আর কিছুতেই কমিল না। তিন দিনের দিন মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত উঠিল। শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। যমুনাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "দিদি, আর বাঁচিব না। আমার সময় হইয়াছে। আমি চলিলাম। তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না, এই যাহা দুঃখ।" আর বলিতে পারিলেন না। নাভীশ্বাস আরম্ভ হইল।

যদু বাবু পুত্র কন্যার শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। আর বেশীদিন তাঁহাকে এযন্ত্রনা ভোগ করিতে হয় নাই। অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত জ্বালা যন্ত্রনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। মারা যাইবার সময় সমস্ত বিষয় সম্পত্তি যমুনাকে দান করিয়া যান। যমুনা ওরফে পিসী সেই অবধি এই সকল ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

—০:০:০—

প্রাচীন ভারতে হিন্দু চিকিৎসক।

যখন ভারতের স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তমিত হয় নাই, সেই পুণ্য দিনের আর্য্য-সভ্যতাসূচক চিকিৎসা বিষয় কিঞ্চিৎ বিবৃত হইতেছে। বর্ত্তমান অধঃপতিত ভারতের অবস্থা দেখিয়া প্রাচীন ভারতের সৌভাগ্যের ছবি হৃদয়পটে অঙ্কিত করা অসম্ভব।

পূর্ব্বকালে নরপালগণ, মন্ত্রণানিপুণ ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শ অনুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। দেশের সর্ব্ববিধ সুখ-সম্পৎ রাজার উপর নির্ভর করিত। গ্রাম, নগর ও জনপদ লইয়া রাজ্য, সেই রাজ্যের মঙ্গলেই রাজার মঙ্গল, নরপালগণের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা প্রজাপুঞ্জের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইত। প্রকৃতিবর্গ, রাজ-নির্দ্দিষ্ট শাসনপথের রেখা মাত্রও অতিক্রম করিত না; বর্ণধর্ম্মানুরূপ নিজ নিজ কার্য্যে অবহিত থাকিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিত।

রাজা মূর্ত্তিমান্ দেবতা বলিয়া বিবেচিত হইতেন, অশেষবিধ উপপ্লব হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করাই তাঁহার প্রয়োজন ছিল। স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে জাতীয়-জীবন ম্লান হইয়া পড়ে, উৎসাহ, তেজ, বিক্রম বিনষ্ট হয়, প্রতিভা সূচিত হয় না।

সংস্কৃত ভাষা এদেশের রাজভাষা ছিল, ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্য জ্যোতিষ, গণিত চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি সকলই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ভারতীয় স্বাতন্ত্র্য বিনাশের পর চিকিৎসা, দর্শন প্রভৃতি কোন বিষয়েই কোন প্রকার অবিনশ্বের উদ্ভব হয় নাই। সরস্বতীর নিভৃতোপাসক কালিদাসাদি মহাকবিগণের তিরোধানের পর বাগ্দেবীর কাব্য কাননের কমনীয় পাদপ আর মুকুলিত হয় নাই।

যে সকল গুণে এদেশবাসিগণ পৃথিবীতে শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছিলেন; শারীরিক বলের সহিত সেই আর্য্যোচিত গুণাবলী দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে।

প্রাচীনকালে এদেশের উন্নত মানব-শরীর, শৈল-সারসংঘাত-কঠিন ও কর্ম্মঠ ছিল। প্রকৃতি, এদেশবাসিগণের নিতান্ত অনুকূল থাকায় এদেশীয়েরা

সাহসী, বীর, কষ্টসহিষ্ণু, স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও দীর্ঘায়ু ছিলেন ও মেধাকারক অকাল মৃত্যু ছিল না,* সকলেই বৃদ্ধাবস্থায় কালে কবলিত হইত। অল্প, দুষ্ট ও সমাজের কর্ত্তব্য পরায়ণতা, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণ থাকায় প্রস্তাবেই তাঁহারা আর্য্য † পদবাচ্য হইবার সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। পৃথিবীতে যখন এইরূপ পুণ্য-স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, তখন মানব সমাজ, জ্বর অতীসার কাহাকে বলে জানিত না।

শস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন। প্রথমে সংগ্রাম হইতে শস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। জিগীষু রাজগণ, পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইলে এবং নানা প্রকার প্রহরণে আহত সেনার ব্রণ-সংরোপণ, ব্রণবন্ধন ও শোনিত স্রুতি নিবারণ প্রভৃতি চিকিৎসারাজন্য বৈদ্যের প্রয়োজন হয়॥

শস্ত্র-শাস্ত্র-প্রবীণ রাজা, সেনাদিগকে যেরূপ সমর বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিতেন তদ্রূপ মন্ত্রবিশারদ মন্ত্রী, অস্ত্রগ্রামকোবিদ সেনাপতি ও শল্য শাস্ত্র পারদর্শী বৈদ্যকে নিজ নিজ কার্য্যে নিয়োগ করিতেন।

গুরুগৃহে আয়ুর্ব্বেদার্থী শিষ্য। চিকিৎসা বিদ্যার্থী যথারীতি গুরু গৃহে বাস করতঃ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন।

শ্রৌতযুগের আয়ুর্ব্বেদাধিকারী চরিত্রবান্ ছাত্র। ব্রাহ্মণ ‡ ক্ষত্র বৈশ্যানামন্যতমনন্বয়বয়ঃ শীলশৌর্য্য-শৌচাচার-বিনয়শক্তি-বলমেধা প্রতি-

---

* উত্তর চরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রামরাজ্যে এক ব্রাহ্মণ তনয়ের মৃত্যু হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ মৃতপুত্র লইয়া রাজদ্বারে উপনীত হইলে; রাম শূদ্র তাপসের শিরশ্ছেদ করিয়া বিপ্রনন্দকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন।
"ন * * * অন্তরেণ প্রজাস্বকালমৃত্যুশ্চরতি" ইত্যুত্তর চরিতম্

† কুলং শীলং দয়া দানং ধর্ম্মঃ সতং কৃতজ্ঞতা,
অদ্রোহ ইতি যেষ্বেতান্ তান্ আর্য্যান্ সম্প্রচক্ষতে॥

‡ শ্রৌতযুগ অতীত হইলে যখন মনু প্রভৃতির বিধি অনুসারে দেশ শাসিত হইতে লাগিল, তদবধি ব্রাহ্মণের চিকিৎসাবৃত্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে। সেই সময় হইতে অম্বষ্ঠের (বৈদ্যের) উপর চিকিৎসার ভার অর্পিত হইয়াছে। স্মৃতি গ্রন্থে অম্বষ্ঠের সৈনাপত্য ও চিকিৎসা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রা...হ্বৌষ্ঠদন্তাগ্রং ঋজুবক্ত্রাক্ষিনাসং প্রসন্নবাক্‌চেষ্টং ক্লেশসহঞ্চ ...নয়েৎ অতোবিপরীতগুণং নোপনয়েৎ ॥ ইতি সুশ্রুতঃ

...যুগে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় শিষ্য, যিনি প্রসিদ্ধবংশে ...গ্রহণ করিয়াছেন এরূপ উপযুক্ত বয়স্ক, সুশীল, শৌচাচার বিনয়যুক্ত, বল, মেধা ও জ্ঞানান্বিত এবং যাহার জিহ্বা ওষ্ঠ ও দন্তাগ্র স্থূল নহে, যাহার মুখমণ্ডল, নয়নযুগল এবং নাসিকা সরল, যাহার বাক্য ও চেষ্টা প্রসন্ন, এইরূপ ক্লেশসহ ছাত্র আয়ুর্ব্বেদের অধিকারী বলিয়া গৃহীত হইত, ইহার বিপরীতগুণ ছাত্রকে অযোগ্য মনে করা হইত। কাহারও মতে গুণবান্ শূদ্র ও মন্ত্রবর্জ্জিত আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নে অধিকারী।

শিষ্যগণের আচরণ। শিষ্যগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেন, কষায় বসন তাহাদের পরিধেয় ছিল, উপাধ্যায়ের অনুমত অবস্থান, উপবেশন, গমন, শয়ন, ভোজন ও অধ্যয়নে বাধ্য হইতে হইত। সর্ব্বদা গুরুর প্রিয় ও হিতকার্য্যে রত থাকিতে হইত। এই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অন্তেবাসিগণের বিদ্যা নিষ্ফলা হইত।

শিক্ষণীয় বিষয়। ছাত্রগণ সংস্কৃত ভাষা রীতিমত শিক্ষা করিতেন, ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি যথানিয়মে অধীত হইত।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ——

শল্য তন্ত্র। আয়ুর্ব্বেদের যে অংশে শরীরে প্রবৃষ্ট নানাবিধ বাণ, কাষ্ঠ পাষাণ ও অস্থি প্রভৃতির আহরণের উপায়, উদরে মৃত শিশুর উদ্ধরণ, এবং ব্রণ-বিনিশ্চয় ও যন্ত্রশস্ত্র ক্ষারও অগ্নি প্রয়োগ প্রণালী লিখিত আছে। (Surgery) (১)

(২) শালাক্য তন্ত্র। কর্ণ, নয়ন, বদন ও নাসিকার পীড়ার প্রশমার্থ চিকিৎসা শাস্ত্র।

কায়চিকিৎসা (৩) (জ্বর অতীসারাদির চিকিৎসা) (৪) ভূত বিদ্যা, (দেবসুর গন্ধর্ব, পিশাচ প্রভৃতি ভূতাবেশ জনিত ব্যাধির প্রশমার্থ চিকিৎসা তন্ত্র।

(৫) কৌমার ভৃত্য (ধাত্রী বিদ্যা) midwifery। (৬) অগদ তন্ত্র—সর্পশৃগাল

প্রভৃতির বিষ চিকিৎসা (৭) রসায়নতন্ত্র—যে শাস্ত্রে বল বীর্য্য ও মেধাকারক ঔষধের বিষয় লিখিত হইয়াছে। (৮) বাজীকরণ তন্ত্র—যে শাস্ত্রে অল্প, দুষ্ট ও ক্ষীণরেতাদিগের পুষ্টি ও প্রহর্ষ জনক ঔষধ সকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদে রক্ত-সঞ্চালন প্রণালী শবচ্ছেদ, দ্রব্যগুণ নিদান-তত্ত্ব, রোগ-বিনিশ্চয়, চিকিৎসা তত্ত্ব প্রভৃতির বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নকারীর জ্ঞান কেবল চিকিৎসা শাস্ত্রেই সীমাবদ্ধ থাকিত না; তাঁহারা আবশ্যকীয় দর্শন, জ্যোতিষ, গণিতাদিও অধ্যয়ন করিতেন।

একং শাস্ত্রমধীয়ানো ন বিদ্যাচ্ছাস্ত্র নিশ্চয়ং;
তস্মাদ্‌বহুশ্রুতং শাস্ত্রং বিজানীয়াৎ চিকিৎসকঃ ॥

এক শাস্ত্র অধ্যয়নে শাস্ত্রে যথার্থ জ্ঞান হয় না, সুতরাং বৈদ্যকে বহুশাস্ত্রজ্ঞ হইতে হইত।

কৃতবিদ্য শিষ্যের প্রতি গুরুর উপদেশ বাক্য——

দ্বিজ গুরু প্রব্রজিতোপনতসাধ্বনাথাভ্যুপ গতানাং
আত্ম বান্ধবানামিব স্বভেষজৈঃ প্রতিকর্ত্তব্যং ॥

শিষ্যগণ! তোমরা দ্বিজ, গুরু, প্রব্রজিত সাধু, অনাথ ও শরণাগতকে আত্মবন্ধুবোধে স্বীয় ভেষজ দ্বারা তাহাদের রোগোপশম করিও।

এই প্রাচীন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এ দেশীয় অনেক বৈদ্য অদ্যাপি রোগশোক-সন্তপ্তকে ঔষধ দিয়া, শোকে সান্ত্বনা করিয়া তাহাদের হৃদয় শান্তির অমৃত প্রবাহে অভিষিক্ত করিতেছেন।

যস্তু কেবল শাস্ত্রজ্ঞঃ কর্ম্মস্বপরিনিষ্ঠিতঃ
সমুহ্যত্যাতুরং প্রাপ্য প্রাপ্য ভীরু রিবাহবং ॥ সুশ্রুতঃ

ভীরু ব্যক্তি সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যেরূপ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি কেবল শাস্ত্রজ্ঞ অথচ চিকিৎসা নিপুণ নহে সেও রোগী পাইয়া মোহ প্রাপ্ত হয়।

যস্তু কর্ম্মসু নিষ্ণাতো ধাষ্ট্যাচ্ছাস্ত্রবহিষ্কৃতঃ
স সৎসু পূজাং নাপ্নোতি বধঞ্চার্হতিরাজতঃ ॥

যে ব্যক্তি কেবল চিকিৎসা নিপুণ অথচ অবহেলায় শাস্ত্রজ্ঞান-বিরহিত সে সাধুসমাজে সম্মান প্রাপ্ত হয় না; প্রত্যুত রাজার বধার্হ।

ক্রমশঃ

শ্রীসারদাচরণ সেন কবিরত্ন।

সংক্ষিপ্ত সাহিত্য সমালোচনা।

সৎ-মা। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন প্রণীত। যোগীন্দ্র বাবু বয়সে নবীন হইলেও সাহিত্য সমাজে প্রবীন। ইনি এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী সমাজের বিবিধ চিত্র অঙ্কিত করিয়া বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার দিয়া আসিতেছেন। তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসই গার্হস্থ্য উপন্যাস। সৎ-মাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যোগীন্দ্র বাবু গার্হস্থ্য উপন্যাস রচনা করিয়া পূর্ব্বে যে যশ অর্জ্জন করিয়াছেন, সৎ-মায়ে তাহা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

মাহিষ্য-সিদ্ধান্ত। শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী প্রণীত। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত উত্তর নার্কণ্ডপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়া বিনা মূল্যে বিতরিত হইতেছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে মহাভারতী মহাশয় অশেষ যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ ঐক্যমত না হইলেও তাঁহার পরিশ্রমের সাফল্য আছে বলিয়া মনে করি।

শ্রীশ্রী.গৌরচন্দ্রোদয়। শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। গ্রন্থকার উদ্যোগী পুরুষ। তিনি মুর্শিদাবাদের নিভৃত প্রান্তে বসিয়া যে সাহিত্যসেবা করিতেছেন ও সাহিত্য বিস্তার কল্পে যত্ন করিতেছেন তজ্জন্য সাহিত্য-জগৎ কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থখানিতে গৌরলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

পরলোকগত সুরেশচন্দ্রসাহা প্রবর্ত্তিত।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত।

উৎসাহ।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

৫ম বর্ষ; { রাজসাহী, শ্রাবণ ১৩০৯ } ৯ম সংখ্যা।

মালতী।

১

দেখে চল ওগো, পতিতা মালতী—
যেওনা চরণে দলি।
সুরভি, সুষমা, ছাড়িয়া তাহারে
অকালে গিয়াছে চলি।
মাধবী নিশিতে হরষে ফুটিয়া,
গগণের পানে ছিল সে চাহিয়া,
বুক ভরা আশা হৃদয়ে লইয়া
সুখে পড়েছিল ঢলি।
আজি অভাগিনী পড়েছে তলায়
যেওনা চরণে দলি।

২

মলয় অনিল শত ভালবাসা
দিয়াছিল আহা তারে!
ভিখারীর মত দাড়াইয়াছিল
একাকী তাহার দ্বারে।
দেখে নাই ফিরে অভাগী তাহারে,
ভেসেছিল বিধু-প্রণয়-পাথারে,
আজি মিশিয়াছে ধুলার মাঝারে
দারুণ বিষাদ ভারে!
দেখে চল ওগো-পতিতা এখন,—
যেওনা দলিয়া তারে।

৩

শশধর হাসে গগণের গায়
দেখেও দেখেনা তায়!
দগ্ধহৃদয়ে একাকিনী হেথা
করিতেছে হায় হায়।
মধুর মলয় শিয়রে বসিয়া,
আঁখিজল তার দিতেছে মুছিয়া,
পাতকী এখন পড়িছে লুটিয়া
তাহার অভয় পায়।
চেয়ে দেখ ওগো, দেখ সযতনে—
যেওনা দলিয়া তায়,

৪

এতদিনে তার ভাঙ্গিয়াছে মোহ
কেটেছে স্বপন ঘোর,

উৎসব শেষে চাহে নাই ফিরে
তাহার হৃদয় চোর।
কেহ নাই এই বিপুল ধরায়,
সখা সখী সবে ছেড়েগেছে হায়,—
যে জন হৃদয় দিয়াছিল তায়
সেই শুধু ফেলে লোর।
দলিয়া যেওনা পতিতা মালতী
অনুতাপে আজি ভোর।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মুসলমান অর্থাৎ পাঠান, মোগল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ভারতাধিকারের হেতু।

রাজস্থানের বঙ্গানুবাদক মাননীয় বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ, আর্য্যদর্শনের সম্পাদক সম্মান ভাজন বাবু যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ এবং সিপাহি যুদ্ধ ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণেতা, বঙ্গের গণনীয় ঐতিহাসিক মান্যাস্পদ স্বর্গীয় রজনী কান্ত গুপ্ত প্রভৃতি, নিজের নিজের রচিত, সঙ্কলিত বা ভাষান্তরিত পুস্তক মধ্যে প্রসঙ্গতঃ, মুসলমান জাতির ভারত বিজয় সম্বন্ধে, কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি, যুক্তি অপেক্ষা অনুমানের দ্বারাই বহুলাংশে নির্দ্ধারিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা একবাক্যে বলেন যে, একপক্ষে মুসলমানদের বিশ্বাসঘাতকতা, (অধিক পরিতাপের বিষয় যে বঙ্গের ঐতিহাসিক শিরোমণি সম্মানাস্পদ

মিষ্টার রমেশ চন্দ্র দত্ত মহোদয়ও ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুসলমানদিগকে রাজপুত অপেক্ষা বেশী প্রতারক বলিয়াছেন।) পক্ষান্তরে রাজপুত জাতির সরলতা এবং জ্ঞাতি শত্রুতাই, ভারতে মুসলমান প্রাধান্যের মূলীভূত কারণ। তাঁহাদের কথা মানিয়া লইলে এই টুকু বিশ্বাস করিতে হয় যে, (১) যদি মুসলমানগণ অত্যধিক বিশ্বাসহন্তা না হইত, (২) যদি পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়াও, হিন্দুগণ চির প্রতারক মুসলমান সম্প্রদায়ের স্তোক বাক্যের উপর, আস্থা স্থাপন না করিত। (৩) পরন্তু যদ্যপি হিন্দু জাতি স্বজাতি দ্রোহ পাপে লিপ্ত না হইয়া, বিপৎকালে পরস্পরে প্রাণান্তপণে পরস্পরের সাহায্য করে স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকিত, তবে ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিজয় কখনই সংসাধিত হইত না। কিন্তু সিদ্ধান্তগুলির সমস্তই অভ্রান্ত কি?

আমরা হিন্দু। বিধর্ম্মী মুসলমান আমাদের স্বদেশী ও সমধর্ম্মাবলম্বী জাতির প্রভুত্ব লোপ করিয়া, ভারতের দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াছিল; এবং সকারণে, অকারণে হিন্দু অধিবাসীর প্রতি অত্যাচারও কম করে নাই, সুতরাং তাহাদের উপর আমাদের বিরক্তি ও বিদ্বেষ জন্মা স্বাভাবিক। এবং সম্ভবতঃ সেই আন্তরিক ক্রোধ বশেই, আমরা মুসলমান জাতি-সম্বন্ধে, যথোচিত উদারতা দেখাইতে পারি না। পরন্তু ন্যায়ান্যায় বিচার রহিত চিত্তে, তাহাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট কটূক্তি বর্ষণ করিয়া, গাত্র-জ্বালা মিটাইয়া লই। বস্তুতঃ পরাভব প্রাপ্ত দুর্ব্বলের, যে ব্যবহারিক আলেখ্য সচরাচর প্রত্যক্ষ করা যায়, আমাদের তাহাই ঘটিয়াছে।

মুসলমান সর্ব্বত্রই ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, তিল মাত্র সত্য বিচ্যুত হয় নাই, এরূপ আবদার সূচক কথা কেহ বলিবে না। কিন্তু, হিন্দু অপেক্ষা তাহারা বিশ্বাসের সম্ভ্রম অধিকতর রূপে নষ্ট করিয়াছে, ইতিহাস এরকম সাক্ষ্য দেয় না।

সংসার ক্ষেত্রের সর্ব্বস্থানেই দেখা যায়, সবল অপেক্ষা দুর্ব্বল পক্ষই আত্ম রক্ষার্থ অধিক মাত্রায় ছল, কৌশল অবলম্বনে বাধ্য হয়। যুদ্ধ ক্ষেত্রেও সে অব্যভিচারী নিয়মের ব্যতিক্রম কল্পনা করা ভুল। যে বলীয়ান্, সে তো নিজের শৌর্য্য, বীর্য্যের সাহায্যেই জয় লাভে আশ্বস্ত থাকিবে, তাহার পক্ষে বিশেষ অবৈধ কৌশলাবলম্বনের আবশ্যক নাই। কিন্তু যে পক্ষ বল, বীর্য্য

হীন, ন্যায়-পরতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকা তাহার পোষায় না; কেননা তাহাতে তাহার পক্ষে সমূলে ধ্বংস লাভ ব্যতীত অন্য কোনও উপকারের আশা নাই। তাই আত্ম নাশ নিবারণের জন্য, দুর্ব্বল পক্ষেরই অগ্রে ছল কৌশলের শরণাপন্ন হওয়া অনিবার্য্য। যদি ইহা অসঙ্গত সিদ্ধান্ত না হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তৎকালে, মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু পক্ষেরই বেশীরভাগ বিশ্বাস হনন করিবার সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল। হিন্দু মুসলমানে যতগুলি ভয়ঙ্কর সংগ্রামের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান আক্রমণ হইতে হিন্দুর আত্ম রক্ষার নিমিত্ত। হিন্দুর হস্ত হইতে নিজ স্বাধীনতা রক্ষার্থ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত কোনও মুসলমান বীরই বিরাট সমরের আয়োজন করে নাই। তবেই দেখা যাইতেছে হিন্দু হইতে মুসলমান সম্প্রদায় চিরকালই প্রবল। নতুবা বহুল অননুকূল অবস্থা সত্ত্বেও, দিগ্বিজয়ার্থ তাহারা পররাজ্যে অগ্রসর হইতে সাহস পাইত না। কেবল ভারতাধিকারের জন্য যে মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুদের সঙ্গে আহবে লিপ্ত হইয়াছিল তাহা নহে, ধর্ম্ম প্রচারের বিশাল উদ্যমের সময়ে মুসলমানগণ এতই বলদৃপ্ত হইয়াছিল যে, পারসিক, রোমকবিজিতগ্রীক, রোমক প্রভৃতি জাতিকে অধীনতারঞ্জুচ্ছেদ্য নিগড়ে বদ্ধ করিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের সমগ্র উত্তরাংশ জয় পূর্ব্বক, আধুনিক সভ্যজাতির অধ্যুষিত স্পেন ও পর্ত্তুগালেও, অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা উড্ডীন করিতে পারিয়াছিল। শক্তি, সামর্থ্য শূন্য, মাত্র বিশ্বাসঘাতকতা সম্বল জাতি-দ্বারা; ইহা কদাচ সম্ভব হইত কি?

মুসলমানগণ, দৃষদ্বতী তীরস্থ স্থানেশ্বরে পৃথ্বী রায়ের সঙ্গে এবং বিয়ানা সন্নিহিত কানুয়ায়, রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহের সহিত যুদ্ধ ব্যপদেশে; পরন্তু হিন্দুগণের সহিত অন্যান্য যুদ্ধ ক্ষেত্রেও প্রবঞ্চনার প্রসাদে জয় লাভে সমর্থ হইয়াছে, একথা কোনও মুসলমান ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন না। কেবল রাজস্থানের ভট্ট ও চারণগণের গ্রন্থেই ইহার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, তাহা প্রতিদ্বন্দ্বীদের এক পক্ষের কথা, সুতরাং তদুপরি সম্পূর্ণ নির্ভরতা স্থাপন অনুচিত ও পক্ষপাতমূলক। যে স্থানে, উভয় দেশীয় ইতিবৃত্তবিদ্‌বর্গের মতের সামঞ্জস্য নাই, সেখানে এক পক্ষ যে

কিছু সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ না থাকিলেও, স্বজাতির প্রতি অত্যধিক দয়া প্রদর্শনচ্ছলে, মুসলমান ঐতিহাসিকদের প্রতিই মিথ্যা-বাদীত্বের দোষারোপ, কখনই সমীচীন পন্থা নয়। অবশ্য কি ঘটিয়াছে তাহা নিশ্চিত রূপে বলা দুষ্কর। কিন্তু কতকগুলি কারণে অনুমান হয় যে, যুদ্ধ বিবরণে ভাট ও চারণগণেরই বেশী মিথ্যা লিখা সম্ভব পর। সাংসারিক ঘটনায় সাধারণতঃ দেখা যায় যে, জয়ী পক্ষ বিজয় লাভের পরেই যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করে; পরাজিতের মিথ্যা দোষ প্রখ্যাপনে তাহার আর দরকার থাকে না, এবং অভিরুচিও হয় না। বরং পরাজিত পক্ষকে সম্ভবাতিরিক্ত বীর বলিলেই বিজয়ীর সম্মান উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু পরাভূত পক্ষের অবস্থা ইহার ঠিক বিপরীত হইয়া থাকে। সে হটিয়াও নিজের সাহস ও বল বীর্য্যের ন্যূনতা স্বীকার করিতে চায় না। এবং বিজয়ীর জয়লাভ কোনও ন্যায় সঙ্গত কারণে ঘটে নাই, তাহা নিরবচ্ছিন্ন অবৈধ কৌশল-লব্ধ ইত্যাদি অসত্য কথা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া নিজের পরাভবাপমান ঢাকিবার চেষ্টা পায়। এস্থলেও যে সেরূপ কিছু ঘটে নাই তাহা বলা বা বিশ্বাস করা সুকর নহে। রাজস্থানের ইতিবৃত্ত সঙ্কলয়িতা মহাত্মা কর্ণেল টড্ সাহেব রাজপুত জাতির প্রতি খুব শ্রদ্ধা সম্পন্ন থাকিলেও, রাজপুতনার ভাট ও চারণগণ যে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের (শিশোদীয়, রাঠোর, কুশাবহ, প্রথার ভট্টি প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় রাজস্থানে ছিল।) গৌরবই, বাস্তব অপেক্ষা অতিরিক্ত রকমে বর্ণনা করিয়াছেন;—তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রাজস্থানের ইতিহাস মনোযোগ পূর্ব্বক আলোচনা করিলেই ইহা যথার্থ উপলব্ধ হয়। কি মিবার, কি মারবার, কি অম্বর, কি বিকানীর, কি কোটা, কি বুন্দী, কি অন্যান্য স্থান, ইহার প্রত্যেক স্থানের এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভট্টগণই, স্ব স্ব দলভুক্ত বীরগণের আলেখ্যই সমধিক উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। সমধর্ম্মী হইলেও ভিন্ন সম্প্রদায়ের গুণপণা বড় সুনজরে দেখেন নাই। অবিশ্বাস হইলে কৌতূহলী পাঠক স্বয়ংই পাঠ করিয়া সন্দেহ নিরসন করিতে পারেন, উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

তাহারপর মুসলমানদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিলেই সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত-

দিগকে নির্ব্বোধ মানিয়া লইতে হয়। কেননা বিশ্বাসঘাতকতা করিতে হইলেও, যে পক্ষকে ঠকাইতে হইবে, তদপেক্ষা অতিরিক্ত বুদ্ধি বৃত্তি থাকা আবশ্যক। ভট্টগ্রন্থে লিখিত আছে যে, ক্রমাগত ৩।৪ শত বৎসরে অনুষ্ঠিত বিভিন্নক্ষেত্রের যুদ্ধে, শঙ্কট কাল উপস্থিত হইলেই, মহম্মদীয়ান সম্প্রদায় প্রতারণায় শরণাপন্ন হইয়াছে এবং সেই অমোঘ অস্ত্রের প্রভাবে বলীয়ান অথচ সরল ও সত্যপরায়ণ রাজপুতজাতিকে, ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে, এইটুকু বলিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয় যে;—যে জাতি ৩।৪ শত বৎসরেও একটি জাতিকে ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই; পুনঃ পুনঃ ঠকিয়াও আবার প্রবঞ্চককে বিশ্বাস পূর্ব্বক নিজের সর্ব্বনাশকে আহ্বান করিয়াছে, সে জাতি নিঃসন্দেহ অতি বড় স্থূলবুদ্ধি। অনেকে রাজপুতজাতির ঐ ব্যবহারকে উদারতা ও সত্যপরতা মূলক বলিয়া থাকেন; কিন্তু সেটি ভুল। যুদ্ধক্ষেত্র, সংসার ক্ষেত্র বা ধর্ম্ম ক্ষেত্র নহে। যেখানে পরস্পরের উন্নতি সাধন নয়, পরস্ত ধ্বংশ সাধনই পরস্পরের কল্যাণের হেতু সেখানে প্রতারকের পরিচয় পদে পদে পাইয়াও সতর্ক না হওয়া নির্ব্বোধের লক্ষণ বৈ কি? কিন্তু ভাট ও চারণের পুঁথীতে, রাজপুতজাতিকে যতই ন্যায়পর, সরল-বিশ্বাসী এবং শত্রুর প্রতি দয়া ও উদারতা সম্পন্ন বলা হউক না কেন; বাস্তব জগতে তাহারা কিন্তু তত নির্ব্বোধও ছিল না, এবং তথা কথিত গুণ গ্রামেরও তেমন ধার ধারিত না। বোগ্দাদের খালিফ ওয়ালিদের সেনানী মহম্মদ বিন্ কাসীম, সিন্ধু বিজয়ান্তে তত্রত্য হিন্দু রাজা ধীর বা দাহিরের কন্যাদ্বয়কে ওয়ালিদের নিকট উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। প্রতিহিংসা বৃত্তির চরিতার্থতা সাধন জন্য, তাঁহারা কাসীমের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা কথা খলিফার কর্ণে দেন, ঐতিহাসিক পাঠক তাহা জ্ঞাত আছেন। হিন্দুজাতি সরল, সাধু হইলে তাহাদের মহিলামণ্ডলী কদাচ এরূপ প্রতারণা শিক্ষা করিতে পারিত না। সতীত্ব রক্ষার জন্য দাহির কন্যাদের আত্ম হত্যার বহু পথ ছিল। তদ্ধেতু একটি বীরপুরুষকে এপ্রকার অসঙ্গত উপায়ে নিধনের চেষ্টা, প্রতিহিংসা পরিতর্পনের যতই সহজ পথ হউক, কিন্তু সত্যের প্রতি অগাধ ভক্তির নিদর্শন নহে। মিবারের ইতিবৃত্ত পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, গিহ্লোট্ কুলের গোত্রপতি শিলাদিত্য তনয় গোহ, অসময়ে

আশ্রয় দাতা এবং নানা প্রকারে উপকারক, ইদর জনপদাধিপ ভীল জাতীয় মাণ্ডলিককে, বিধি বহির্ভূত উপায়ে বধ পুরঃসর রাজ্য হস্তগত করিয়াছিলেন। এবং তৎপরবর্ত্তী নাগাদিত্য পুত্র বাপ্পা রাউল;—স্নেহ পরায়ন, পরন্তু তাঁহারই প্রতি অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন নিমিত্ত, সামন্ত শ্রেণী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, নিজ মাতুল প্রমার বংশীয় চিতোর পতিকে বিনাশ পূর্ব্বক সিংহাসনারোহণে কুণ্ঠিত হন নাই। মারবার, অম্বর প্রভৃতি স্থানের ইতিহাসেও এইরূপ এবং অন্যবিধ বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সুতরাং প্রচুর প্রমাণ সত্ত্বেও কিরূপে বিশ্বাস করিব যে, রাজপুত অপেক্ষা মুসলমান জাতি অধিক বিশ্বাসহন্তা?

ক্রমশঃ।

শ্রীরজনীমোহন ঠাকুর।

চারুশীলা।

১

কুলীনের পক্ষে কন্যাদায় বড় ভয়ানক; কুলীনের কন্যা হইলে তাহার অবস্থার ব্যবস্থা থাকে না; এই দায়ে পতিত হইলে তাহাদের যে কি কষ্ট, কি মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হয় তাহা আধুনিক সভ্য সমাজে সকলেই বিদিত আছেন।

মনোহর মুখোপাধ্যায়ের কন্যা চারুশীলা বড় হইয়াছে— শৈশবের কোলে দশ উত্তীর্ণ হইয়া একাদশে পদার্পণ করিয়াছে, আর বিবাহ না দিলে ভাল দেখায় না; এখনও অবিবাহিত রাখায় লোকে কত কথা বলিতেছে; কত কানাকানি করিতেছে, হয়ত তাহাকে লোকে কত পরিহাসও করিতেছে। চারুশীলার পিতা মনোহর বাবুর এই চিন্তাই এখন ভয়ানক হইয়া

দাঁড়াইয়াছে; যতই দিন যাইতে লাগিল মনোহরের চিন্তা—স্রোতও তত প্রবল হইতে লাগিল।

একে সামান্য আয়—মাসিক ৩০৲ টাকা মাত্র বেতন। বৃদ্ধাজননী, স্ত্রী একটি পুত্র ও চারুশীলা নাম্নী এক কন্যারত্ন ভিন্ন এসংসারে মনোহরের আর কেহ আপনার বলিতে ছিলনা। মাসিক ৩০৲ টাকা আয়ে সংসার খরচই একপ্রকার বহু কষ্টে সঙ্কুলান হয়; তাহার উপর হাজার বারশত টাকার সংগ্রহ হইবে কেমন করিয়া—অভাব পক্ষে ঐ টাকা না হইলে ত আর বিবাহ হইবে না; আর তাহার পক্ষে ঐ টাকা সংগ্রহ করাও একপ্রকার দুরূহ ব্যাপার।

মনোহর বাবু কলিকাতার কোন সওদাগরী আপিসে ৩০৲ টাকা বেতনে কেরাণীগিরি চাকুরী করেন। তিনি অতি ধর্ম্মভীরু অমায়িক প্রকৃতির লোক কাজেই মাসিক ৩০৲ টাকা ছাড়া আর তাহার অন্য আয় নাই। কেমন করিয়া কি হইবে; কেমন করিয়া কন্যার বিবাহ দিবেন; মনোহর চিন্তা করিয়াও তাহার কিছুই কুল কিনারা করিতে পারেন না। অথচ যখন অবিবাহিতা বয়স্থা কন্যা ঘরে রহিয়াছে তখন চিন্তা না করিয়াই বা কি করেন; তবুও গৃহিণী শিবানী মনোহরকে দিন দিন এতাদৃশ চিন্তা-ক্লীষ্ট দেখিয়া কত বুঝাইতেন। মনোহরের তেমন যে প্রস্ফুটিত কুসুমকান্তি বিশিষ্ট মনোহর বর-বপু চিন্তাকীট প্রবেশ করিয়া তাহাকে যেন শ্রীভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে; ইহা দেখিয়া কোন্ সাধ্বী সতী নীরবে থাকিতে পারেন? এই জন্য শিবানীও স্বামীর ভাবগতিক দেখিয়া একান্ত ম্রিয়মানা হইতে লাগিলেন। স্বামীই যে স্ত্রীর একমাত্র গতি—কায়ার ছায়া। কায়া বিচঞ্চল হইলে ছায়া কি স্থির থাকিতে পারে। তাই আজ পতি পত্নী এতদূর চিন্তাক্লীষ্ট।

২

চারুশীলা বড় লক্ষ্মী মেয়ে—পিতা মাতার একমাত্র আদরের কন্যা হইলেও কখন সে তীব্র ভাবাপন্না ছিলনা; চারুশীলার মুখে কেহ কখন জোর কথা শুনে নাই, সে পিতা মাতার অমতে কোন কাজ করেনা। চারুশীলার

চরিত্রের বিশেষ গুণ এই যে পিতা মাতার অনুরূপ সে এই বাল্য বয়সেই দরিদ্রের প্রতি দয়া মায়া করিতে শিখিয়াছিল। সে তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমার নিকট এইরূপ গল্প শুনিতে বড় ভাল বাসিত; ঠাকুরমাও পৌত্রীকে তাহার আশানুরূপ গল্প শুনাইয়া সন্তুষ্ট করিতেন।

পূর্ব্বে আমাদের স্ত্রীশিক্ষার এইরূপ সোপান ছিল; বৃদ্ধা গৃহিণীগণের নিকট গৃহস্থ ধর্ম্মের উপদেশ পাইয়া বালিকাগণ গৃহকর্ম্মে নিপুণা হইত। এখন কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার প্রবল স্রোত উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া চারিদিকে ছুটিয়াছে; কত গ্রাম কত নগর এই স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া সভ্য সমাজের মুখোজ্জ্বল করিতেছে; তাই আজ পূর্ব্বকার শিক্ষার নারীজাতি যে শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সংসার উজ্জ্বল করিত হিন্দুর পরম পবিত্র সংসারে যে শিক্ষায় লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইত এখন সে শিক্ষা দেশ হইতে তিরোহিত হইয়াছে; এখন বাল্যকালের সে পবিত্র বারব্রত সে সেঁযুতি যমপুকুর, পুণ্যপুকুর, এখন উঠিয়া গিয়া তাহার স্থলে নাটক নভেল প্রভৃতির কুরুচিপূর্ণ পুস্তকের শিক্ষায় আমাদের স্ত্রীজাতির কমণীয় হৃদয় কলুষিত হইয়া যাইতেছে। সংসারেও এখন আর সেরূপ সুখ শান্তির একত্র মিলন দেখিতে পাওয়া যায় না।

চারুশীলা এখনও ঠিক যৌবন সীমায় পদার্পণ করে নাই; স্ফুটোন্মুখ কোরকের ন্যায় তাহার দেহের লাবণ্য ছটা বাহির হইতেছে, অস্ফুট অবস্থাতেই এইরূপ সৌন্দর্য্য ফুটিলে না জানি আরও কত সৌন্দর্য্য হইবে। স্ত্রীজাতির বিবাহের পরই সেই সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে।

পাঠক! আপনারা চারুশীলাকে দেখিয়াছেন কি? হিন্দুর অবিবাহিতা বালিকাত বাটির বাহির হয় না তাহাকেত দেখিবার উপায় নাই; তবে তাহাকে দেখিতে ঠিক যেন লক্ষ্মীঠাকুরাণীর জীবন্ত প্রতিমা। পাতলা পাতলা গঠন, টুকটুকে রাঙ্গা ঠোঁট দুখানি, ভাসা ভাসা বড় বড় চক্ষু আকর্ণ বিস্ফারিত; লজ্জা ও সরলতা যেন সে নয়নে চিরতরে আশ্রয় লইয়াছে। দশন পংক্তি যেন মুক্তা দিয়া সাজান, এলাইত কুন্তলদাম-অলক্ত রাগরঞ্জিত চরণ যুগল স্পর্শ করিবার জন্য যেন লালায়িত হইয়া ইতঃস্তত বিকীর্ণ হইতেছে; চারুশীলার রূপের তুলনা নাই, সে নিজেই নিজের তুলনাস্থল। এক কথায় বিধাতা যেন নির্জ্জনে বসিয়া তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; নিখুঁত সুন্দরী

হইলে যাহা যাহা থাকা আবশ্যক তাহাতে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না সুন্দরী চারুশীলার জীবনের এইত প্রভাতকাল, জানিনা জীবন মধ্যাহ্নে ইহার অদৃষ্টে বিধাতা কিরূপ লিখিয়াছেন।

৩

কন্যার জন্য মনোহর মুখোপাধ্যায়ের বড়ই ভাবনা হইয়াছে; কেমন করিয়া তাঁহার আদরের একমাত্র ললামভূতা চারুকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিবেন—কেমন করিয়া কন্যা আমার সুখী হইবে। যে দিন কাল পড়িয়াছে তাহাতেত কন্যা পাত্রস্থ করাই এক প্রকার কঠিন ব্যাপার। যদিও চারুশীলা শতেকের মধ্যে একটি, যদিও সে রূপে ও গুণে নারীজাতির শীর্ষস্থানীয়া তথাপি ত দরিদ্রের কন্যা, রূপগুণের বড়াই করা কি তাহার সাজে? এখন সমাজে কি আর রূপ গুণের আদর আছে ধর্ম্মের আদর আছে, ধার্ম্মিকের আদর আছে, তাই ধর্ম্মভাবে ধর্ম্ম পত্নী গ্রহণ করিয়া চারুশীলার পিতাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবে? এযে বড় বিষম সময় উপস্থিত, এখন যে অর্থের আদরই বেশী, অর্থই যে এসময়ের মূলাধার, এই জন্য মনোহরের অপরূপ রূপ লাবণ্যবতী কন্যা এখন অনূঢ়া; তাই এখন তাহার বিবাহ হয় নাই; এই অর্থের সংসারে যদি তাহার পিতার কিছু অর্থও থাকিত তাহা হইলে কি আর চারুর বিবাহের জন্য এত চিন্তা করিতে হয়?

একদিবস মনোহর বাবু সকাল সকাল আপিস হইতে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর বহির্বাটীতে কন্যার বিবাহের বিষয় চিন্তা করিতেছেন। বৈশাখ মাসের দারুণ গ্রীষ্মে গৃহে থাকা দায়—কিন্তু মনোহর বাবু, পাছে কেহ কন্যার বিবাহ সংক্রান্ত কথা বলিয়া তাহাকে লজ্জা দেয় এই জন্য তিনি গ্রীষ্মের সময়ে বাটীর বাহির হন নাই; আপন মনে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, সে চিন্তার বিরাম নাই; মনোহর বাবু তন্ময়—যেন জীবন শূন্য দেহের ন্যায় নিস্পন্দ ভাবে চিন্তা সাগরে ডুবিয়াছেন—তাহার চৈতন্য নাই। এমন সময় কে তাহাকে ডাকিল, বারবার অনেকবার ডাকিল কিন্তু তথাপি কাহারও উত্তর পাইল না। শিবানী গৃহের ভিতর;—তিনি ভিতরের দরজা দিয়া গৃহে প্রবেশ করতঃ বলিলেন "ও গো তোমায় কে ডাকছে"। তথাপি তাহার চৈতন্য হইল না, তখন গৃহিণী গাত্রস্পর্শ করিয়া বলিলেন তুমি যখন

তখন অমন করে অত ভাব কেন—জগদম্বার মনে যা আছে তাই হবে, ভেবে ভেবে শরীর মাটী করবার দরকার কি? চেষ্টা কর অবশ্যই ফল হইবে, চেষ্টার অসাধ্য জগতে কি আছে। এখন যাও তোমাকে বাহিরে কে ডাকছে। মনোহর বাবু দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর ছিলেন তিনি স্ত্রীর কথায় কোন উত্তর প্রদান না করিয়া গৃহের অর্গল মোচন করতঃ বাহিরে আসিলেন।

৪

মনোহর বাবু নয়ন মার্জ্জনা করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, বোস জা তাঁহাকে ডাকিতেছে। বোস জা পাড়ার ঘটক—এই বয়সে সে অনেকের বিবাহ দিয়াছে। বোস জা মনোহরকে দেখিয়া যথারীতি প্রণাম করিয়া বলিল—আমি অনেকবার ডেকেছি, আপনি কি নিদ্রা যাইতেছিলেন।

মনোহর আর কি বলিবেন অগত্যা তাঁহাকে বলিতে হইল "আপিস থেকে আসিয়া নিদ্রিত হইয়াছিলাম"। তবে, কি মনে করে, খবর সব ভাল ত, আজকাল যে আর তোমায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না বোস জা! কোথাও গিয়েছিলে নাকি?

বোস জা। না কোথাও যাই নাই; তবে শরীর বড় অসুস্থ ছিল বলিয়া কোথাও বাহির হই নাই।

মনোহর। এখন শরীরটা বেশ সেরেছে ত?

বোস জা। হ্যাঁ! একটা কথা বলছিলুম কি, চারুর জন্য একটি পাত্র ঠিক করেছি; বেশী কিছু দিতে হইবে না, তাদের এক জায়গায় ঠিক হয়েছিল, বিবাহের রাত্রে সে পাত্রীর হঠাৎ কলেরা হইয়া মৃত্যু হওয়ায় তাহারা আজ সকালে আমায় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল। আমি আপনার কন্যার কথা বলিলাম এবং বলিলাম কন্যার পিতা বড় গরীব, কিছু দিতে পারিবে না। তাতে তাহারা বলিল—আমরা এমন কিছু বেশী চাহি না মেয়েটী ভাল হইলেই হইল।

মনোহর। বোস জা! তবু তাহাদের অভিপ্রায় কিরূপ বুঝিলে এবং পাত্রটী কেমন—তাহার কে কে আছে?

বোস জা। পাত্রটী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার জননী আছেন, মাতুলালয়ে প্রতিপালিত, বোধ হয় পাঁচ শত টাকাতেই হইতে পারে; আপনি একবার তাঁহাদের সহিত দেখা করিবেন—আসুন, তাহা হইলেই সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে।

মনোহর। কতদূর যাইতে হইবে?

বোস জা। বেশী দূর নয়, ঐ ও পাড়ায়। তুমি কাপড় পর, শুভকাজে আর বিলম্ব কেন?

মনোহর ডাকিল—"চারু"

চারুশীলা "যাই বাবা" বলিয়া উত্তর দিতে দিতে বাটীর ভিতর হইতে আস্তে আস্তে বাহিরে আসিল এবং সম্মুখে বোসজাকে দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিল—কাকা! তুমি যে আর আস না গা, আমাদের কি ভুলে গেছ? বোসজাকে চারু বাল্য কাল হইতে কাকা বলিয়াই ডাকিত, সেও তাহাদিগকে বড় ভাল বাসিত।

বোসজা বালিকার কথা শুনিয়া বলিল—না মা! তোমাদের কি ভুল্‌তে পারি, তবে তোমার বর খুঁজতে খুঁজতেই যে বিব্রত হচ্ছি আর কখন আসি মা?

বিবাহের কথা শুনিয়া সরলা বালিকার সুন্দর মুখখানি যেন লজ্জায় বিবর্ণ হইয়া গেল, সে আর কথা কহিতে পারিল না; তখন ধীরে ধীরে বড় বড় চক্ষু দুটি মাটির দিকে নামাইয়া অধোবদনে রহিল।

মনোহর বাবু বলিলেন মা! তোমার বোসজা কাকার জন্য একটু তামাক আনিয়া দাও ত! বোসজা বাধা দিয়া বলিল, আর এখন তামাকে কাজ নাই; এখন দুর্গা বলে চল আগে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে আসি। মনোহর বাবুও আর বিলম্ব না করিয়া উভয়ে পাত্র দেখিতে গমন করিলেন। সেখানে সমস্ত কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়া গেল, পাঁচ শত টাকা নগদ ও দশ ভরি সোণা দিলেই হইবে; পাত্রটী দেখিয়া মনোহর বাবুর বড় পছন্দ হইয়াছিল, কাজেই আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন।

মনোহর বাবু বাটী আসিয়া জননীর নিকট ও স্ত্রীর নিকট সমস্ত কথা

বলিলেন, শিবানী কত দেব দেবীর পূজা মানসিত করিয়া পয়সা তুলিয়া রাখিলেন।

৫

পাত্রত স্থির হইল এখন অর্থ কোথায়; মনোহর কি করিবেন তাঁহার বহুদিনের পৈতৃক গৃহখানি বন্ধক দিয়া টাকার সংগ্রহ করিলেন। হায়? কন্যাদায় গ্রস্থ হইয়া এতদিনে মনোহরের গাছতলা সার হইল। এরূপ করিয়া কন্যার বিবাহের জন্য যে কত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছারখার হইতেছে; স্ত্রী পুত্র লইয়া কত লোক যে পথের ভিখারী হইতেছে তাহার ইয়ত্তা কে করে। পূর্ব্বে নীচ জাতির মধ্যে অর্থ দিয়া কন্যাই ক্রয় করিতে হইত; এখন তাহার পরিবর্ত্তে পুত্র বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে, যাহার পুত্র আছে তাহার আবার অর্থের অভাব কি? বিবাহের সময়েই ত অজস্র অর্থ সমাগম হইবে। তাহার উপর পুত্র যদি কথঞ্চিৎ হয়, যদি সে দুই একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে তাহা হইলে ত কথাই নাই, এই ত সমাজ এইত তাহার অবস্থা—এখন আমাদের দেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের এবিষয়ে আদৌ দৃষ্টি নাই; যে সকল কার্য্য করিলে দেশের ও দশের মঙ্গল হইবে, সে বিষয়ে কাহার দৃষ্টি নাই; কেবল বাগাড়ম্বর করিয়া দেশোদ্ধারের জন্য ব্যস্ত। মনোহর অর্থ কর্জ্জ করিয়া কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

৬

শুভদিনে শুভলগ্নে যথাবিধানে চারুশীলার বিবাহ কার্য্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের দিন চারুর সই মনোরমা ও তাঁহা মাতার নিমন্ত্রিত হইয়া তাহাদের বাটী আসিয়াছিলেন। মনোরমা আসিবার সময় চারুশীলার জন্য একখানি কাপড় আনিয়াছিল। কাপড়খানি তাহার সইকে পরাইয়া বলিল—ভাই! যখন এই কাপড়খানি তুমি পরিবে তখন তোমার এই সইয়ের কথা মনে পড়িবে।

মনোরমা তার সইয়ের বিয়েতে বড় আমোদ করিয়াছিল, বরকে কত তামাসা করিয়াছিল—অবশেষে তাহার কোমল কণ্ঠে একটি গান শুনিবার জন্য বাসরে কত সাধ্যসাধনা করিয়াছিল। মনোরমার সে গানটি এত ভাল লাগিয়াছিল যে অবসর পাইলেই সেই গানের দুই এক কলি আপন মনে

গুণ গুণ করিয়া গাহিয়া থাকে। বিবাহের পর বাসী বিবাহের দিন মনোরমা তাহার সইকে কত রকম করিয়া চুল বাঁধিয়া দিল। শেষে যখন চারুশীলা পালকীতে উঠিল তখন হঠাৎ মনোরমার চক্ষে জল আসিল, ঝটিকাপসারিত মেঘের ন্যায় আমোদ আহ্লাদ কোথায় উড়িয়া গেল। হৃদয়াবেগ উথলিয়া উঠিল—অবরোধ না মানিয়া দুই এক ফোটা করিয়া নয়ন কোণে অশ্রু আসিয়া দেখা দিল। চারুশীলা তাহার সইয়ের চক্ষে জল দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—সই! তুমি কাঁদছো? মনোরমা বলিল "জানিনা সই আবার কবে দেখা হবে। আমরা কিছুদিনের জন্য এখানে থাকিব না—বাবা ভাগলপুরে বদলী হইয়াছেন।"

আর অধিক কথা হইল না—দেখিতে দেখিতে বেলা অধিক হইতে লাগিল; বর ও কন্যা যথারীতি বিদায় প্রাপ্ত হইল।

৭

চারুশীলার বিবাহের পর দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার একটি কন্যা হইয়াছে। চারুশীলার শ্বশুরবাটী অনেক দূর নহে; একটি অরণ্য মাত্র ব্যবধান, অরণ্যের পরই—কপিলপুরে তাহার শ্বশুরালয়; চারুশীলা নিজের গুণে শ্বশুরবাটীর সকলের নিকট আদরণীয়া হইয়াছেন; তাহার সরল স্বভাবের গুণে মামাশ্বশুর; মামীশাশুড়ী ও শ্বশ্রূদেবী তাহাকে বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন; সরলা চারুশীলার ন্যায় আদর্শ-গৃহিনীর গৃহিনী পণায়—সংসার কার্য্যে তাহার বিশেষ পারদর্শিতা থাকায় অল্পদিনের মধ্যে তাহার স্বামীর সংসারে লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে।

স্ত্রী সংসারে লক্ষ্মী, যে সংসারে স্ত্রীজাতিই লক্ষ্মীছাড়া, সে সংসারের সুখ শান্তি কোথায়, কর্ণধার পাকা না হইলে তরণীর যে অবস্থা হয়—পাকা গৃহিণী বিহনে সংসার—তরণীরও সেই অবস্থা হইয়া থাকে—কারণ স্ত্রী যে সংসারের সার।

বহুদিন হইতে চারুশীলার শ্বশ্রূঠাকুরাণী পুরুষোত্তম দর্শনের মানস করিয়াছিলেন কিন্তু এতদিন নানা কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই;—এখন বধূ মাতা সমস্ত বুঝিয়াছেন—এখন তাহার উপর ভার দিলে—তাহার পুত্রের কোন কষ্ট হইবে না। এইজন্য তিনি পাড়ার

কয়েকটি স্ত্রী সঙ্গিনী স্থির করিয়া পুরুষোত্তম যাইবার মনস্থ করিলেন এবং পরদিন শুভ যাত্রা করিবার মানসে বৈবাহিক বাটীতে চারুশীলাকে লইয়া যাইবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। তাহার ভ্রাতা বলিলেন যখন সংবাদ দেওয়া হইয়াছে তখন বৌমা কাল নিশ্চয়ই আসিবেন; তুমি প্রাতঃকালেই রওনা হইও আমাদের জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই।

৮

পর দিন প্রাতঃকালে চারুশীলার শ্বশ্রূদেবী সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সঙ্গিনীগণের সহিত পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্র যাইতে হইলে একপ্রকার সমস্ত আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইত কারণ পূর্ব্বে যাতায়াতের এত সুবিধা ছিল না।

কলির দেবতা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র পুরুষোত্তম হিন্দুর একটি মহাতীর্থ স্থান। এখানে মান, অপমান, অহঙ্কার, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি ভেদাভেদ নাই; এস্থানে সমস্তই একাকার। একজন চণ্ডাল আসিয়া যদি তোমার বদনে অন্ন প্রদান করে তাহা হইলে তোমাকে তাহা অম্লান বদনে গ্রহণ করিতে হইবে—মরি মরি, এই পরম পবিত্র তীর্থ স্থানের দৃশ্য কি মনোহর—দেখিলে নয়ন মন চরিতার্থ হয়, হৃদয় ভক্তি প্রেমে আপ্লুত হয়। বাস্তবিক কাহারও হৃদয়ে ভেদজ্ঞান থাকেনা।

এখন হিন্দুর যাহা কিছু আছে; এখন সোনাতন হিন্দু ধর্ম্মের মাহাত্ম্য যাহা কিছু নয়ন গোচর হয় তাহা আর কোন ধর্ম্মে নাই। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর অন্য যাহা কিছু থাকুক, আর নাই থাকুক ধর্ম্মভাব যাহা এখন বর্ত্তমান তাহা অন্য জাতির অনুকরণীয়, অন্যের পক্ষে সে সমস্ত যে পর্ব্বত বিশেষ তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

৯

কন্যার বিবাহ দিবার পর মনোহর বাবুর কষ্টের এক শেষ হইয়াছে; যাহার নিকট টাকা ধার করিয়াছিলেন—তিনি মনোহরের অবস্থা দেখিয়া আর টাকা ফেলিয়া রাখিতে চাহেন না;—হয় তাহার টাকা পরিশোধ করা হউক—না হয় বাস্তভিটাটী ছাড়িয়া দিয়া ঋণ দায় হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করুন; কুসীদজীবী মহাজনের এখন এইরূপ অভিপ্রায় হইয়াছে।

মনোহর বাবু নিষ্ঠুর প্রকৃতি মহাজনের ব্যবহারে একান্ত মর্ম্মাহত হইয়াছেন; কি করিবেন কাহার শরণাপন্ন হইবেন; কে তাঁহাকে এই দুঃসময়ে অর্থ সাহায্য করিয়া দুরন্ত মহাজনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবে—ইত্যাদি চিন্তায় তিনি বড়ই কাতর হইয়াছেন। এ সংসারে অর্থহীন হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা মরণই মঙ্গল—অর্থ না থাকিলে ইহসংসারে তাহার মান সম্ভ্রম বজায় থাকে না— তাহার যাবতীয় গুণ সমস্ত অগ্নিতে তুলারাশির ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া যায়।

মনোহর বাবু একদিন আপিসের কয়েকটি বন্ধুর কথা শুনিয়া তাহাদের বড় সাহেবকে নিজের দুঃখ জানাইলেন। সাহেব মহোদয় বড়ই উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। মনোহরের কথা শুনিয়া তাহার দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি বিনা সুদে তাহাকে পাঁচ শত টাকা প্রদান করিয়া যাবতীয় চিন্তার হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন।

চারুশীলা পিতার এতাদৃশ কষ্ট দেখিয়া কল্য শ্বশুরালয়ে রওনা হইতে পারেন নাই। অদ্য বৈকালে পিতামাতার নিকট বিদায় হইয়া শুভযাত্রা করিলেন।

১০

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে চারুশীলার শ্বশুরবাটী বেশীদূর নয়—একটি অরণ্য ব্যবধান মাত্র; তিনি অপরাহ্ণে একখানি গোযানে আরোহন করিয়া কন্যা সহ গমন করিতে লাগিলেন। সঙ্গে আর কেহই যাইল না। চারুর গাত্রে দুইগাছি সুবর্ণ বলয় ও কটীদেশে একছড়া রূপার গোট ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।

গাড়ওয়ান গাড়ী লইয়া কিছুদূর যাইতে না যাইতেই রাত্রি হইল। চারুশীলা কন্যাটীকে বস্ত্রের দ্বারা আবরিত করিয়া ঘুম পাড়াইতে লাগিল। গাড়ওয়ান পরিচিত তাহার দ্বারা কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে যাইতে লাগিলেন।

লোভ বড় ভয়ানক রিপু—ইহাকে সহজে দমন করা যায় না। পাষণ্ড গোচালকের মনে লোভ উপস্থিত হইল; নির্জ্জন স্থান তাহাতে রাত্রিকাল,

এক্ষণে স্ত্রীলোকটিকে মারিয়া অলঙ্কার গুলি লইতে পারিলে কেহই জানিতে পারিবে না—এই মনে করিয়া সে বিপথে গাড়ী চালনা করিতে লাগিল। চারুশীলা কিয়দ্দূর গমন করিয়া বলিল—গাড়ওয়ান! তুমি এরূপ অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেছ কেন? এ দিকে ত যাইবার পথ নহে। গাড়ওয়ান কোন কথা শুনিল না—দুরন্ত গভীর অরণ্যের ভিতর লইয়া গিয়া; চারুশীলা ও তাহার কন্যাকে লতাপাশে আবদ্ধ করিল। চারুশীলা তখন নিজের ও কন্যার প্রাণ ভিক্ষা করিয়া তাহাকে কত অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই দুরাত্মা দস্যুর মনে দয়ার সঞ্চার হইল না। সে তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে একখানি কুড়ালী লইয়া আসিয়া কাটিতে উদ্যত হইল। চারুশীলা আর কোনও উপায় না দেখিয়া সেই নিরুপায়ের উপায় দাত্রী, বিপদ নাশিনী অভয়ার শরণ গ্রহণ করিলেন। সতীকুল-সিমন্তিনী জগদম্বা সাধ্বী সতী চারুশীলার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন। পাপাত্মা দস্যু যেমন কুড়ালী উত্তোলন করিয়া আঘাত করিবে—দৈবক্রমে কুড়ালীর ফলাটী খুলিয়া গিয়া একটি গর্ত্তে পড়িল। পাষণ্ড দস্যু লোভে আত্মহারা— সে তাড়াতাড়ি গর্ত্ত হইতে ফলাটী লইয়া আঘাত করিবার মানসে যেমন গর্ত্ত মধ্যে হস্ত প্রদান করিল, হস্ত আর তুলিতে পারিল না; কত টানাটানি করিল কিছুতেই সে হস্ত বাহির করিতে পারিল না। চারুশীলা আসন্ন বিপদে পতিত হইয়া পূর্ব্বেই সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলেন—তিনি দুরাত্মার কষ্ট কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

১১

উপসংহার

পাঠক! ব্যাপার কিছু বুঝিলেন কি? সাধ্বী চারুশীলার সঙ্গে যদিও কোন লোক ছিল না কিন্তু ধর্ম্ম যে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া রক্ষা করিতেছিলেন। ধর্ম্মই কালসর্প রূপ ধারণ করিয়া ঐ গর্ত্তের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পাপিষ্ঠ সে ধর্ম্মের নিকট হইতে কি আর হস্ত ছাড়াইতে পারে। সমস্ত রাত্রি টানাটানি করিয়া শেষে বিষে জর্জ্জরিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিল।

পর দিন এই সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইল; পুলীশ ঘটনাস্থলে আসিয়া

লাশ চালান দিল এবং চারুশীলার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া পুলীসে লইয়া গেল। চারুশীলার স্বামী ও শ্বশুর এ সংবাদ পাইয়া ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইয়া তাহার উদ্ধার সাধন করিলেন। চারুশীলার সতীত্ব তেজ দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গেল।

সমাপ্ত।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

—০:০:০—

শিশু।—"নবীন পান্থ।"*

কে তুমি ঢালিছ শান্ত সুধা নিরমল,
বিস্ময়-বিলোল-নেত্র প্রফুল্ল বয়ানে!
কভুবা আপন মনে আনন্দ বিহ্বল,
কি যেন চিন্তায় মগ্ন কভু আনমনে!
ত্রিদিব-উদ্যান-ফুল্ল প্রসূন কোমল,
স্বরগ-সুষমা-রশ্মি-মণ্ডিত-দর্শন,
কে তুমি অমর-হর্ষ-মূর্ত্তি সুবিমল,
সজীবতা অঙ্গে অঙ্গে দীপ্ত অনুক্ষণ!
জুড়াইতে ধরনীর মরুময় পথে
জীর্ণ-তনু ক্লান্ত-হিয়া মানবেরে হেথা,
কে তুমি এনেছ কোন্ দূর দেশ হ'তে
শান্তির অমিয় উৎস, গোপন বারতা!
কে তুমি স্বরগ-চ্যুত কুসুম-কলিকা,
ধরার "নবীন পান্থ," পূর্ণ-প্রহেলিকা!

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক।

* "নবীন পান্থ" শব্দটী দ্বিজেন বাবুর। লেখক।

রঙ্গালয় ও তাহার সংস্কার।

বঙ্গ দেশে— বিশেষতঃ কলিকাতা নগরীতে রঙ্গালয়ের দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। বলিতে পারিনা ইহা সুলক্ষণ কি কুলক্ষণ। সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি যতগুলি কলাবিদ্যা আছে তাহাদিগের প্রতি লোকের মন আকৃষ্ট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। তথাচ সঙ্গীতের অংশ বিশেষ নাট্যাভিনয় দেশে যেরূপ বিস্তার লাভ করিতেছে তাহাতে দেশের হিতাকাঙ্খী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইতেছেন।

আমাদের দেশীয় রঙ্গালয়ের অবস্থা নিতান্ত হীন। এরূপ অভিনয়ে তৃপ্তি অনুভব করা বিকৃত অবস্থার লক্ষণ। বাস্তবিক, চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে দেশীয় নাট্যাভিনয় হইতে কোন প্রকার উপকার লাভ করা যায় না। নাট্যে আমোদ ও শিক্ষা উভয়ই থাকা প্রয়োজন। আমাদের রঙ্গালয়ে কোনটিই নাই। শিক্ষার কথা দূরে থাক। যে প্রকার আমোদ আছে তাহাতে স্বাভাবিক অবস্থার মন অসন্তুষ্ট বই কদাচ সন্তুষ্ট হইতে পারে না।

দেশীয় রঙ্গালয়গুলির নানা দোষ ও ত্রুটি আছে। তাহার মধ্যে প্রধান ও অন্যান্য দোষগুলির কারণ - চরিত্র ও শিক্ষার অভাব। এই দুইটির অভাবে অভিনয় (Performance) কেবল ব্যঙ্গ (caricature) হইয়া যায়।

আমাদের রঙ্গালয়ের অভিনেতৃগণ চরিত্রহীন। এরূপ লোকের কোন প্রকার আনুকূল্য করা পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কেহ কেহ আপত্তি করিয়া এরূপ বলিতে পারেন যে বিলাতের নায়ক নায়িকাগণও ত সব সতী সাবিত্রী নন। উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে বিলাতে অভিনেতৃগণ ভদ্র-সমাজভুক্ত। তাঁহাদের ভদ্র সমাজে যাতায়াত আছে। ভদ্র স্ত্রী পুরুষের সহিত—কখনও বা অভিজাত বংশে—তাঁহাদের বিবাহাদি হয়। তাঁহারা আপনাদিগকে ভদ্র বলিয়া মনে করেন; ভদ্র লোকের মত আচার ব্যবহার করেন, তবে ভারতে বা ইংলণ্ডে—কোথাও যেরূপ ভদ্র শ্রেণীতে সচ্চরিত্রের বা কুলটার একেবারে অভাব নাই সেরূপ বিলাতী অভিনেতৃদলের সকলেই যে ধর্ম্ম পথাবলম্বী তাহা নহে। কিন্তু আমাদের দেশীয় অভিনেতৃ শ্রেণীর

তাঁহাদের সম্প্রদায় দ্বারা সমাজে পাপ প্রবেশ করে না। আর বিলাতী অভিনেতৃ সম্প্রদায় চরিত্রহীন হইলেও, সেই জন্য আমাদের রঙ্গালয়ের সংস্কার প্রয়োজন নাই এরূপ মনে করা অবোধের কার্য্য। বরং আমাদের রঙ্গালয়ে চরিত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে বাঙ্গালীর চরিত্রের গৌরব শতগুণ বৃদ্ধি পাইবে।

আমাদের দেশীয় নায়িকা মাত্রই চরিত্র হীনা। ইহাদিগের দ্বারা অভিনয় কলার নানা ক্ষতি হয়। একটির উল্লেখই যথেষ্ট। ইহাদিগের জীবিকার জন্য ব্যবসা ও সংসর্গ এরূপ যে ক্রমে ক্রমে ইহাদিগের ইচ্ছা অভিরুচি, হৃদয় মন এপ্রকার অস্বাভাবিক ও বিকৃত হইয়া দাঁড়ায় যে ইহারা ভদ্র গৃহস্থের স্বাভাবিক হৃদয় মন, আশা আকাঙ্ক্ষা, তাহাদের সুখ দুঃখ কিছু বুঝিতে পারে না; দেবতা সাধু, মহাজনগনের অন্তঃকরণ জানিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ বা রাধিকা, রামচন্দ্র ও সীতাসতী, গৌরাঙ্গ এবং তাঁহার অনুচরগণের বিষয় অভিনয় করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করে। প্রেম অথবা তৎসম্বন্ধীয় কোন ভাব থাকিলেই অস্বাভাবিক রূপে হাত মুখ নাড়িয়া স্বব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করে। নিরীহ যুবকের পরকাল বিনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়।

সুলিখিত ও সুঅভিনীত নাটকের নায়িকা স্বভাবতঃ দর্শকের মনে সহানুভূতি জন্মায়। এরূপ অবস্থায় সকল রকম সুবিধা সত্ত্বে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতৃ নায়িকা হইতে বাজারের বারবনিতার নিকট উপস্থিত হওয়া দুরূহ নয়। এরূপ ঘটনা প্রতিদিনই হইতেছে। কলিকাতার ছাত্রাবাসে অনুসন্ধান করিলেই জানা যায়।

দ্বিতীয় অনুযোগ— রঙ্গালয়ে শিক্ষার অভাব। যাহারা এখন বঙ্গ নাট্যালয়ে অভিনয় করে তাহারা সকলেই অশিক্ষিত। তাহারা স্ব স্ব part মুখস্থ করে এবং অঙ্গসঞ্চালনাদি সহিত দর্শকবৃন্দের সম্মুখে তাহা আবৃত্তি করে। তাহারা part এর প্রায় কিছুই বুঝে না। নিজের সহিত নাটকের অন্যান্য নায়ক নায়িকার কিপ্রকার ও কতদূর সম্বন্ধ তাহা স্পষ্ট বুঝে না। এ কারণ তাহাদের অভিনয় হয় অসম্পূর্ণ থাকে নয় অতিরিক্ততা দোষে দুষ্ট হয়। তাহারা নাটককারের অভিপ্রায় বুঝে না বলিয়া সাধুকে ভণ্ড

প্রতীয়মান করায়, কুটীল ও ক্রূরকে সদ্বিবেচক ও বিচক্ষণ করিয়া তোলে।

শুনিয়াছি বিলাতে একবার একজন অভিনেতৃ ও একজন বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচকের মধ্যে একখানি নাটকের নায়কবিশেষের চরিত্র বিষয়ে মতভেদ হয়। বিলাতের অনেক অধ্যাপক ও ছাত্রেরা শুদ্ধ এই উদ্দেশ্যে অভিনয় দর্শনে যান যে কিরূপে reading পড়িতে হয় তাহা শিখিতে পারিবেন, অথবা নাটক বিশেষের অর্থ ও অভিপ্রায় কি তাহা জানিতে পারিবেন।

এদেশে যতগুলি ইংরাজ অধ্যাপক আসিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে Shakespeae পাঠ ও অধ্যাপনার জন্য D. L. Richardsonএর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতি ছিল। শুনিয়াছি তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে ইংরাজী থিয়েটার দেখিতে অনুরোধ করিতেন। তিনি বলিতেন যে থিয়েটার দেখিলে নাটক ভাল বুঝা যায় ও উত্তমরূপে reading পড়িতে পারা যায়। এক্ষণে আমাদিগের দেশীয় নাট্যাভিনয়ের সম্বন্ধে খাটে না। আমাদের দেশে সুঅভিনেতৃ নাই তাহা নহে; কেবল উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাঁহাদের ক্ষমতা ও গুণ মাটি হইয়া যায়।

জাতীয় জীবনে নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা যে অত্যন্ত অধিক তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। অতএব সমাজের অন্যান্য গুরুতর বিষয়ের ন্যায় ইহারও আলোচনা হওয়া উচিত। রঙ্গালয় সংস্কার সম্বন্ধে লেখকের মনে যাহা প্রতিভাত হইয়াছে তাহাই লিপিবদ্ধ করা গেল। ইহার উপযোগীতা বা অনুপযোগীতা বিচার্য্য।

পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে শিক্ষা ও সচ্চরিত্র রঙ্গালয়ে না প্রবেশ করিলে নাট্যাভিনয়ের ও দেশের মহা অকল্যাণ। ইদানীং যে সকল লোক অভিনয় ব্যবসা করে তাহাদের অনেকেরই চরিত্র নাই। এখন তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষা ও চরিত্র বিস্তার অসম্ভব। কিন্তু এবম্প্রকার লোক রঙ্গালয়ে আছে বলিয়াই ভদ্র স্ত্রী পুরুষ অভিনয় ব্যবসা আরম্ভ করিতে পারেন না। অভিনয় এখন অত্যন্ত নীচ ব্যবসা। কিন্তু ক্রমে ইহাকে লোকচক্ষে উন্নত করিতে হইবে।

বর্ত্তমান অবস্থায় কোন শিক্ষিত ও চরিত্রবান্ ব্যক্তি এ ব্যবসায়ে যোগ দিবেন না। না দেওয়াই উচিত। এ অবস্থায় অনাথ অনাথা বালক

বালিকাদিগকে লইয়া কার্য্য আরম্ভ করাই একমাত্র পথ মনে হইতেছে। অন্যান্য নানা প্রকার সংস্কারের ন্যায় এ কার্য্যও শিক্ষিত ও চরিত্রবান্ ভদ্র লোকের উদ্যোগ ভিন্ন হইতে পারে না। এখন কলিকাতায় যতগুলি অনাথাশ্রম ও আতুরালয় আছে তাহাদের বালক বালিকাদিগকে বাল্যকাল হইতে এ ব্যবসায়ের উপযোগী শিক্ষা দিতে পারিলে ভাল হয়। এরূপ কার্য্য কেবল সম্ভ্রান্ত লোক—গঠিত সঙ্গীতের সভা ও সমিতির দ্বারাই চালিত হওয়া উচিত। সেই বালক বালিকাগুলিকে নাট্যাভিনয়ের পবিত্রতা ও মহত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে। তাহাদিগের হৃদয় এ বিষয়ে আকৃষ্ট করিতে হইবে। সাধারণ ভদ্র সন্তানের ন্যায় উহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। এ পথ ভিন্ন রঙ্গালয়ের অশিক্ষা-দোষ দূর করিবার অন্য পথ দেখিতেছি না। বাল্যাবধিই সেই বালক বালিকাগুলির নীতি ও চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। উত্তম রূপে এ কার্য্য সম্পন্ন হইলে রঙ্গালয়গুলি গুণবান্ ও গুণবতী দ্বারা পুষ্ট হইবে; উহাতে অপবিত্রতা স্পর্শ করিবে না।

আমাদের বিশ্বাস যে একমাত্র এই উপায়েই ভদ্র গৃহস্থের অভিনয় সম্বন্ধে মতামত পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কেবল এইরূপেই অভিনয় এদেশে কলাবিদ্যার উচ্চস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে। কেবল এই উপায়েই কালে ভদ্র সন্তানেরা অভিনয় ব্যবসা পরিগ্রহ করিতে লজ্জানত শির হইবে না।

অবশ্য এ কার্য্য অতি দুরূহ। চারিদিকের অসৎপ্রভাবের মধ্যে যে এই সংস্কার কার্য্য একেবারেই স্থিরপদে নিজপথে চলিতে পারিবে তাহা আশা করা যায় না। কিন্তু সকল প্রকার সৎকার্য্যেই ত বাধা বিঘ্ন অবশ্যম্ভাবী। আবার একার্য্য আরম্ভ করিয়া সল্প কালের মধ্যেই যে ইহার সুফল লক্ষিত হইবে সে আশাও বৃথা। দশ বার বৎসরে সফলতার দীপ্যালোক দৃষ্ট হইলেও আশাতীত পুরস্কার মনে করিতে হইবে। কিন্তু এপথ ভিন্ন রঙ্গালয়ের নৈতিক ও শিক্ষা বিষয়ক সংস্কারের অন্য পথ দেখিতেছি না।

এখন এই সংস্কারের আনুষঙ্গিক দুই একটি বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ বর্ণিতরূপ সংস্কার সম্পন্ন হইলে নূতন অভিনেতৃদল সমাজের

কোন্ শ্রেনীভুক্ত হইবে? আর পবিত্রতা রক্ষার জন্য উহাদের উপযুক্ত সময়ে বিবাহাদি প্রয়োজন। তাহাই বা কিরূপে সম্পন্ন হইবে? শিক্ষা ও সদ্‌গুণের হেতু তাহারা অবশ্য ভদ্র সমাজ ভুক্ত হইবে। কিন্তু হিন্দু সমাজের গঠন যেরূপ তাহাতে অজ্ঞাত কুল শীল অনাথ বালক বালিকার উচ্চ শ্রেণীতে বিবাহাদি হইতে পারেনা। তবে যদি অভিনয় ব্যবসাবলম্বী কোন অনাথা বালক বালিকা কোন ভদ্রলোকের অথবা ভদ্রলোকগঠিত সভাসমিতির তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত হইয়া থাকে এবং যদি তাহার বর্ণ, কুল, গোত্র প্রভৃতি জানা থাকে তবে তাহাকে স্ববর্ণে বিবাহ দেওয়া কঠিন নহে। কিন্তু অপরিচিত কুলশীলদিগের পক্ষে পরস্পরের মধ্যে বিবাহ দেওয়া ভিন্ন অপাততঃ অন্য কোন উপায় নাই।

দ্বিতীয়তঃ — অভিনয় ব্যবসায়ে এই নূতন শ্রেণী বংশ পরম্পরায় নিযুক্ত হইবে কিনা? আমাদের মনে হয় সেরূপ না হইলেই ভাল হয়। কারণ বংশ পরম্পরায় এব্যবসায় আবদ্ধ থাকিলে সমাজে অভিনয় কলার উচ্চস্থান বজায় থাকিবে না। অনাথ বালক বালিকা দ্বারাই এই দল পুষ্ট রাখিতে হইবে। নূতন দলের লোকেরা সাধারণ ভদ্রলোকের মত নিজ সন্তান দিগকে শিক্ষা দিবে, ও ভদ্রলোকের জীবিকার জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করিবে। ভবিষ্যতে যদি কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বা সুপ্রথিত যশ চিকিৎসক অমুক অভিনেতৃর সন্তান বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে লজ্জিত না হন তবে তখন সমাজে নাট্যব্যবসার কি উচ্চ স্থান হইবে পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারেন। এরূপ হইলে ভদ্র সন্তানেরাও ক্রমে এ কার্য্যে যোগ দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

এই সংস্কার কার্য্য প্রথমতঃ অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ হইবে। ইহার আরম্ভ বিশেষরূপে শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র কোন ধনী ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব। অথবা ভদ্র লোকগঠিত কোন সঙ্গীতাদির সভাসমিতি এরূপ কার্য্যে সহজে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। অর্থ হিসাবে এবং শিক্ষা ও চরিত্র রক্ষার জন্যও সভা-সমিতিরই এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া বিধেয়। স্বতন্ত্র ব্যক্তি বিশেষ হইতে অমঙ্গলের আশঙ্কা হয়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে সমাজের পক্ষে এরূপ গুরুতর বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীপ্রেমসুন্দর বসু।

---

*বাণী।

(সমালোচনা।)

রক্তরাগ রঞ্জিত হইয়া, ঐতিহাসিক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নিকট হইতে একখানি ক্ষুদ্র পরিচয়-পত্র বাঁধিয়া "বাণী" আসিয়াছেন। আমরা বরণ ডালা লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমাদিগের নিকট 'বাণীর' 'আত্মপরিচয় দিবার আবশ্যক নাই—আমরা তাঁহার চিরপরিচিত। আমরা কত দিন বাণীর বীনা ধ্বনি শুনিয়া পুলকিত হইয়াছি।

রাজসাহীবাসীর নিকট শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন উকিল মহাশয় সুপরিচিত। এ "বাণী" অমরার নহে—এ বানী রজনী বাবুর। যাঁহার সহিত এত সম্বন্ধ নিরপেক্ষ ভাবে তাঁহার বাণীর সমালোচনা করা অসম্ভব। আত্মীয়ের দোষ নয়নগোচর হয়না—পূর্ব্ব হইতে মন তাঁহার গুণের দিকেই আকৃষ্ট হয়।

মুদ্রাযন্ত্রের অনুগ্রহে ও ক্রেতাদিগের উৎসাহে প্রতি বৎসর কতপ্রকার "গানের বহি" যে সাহিত্যের বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু কয় খানি থাকিতেছে? কেহবা সমালোচকের তীব্র কষাঘাতে কেহবা দূর হইতে অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা দেখিয়াই পলায়ন করিতেছে। যাহারা থাকিতেছে তাহারাও কি সহজে বসিবার আসন পাইতেছে? যাহার বাহুবল আছে তাহার ত কথাই নাই—যাহার বাহুবল নাই, তাহার বল "সুপারেশ।"

সেকালে একরকম কবিতা রচিত হইত, তাহা এ কালের পাঠকের নিকট তৃপ্তিকর বলিয়া মনে হয়না। সেকালের যে সকল গান আছে তাহার সকল গুলিই যে একালের লোকের মনোরঞ্জনে সমর্থ; এমত বোধ হয় না। রুচির পরিবর্ত্তনের সহিত সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। দেশের সাহিত্যেই সে পরিবর্ত্তনের পরিচয় পরিস্ফুট।

---

* মূল্য ॥০ আনা। গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয় বাবু ক্ষুদ্র ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"কাহারও বাণী পদ্যে, কাহারও পদ্যে কাহারও বা সঙ্গীতে অভিব্যক্ত। রজনীকান্তের কান্ত পদাবলী কেবল সঙ্গীত।" এই ভূমিকা পাঠে মনে হয় যে, অক্ষয় বাবু বলিতে চাহিয়াছেন—রজনী বাবুর "বাণী" সুধু গানের হিসাবেই দেখিতে হইবে, কবিতার হিসাবে নহে। ভূমিকা পাঠ করিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহাই বলিলাম।

একখানি কবিতাপুস্তক এবং একখানি গানের বহি, এতদুভয়ের মধ্যে কবি বিশেষে পার্থক্য আছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অন্ততঃ সময় এবং সাহিত্যের পরিবর্ত্তনে একালে সেই পার্থক্য বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে;—সেকালে হয়ত তেমন ছিল না। কেবল গানের জন্যই যাহা রচিত হইয়াছে, তাহার সমালোচনা একরূপ; কিন্তু কবিতার জন্য কবিতা রচনা করিয়া বা মাসিক ও সাপ্তাহিকে তাহা মুদ্রিত করিয়া অবশেষে সুর সংযোগ করিলে সেই সকল কবিতাকে সুধু 'গান' বলিলে তাহাদিগের সমালোচনা কবিতাপুস্তকের সমালোচনার মতই হইবে বলিয়া মনে হয়।

প্রত্যেক কবিতাইত সুর সহযোগে গীত রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। আজকাল এমন অনেকই হইতেছে। কি ইংরাজি, কি সংস্কৃত, কি বাঙ্গলা সাহিত্যে—কোন স্থানেই ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে, বরং বহুল। "God Save the Queen", বা "Ye Mariners of England" বা "Sweet Home" প্রভৃতি ইংরাজি সঙ্গীত ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসেও যেমন স্থান পাইয়াছে, তেমনি আবার ইংরাজি গানের ইতিহাসেও আদৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জয় দেবের—

"প্রলয় পয়োধিজলে ধৃত বানসি বেদম্।
বিহিত বিচিত্র চরিত্রম খেদম্।
কেশবধৃত মীন শরীর জয় জগদীশ হরে॥" প্রভৃতি

অথবা—

"ললিত লবঙ্গ লতা পরিশীলন
কোমল মলয় সমীরে।
মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল—
কুজিত কুঞ্জকুটীরে॥" প্রভৃতি

গানের হিসাবে দেখিলেও যেমন সুন্দর— সুধু কবিতার হিসাবে দেখিলেও তেমনি। এই সকল গান বা কবিতা এক সময়ের সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিয়াছে।

আমাদিগের বঙ্গদেশে হেম বাবু, রবি বাবু, প্রমথ বাবু প্রভৃতি বঙ্গ কবিকুলের অনেক কবিতা—কবিতাও বটে, গীতও বটে। গানের পুস্তকেও তাহাদিগের স্থান আছে, আবার কবির কাব্যেও তাহাদিগের স্থান আছে। "কতকালপরে বল ভারতরে" বা "সুন্দর সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও" বা "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়" এবং রসিক কবি দ্বিজেন্দ্রলালের—"Reformed Hindus", "আমরা বিলেত ফের্ত্তা ক'ভাই", "আমরা বহিয়া আনিয়া দেইগো, তোমরা বসিয়া খাও" প্রভৃতি কবিতা সুধু গান নহে, কবিতাও বটে। বঙ্গকবিকুলের এমন অনেক কবিতাই আছে যাহা 'গান' হইয়াও দেশের স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, কাব্যের অঙ্গ হইয়াছে। বাঙ্গীতে যাহা দেখিলাম তাহাও সুধু গান নহে।

একভাবে দেখিতে গেলে কবিতা ও গানে বিশেষ পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। "যে কথা সহজে বলিলে তাহাতে কোন রস পাওয়া যায় না, রসিকের কণ্ঠ ভঙ্গীতে তাহা অত্যন্ত সরস হয়। কখন কখন একটিমাত্র সামান্য কথায় এত শোক, এত প্রেম বা এত আহ্লাদ ব্যক্ত হইতে শুনা গিয়াছে যে, শোক বা প্রেম বা আহ্লাদ জানাইবার জন্য রচিত সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার শতাংশও পাওয়া যায় না। কিসে এরূপ হয়? কণ্ঠ ভঙ্গীর গুণে। সেই কণ্ঠ ভঙ্গীর অবশ্য একটা চরমোৎকর্ষ আছে। সে চরমোৎকর্ষ অত্যন্ত সুখকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? * * * কণ্ঠভঙ্গীর সেই চরমোৎকর্ষই সঙ্গীত।"* সুতরাং কণ্ঠভঙ্গী সহকারে যাহাই কেন উচ্চারণ করিয়া রসোদ্দীপক করিনা, তাহাই সঙ্গীত। কিন্তু স্বভাবানুকরণই রসোদ্দীপনার মূল রহস্য। কাব্য, ভাস্কর্য্য, চিত্র ও সঙ্গীত এই চারিবিদ্যাই স্বভাবানুকরণে সৃষ্ট। তন্মধ্যে কাব্য, সঙ্গীত ও চিত্র এই তিনটীই

* বঙ্গদর্শন। প্রথমখণ্ড।

অধিক সম্বন্ধ-বদ্ধ। মানবমনের আবেগ ও ভাবগুলি বর্ণনা করাই সঙ্গীতের একমাত্র না হউক অন্যতম কার্য্য। কবিতার কার্য্যও তাহাই। শোকের কবিতার যেমন রচনাভঙ্গী একরূপ, ব্যঙ্গকবিতার রচনাভঙ্গী একরূপ,—বীর-ভাবোন্মেষকারিণী শক্তিময়ী কবিতার ভাষা বা রচনাভঙ্গী অন্যরূপ; তেমনি গানের সুরও আবার বিষয় বিশেষে বিভিন্ন। করুণ রসের যেমন—ব্যঙ্গের সুর তেমন নহে। ক্রোধ, প্রেম, স্নেহ, ভয়, উৎসাহ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন চিত্ত বিকারের সুর ভিন্ন প্রকার। কিন্তু বিষয় বিশেষে কোন একটি কবিতার রচনাভঙ্গী ও সেই কবিতার সুর এক হিসাবে প্রায় একই রকম।

হাস্য, করুণ, বীর, রৌদ্র, শৃঙ্গার, ভয়ানক, অদ্ভুত বীভৎস এবং শান্ত এই নয় প্রকার রসই কাব্যে ব্যবহৃত হয়; আর এই নয় প্রকার রসেরই নয় প্রকার সুর। কিন্তু সমরসোদ্দীপক কবিতা ও সঙ্গীতের রচনাভঙ্গী ও সুর প্রায় একই রূপ। গীতে আর একটি জিনিষ আছে তাহা 'তাল'। 'তাল' কালের পরিমাপক। কিন্তু কবিতাতেও আবার তেমনি ছন্দ আছে। সকল কবিতাকেই কাব্য বলা যাইতে পারে—নবরসের কোন রস থাকিলেই হইল। 'বর্ণবৃত্ত' ও 'মাত্রাবৃত্ত' কাব্যে এই দুই প্রকার ছন্দই ব্যবহৃত হয়। সঙ্গীতেও তাহাই হইতে পারে। কিন্তু 'বর্ণবৃত্ত' ছন্দ সঙ্গীতে অতিশয় এক ঘেয়ে হয় বলিয়া সঙ্গীতকারগণ তাহা ব্যবহার করিতে চাহেন না। সঙ্গীতে অপর বৃত্তটিই ব্যবহৃত হয়।

"করিব বলিয়া রহিলে বসিয়া, করা কভু নাহি হয়।
করণীয় যাহা, আশুকর তাহা, বিলম্ব উচিত নয়।"

সদ্ভাবশতকের উক্ত দুইটি পদ লঘুত্রিপদী ছন্দে রচিত। উহাদিগকে গানের হিসাবে ভাগ করিলে—

| ক রি ব | ব লি য়া | র হি লে | ব সি য়া | ক রা ক |
| ভু না হি | হ য় - | - - - |

অথবা—

করিব বলিয়া, রহিলে বসিয়া, করা কভু নাহি হয়। এইরূপ বিভাগ করিতে হইবে। সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই এই বিভাগ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

এই সকল সমৃতা দেখিয়া মনে হয়,—"কান্ত পদাবলী" সঙ্গীতেই অভিব্যক্ত হউক, আর যাহাই হউক, "বাণীর" সমালোচনা কবিতা পুস্তকের হিসাবেই করিতে হইবে।

এক শ্রেণীর গান আছে যাহা কোন কালেই বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইবে না। আবার এক শ্রেণীর এমন কতকগুলি গান আছে যাহারা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়া ভাষা, ভাব, রুচি প্রভৃতির পরিচয় প্রদান করিবে। রামবসু বা নীলুঠাকুর, নিধুবাবু বা মহাতাবচাঁদ ইঁহারা সকলেই গীত রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল গীত বা তাহাদিগের রচয়িতারা কোনদিনই বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হন নাই—হইবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু রামপ্রসাদ বা দাশরথী বা কমলাকান্ত বা নীলকণ্ঠ,—রবিবাবু বা প্রমথ বাবু যে সকল গীত রচনা করিয়াছেন সে সমুদয় গীত তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সমসাময়িক সাহিত্যের পরিচয় স্বরূপ চিরকাল স্থায়ী হইবে। রজনী বাবুকে আমরা একজন 'নীধু বাবু' বা 'গোপালে উড়ে' বলিয়া মনে করিলে তাঁহার কবিতা বা গীতের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম না।

'বাণীর' ক্ষুদ্র জীবনের তিনটি অংশ—'আলাপ', 'বিলাপ' ও 'প্রলাপ'। আলাপে রজনীকান্তের দীপ্ত যৌবনতেজ, 'বিলাপে' হীনতেজ বৃদ্ধ রজনী কান্ত—'প্রলাপে' তাঁহার প্রলাপ।

আজকাল কবিতার ও গল্পের যুগ চলিতেছে। যিনি অক্ষর গুণিয়া, কথা মিলাইয়া কবিতা লেখেন তিনিও একজন কবি। এই যুগে কথার বাহারে ভাবের বাসর অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে। শব্দমন্ত্রেই এযুগের কবিগণ দীক্ষিত;—এখন শব্দ আগে, তারপর ভাব। সেই শব্দগুলির প্রয়োগ যদি আবার ঠিক হয় তাহা হইলেও ভাল,—কিন্তু অনেক সময়েই দেখিতে পাওয়া যায় কবি ঝঙ্কার করিয়া উঠিলেন, আর মূর্খ শ্রোতা একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, আর একবার আকাশের দিকে চাহিল। মাতৃভূমির কবি মাতৃভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন, অথচ তাহা বুঝিতে না পারিয়া লজ্জিত হইল। কবিকে কিছু বলিবার উপায় নাই—তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত কবি! এখনকার দিনে যদি সুন্দর ভাবকুসুমশোভিত কবিতার একখানি সাজি দেখিতে পাই, তাহা হইলে মনে হয়,—

অনেক দিন বুঝি আর এমন দেখিব না। তাই যখন 'বাণী' দেখিলাম, তখন বড় আনন্দ হইল। 'বাণীর' বাহিরে কিছুই নাই—বাণী অনলঙ্কৃতা। কিন্তু বাণীতে যাহা আছে, তাহা আবার অনেক গ্রন্থেই নাই। রজনী বাবুর 'বাণী' মলিনা;—কিন্তু কাঙ্গালিনী নহে, নিরাভরণা। 'বাণীর' আন্তরিক সৌন্দর্য্যই তাহার ভূষণ। শকুন্তলা নিরাভরণা তাপসকন্যা—তপস্বীরা দরিদ্র। কিন্তু শকুন্তলা রমণীগৌরবে রাজরাণী।

আলাপেই রজনীবাবু "গভীর" ঝঙ্কারে গাহিয়া উঠিয়াছেন—

"সেথা আমি কি গাহিব গান ?
যেথা, গভীর ওঙ্কারে, সাম-ঝঙ্কারে
কাঁপিত দূর বিমান।"

সেই "পরম-প্রেম সুন্দরের", সেই "জ্ঞান-নয়ন-নন্দনের", সেই "পুণ্য মধুর নিরমলের" বন্দনা বিফল হয় না। যেখানে শুভ্রকমলাসীনা বাণী স্বর সপ্তকে বীণা বাঁধিয়া 'কঙ্কণ ঝঙ্কারে' বীণা ঝঙ্কার করিয়া উঠিয়াছিলেন, আর সেই বীণা ঝঙ্কারে রুদ্ধ তটিনী-জলপ্রবাহ উছলিয়া উঠিয়াছিল, সেখানে 'বাণীর' বীণা ঝঙ্কার স্থান না পাইতে পারে কিন্তু নিস্ফল নহে—মহা গিরি হইতে সামান্য ধুলি পটল পর্য্যন্ত সকলেরই কার্য্য আছে।

আলাপে যে সকল কবিতা আছে তন্মধ্যে জন্মভূমি, উদ্বোধন, মা, নির্ভর, কল্লোলগীতি, যোগ, শুদ্ধপ্রেম প্রভৃতি কতকগুলি কবিতায় ভাবের লহর উঠিয়াছে। পড়িলে, আবার পড়িতে ইচ্ছা হয়। শুধু শব্দ—মন্ত্রে ভাসিয়া বাণীর কবি ভাব ও সৌন্দর্য্যকে বিস্মৃত হন নাই। সে ভাব বাছিয়া বাহির করিতে হয় না—কবিতাগুলির দিকে চাহিলেই নয়ন গোচর হয়। তবে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন নূতন কিছু জানিবার, বুঝিবার, শিখিবার আছে কি ? তাহা নাই। সহজকথা, জানা কথা—তাহাই নূতন ভাষায় বাণীর ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়াছে।

একটি কথা বলিবার আছে। বিলাতী কি সবই খারাপ ? "জাতীয় উন্নতিতে" বিলাতীভাবের পিতৃশ্রাদ্ধ হইয়াছে। তাই মনে করিয়াছিলাম 'জাতীয় উন্নতির' কবি কোন কারণেই বিলাতীভাব গ্রহণ করিবেন না—

'বাণী' নিতান্ত দেশী রকমেরই হইবে। কিন্তু দেখিতেছি, তাহা নহে, কেমন যেন, আমাদের "অস্থি মজ্জাগত সাহেবী দৃষ্টান্ত" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই বোধ হয় কবির অজ্ঞাতে একটা বিদেশী ভাব আসিয়া তাঁহার 'বিশ্বরচনাকে' ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। পড়িয়াই Dryden এর কথা মনে হইল। তিনি বলিয়াছেন—

"When nature underneath a heap
Of jarring atoms lay,
And cou'd not heave her head,
The tuneful voice was heard from high:
Arise ye more than dead."
&c. &c.

'বাণী' আমাদিগের যত্নের জিনিষ—তাই বাণীর উপর সমালোচনার তীব্র কশাঘাত কিঞ্চিৎ 'দৃষ্টি কটুতা দুষ্ট' এবং তুষ্টিময় নহে বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু সমালোচনার জন্য সকল কথাই বলিতে হইতেছে। যাহা হউক, রজনী বাবুর 'বিশ্বরচনা' Dryden এর 'বজ্‌নিশ নকল' বলিতেছি না।

বিশ্বরচনায় বিশ্বসৃষ্টির যে সুন্দর বর্ণনা আছে তাহা বস্তুতই মনোরম। কবি গাহিয়াছেন—

"চির প্রেম নির্ঝরের একটি বুদ্বুদ ন'য়ে
ফেলে দিলে, প্রেমধারা চলিল অশ্রান্ত ব'য়ে,
অমনি জননী করিল স্নেহ, সতীপ্রেমে পূর্ণদেহ,
গ্রহ ছুটে গ্রহার পাছু।
ফেলায়ে ছিটায়ে দিলে, অক্ষয় সৌন্দর্য্য তুলি,
ভাবচ্ছটা উছলিল মোহন বদন তুলি;
অমনি, অনন্ত বরণ আসি, ছড়াইল শোভা রাশি,—
ধন্য তব নিত্য কারুকাজ।"

সমালোচনা ক্রমশঃই দীর্ঘ হইতেছে সুতরাং আর কিছু উদ্ধৃত করিব না।

তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি আলাপেই রজনীকান্তের যৌবনতেজ।

বঙ্গসাহিত্যে যাঁহারা প্রথিত নামা কবি তাঁহাদিগের ভাষা ও ভাবের প্রভাব উদীয়মান কবিদিগের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের যে প্রতিভা আছে নবকবিদিগের তাহা নাই। তাই দোষগুলি অনুকৃত হইয়াছে—গুণগুলি নহে। এখন বঙ্গসাহিত্যের এমন একটি সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে নিরঙ্কুশ কবিকুলকে একটি গণ্ডীর ভিতর বাঁধিয়া রাখিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

আমি যে অনুকৃত দোষগুলির কথা কহিতেছিলাম তাহার প্রধান এবং প্রথমটি শব্দ সঙ্কলনেই দেখিতে পাওয়া যায়। মিলের খাতির এবং ঝঙ্কারের খাতিরে নিরর্থক কতকগুলি শব্দ সঙ্কলিত হয় যাহারা সাহিত্যে আবর্জ্জনা স্বরূপ। বাণীতেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কিন্তু সে দোষ বাণীর কবির নহে—সে দোষ কবিকুল চূড়ামনি দিগের।

'বরষার' মিলের জন্য 'হয়ষা' 'দরশা' প্রভৃতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুর কাব্য-গ্রন্থে আদৃত হইয়াছে; কিন্তু সাধারণে এখনও সমাদর পায় নাই।

'রণজ্' অর্থে রং করা বুঝায়। 'রণজ্' হইতে 'রঞ্জিতের' উৎপত্তি। সুতরাং 'অগণিত-গনি-রঞ্জিত নভো-নীলাঞ্চলা' কেমন করিয়া সুসঙ্গত হয় বুঝিতে পারি নাই। এরূপ না বোঝা জিনিষ আরও অনেক আছে—দুই চারিটি মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

'বধির যবনিকা' আবার কেমন? আর সেই 'বধির যবনিকা' তুলিয়া 'চির অলোক লোক' দেখাইবার ও দেখিবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না।

'সান্ত্বনা' কেমন করিয়া আবার 'অমৃত সৌরভের' সহিত তুলিত হইল? 'করুণ'ত সর্ব্বব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে। করুণের লিঙ্গজ্ঞান আদৌ নাই—তাই সে যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই হইয়াছে। করুণকে ক্ষমা করিলাম কিন্তু করুণের কবিত জানেন যে পুংলিঙ্গ হইলে 'করুণ' 'করুণারস' প্রকাশ করে কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ হইবামাত্রই তাহার অর্থ হয় 'দয়া', 'অনুগ্রহ' ইত্যাদি। "বাণী" পড়িতে পড়িতে আমরাও করুণের তরুণ বিপদে মলিন হইয়াছিলাম।

চিরকালই শুনিয়া আসিতেছি প্রসারণ বা প্রসার বা প্রসারি:—কিন্তু

'পসারি' কখনও শুনিনাই * আমরা বলি, যে সকল স্থানে 'প্রসারি' রাখিলেও কোন ব্যাঘাত হয় না, সে সকল স্থানে জ্ঞানকৃত শব্দ হত্যার প্রয়োজন কি? শব্দের অবয়ব কথার বর্ণবিন্যাস, আজকাল অনেকেই পরিবর্ত্তন করিতে চাহিতেছেন, কিন্তু বিনা কারণে কতকগুলি সরল শব্দকে হাঁটুভাঙ্গা 'দ' করিয়া সাহিত্যের সংগ্রাম ক্ষেত্রে উপস্থিত করিবার প্রয়োজন দেখি না।

বাঙ্গলা কবিতার মধ্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক 'নাস্তি'র মত দুই একটি, সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। 'নাহি' লিখিলেও যেখানে চলে, সেখানে খিচুড়ি পাকাইয়া ঝাল লবনের গোলমালে যাওয়াটা কি উচিৎ? ঠিক এই একই কারনেই প্রসাদ-পদাবলীও দুষ্ট।

বঙ্গকবিগণ বোধ হয় ব্যাকরণের ধার ধারেন না। সে বিষয় কবিকুল নিরতিশয় নিরঙ্কুশ। তাই, যেমনই কেন বিশেষ্যের লিঙ্গ হউক না, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই বিশেষণাদি সংযুক্ত হইয়া থাকে;—সমাসাদিতে ও লিঙ্গ প্রভৃতির ইতর বিশেষ দেখিবার অবসর বা প্রয়োজন হয় না। যাহার যেমন রুচি। ইহা ভাল কিনা ভাবিবার বিষয় বটে। সমাস সম্বন্ধে ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মাদির ব্যভিচার সাহিত্যে কুদৃষ্টান্ত। নিম্নে দুই একটি সমাসান্ত পদ তুলিয়া দিতেছি তাহা ব্যাকরণ সঙ্গত কিনা পাঠকগণ ও কবি ভাবিয়া দেখিবেন?—

---

* প্রাচীন কবিদিগের গ্রন্থে কোন কোন স্থানে "পসারি" দেখিতে পাওয়া যায়:—

"এত কহি হরি, দুবাহু পসারি
রহে পথ আগুলিয়া।
জ্ঞানদাস কয়, কিবা করভয়
যাহ হাত ঠেলা দিয়া।"

কিন্তু প্রাচীন কবিগণ প্রায়ই সাধারণ কথিত ভাষাতেই কবিতা রচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের বঙ্গকবিতা ও প্রাচীন কবিদিগের কবিতা এতদুভয়ে অনেক প্রভেদ।

"অগণিত-মণি-রঞ্জিত-নভো-নীলাঞ্চলা" আবার অন্যত্র—"জ্যোতিঃ স্রোতোমাঝ"। এরূপ দৃষ্টান্ত বাণীতে বিরল নহে।

বাণীতে বাণীর স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃতে দেখিয়াছি—

"তরুণ শকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষন্না সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্বল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ
সকল বিভব সিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্দেবতা নঃ॥"

রজনী বাবুর বাণীর করে সুধুই বীণা। কিন্তু—

"জ্যোতিষ-দরশন-বেদ-গণিত কবিতা
শোভে কোমল কোলেরে।"

আলাপে থাকিয়া আমরা বিলাপের কথা ভুলিয়াছিলাম। "বিলাপে" বিলাপ ভিন্ন আর কি করিব? বিলাপে "পদাঙ্কই" উল্লেখ যোগ্য বলিয়া মনে হয়,—

"প্রাণের পথ ব'য়ে গিয়াছে সে গো;
চরণ-চির-রেখা আঁকিয়ে যে গো।
লুটায়ে আশা-ধূলে, মোহন অঞ্চল,
নূপুর মুখরিত চরণ চঞ্চল,
দুধারে ফুটাইয়ে, বাসনা-ফুল-রাশি,
আধেক প্রেম-গাথা শুনাইয়ে গো," ইত্যাদি।

"স্বপ্ন পুলক" মন্দ নহে কিন্তু বাসবদত্তা নামক একখানি বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থের আখ্যান বস্তুর ক্ষীণ ছায়া। "স্বপ্ন পুলকের" শেষ দুই ছত্রে আছে—

"যা' কিছু আমার দিতে পারি সবি
সুখ-স্বপনেরি লাগিয়া।"

এস্থলে "সুখ-স্বপনেরি" সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেরূপ হওয়ায় সেই স্বপ্নমুগ্ধার প্রাণপণ আকুলতা যেন খর্ব্ব হইয়াছে। সেই প্রেমকাতরা বিরহ বিধুরা ব্যথিতা বালা তাহার সুন্দরের সেই স্বপ্নে দৃষ্ট মুখখানির জন্য—সেই স্বপ্নে "হৃদি বিনিময়ের" জন্য—সেই স্বপ্নে "প্রেম আলাপনের জন্য, প্রণয়-

অভিমানের জন্য, প্রেম-কলহের জন্য" তাহার যাহা কিছু সবই দিতে পারে;—কিন্তু সুধু সুখস্বপনের জন্য বোধ হয় কিছুই দিতে পারে না। যেমন 'তারে', 'হ'ল', 'করি', প্রভৃতি শব্দ অর্থপ্রকাশের জন্য বন্ধনীর ভিতর দেওয়া হইয়াছে, তেমনি "সুখস্বপনেরি" পূর্ব্বে একটা "সেই" লাগাইলেই কবির মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইত। সুধু "সেই স্বপনেরি লাগিয়া" লিখিলেও "স্বপ্নপুলক" পূর্ণই থাকিত। "পূর্ব্ব রাগে" দেখিলাম;—"আঁখিজলে হাসি মাখা, কি করুণ বেদনা!" দেখিলাম, পড়িলাম—বুঝিতে পারিলাম না। হর্ষের অশ্রুর সহিত "হাসি মাখা" থাকিতে পারে, কিন্তু তখন "করুণ বেদনা" থাকা কি সম্ভব হয়?

হঠাৎ আবার কল্লোলগীতির কথা মনে হইল। কল্লোল-গীতি বড় সুন্দর। কল্লোলিনী কহিতেছেন—

"কূলে তোরা সংসার পেতে' মায়ায়ভুলে রয়েছিস্,
কত ফল আর ফুলের বাগান দালান কোঠা করেছিস্,
আমি গিয়ে লাগাই গোল, পেতে দি' এই নিঠুর কোল,
একটি মাত্র কূল রাখি, আর—
কাঁদিয়ে তোদের, আর এক কূলের মাথা খাই।"

কল্লোলিনী চলিয়াছেন—সেই অশ্রান্ত কল-গীতি শিকর-শীতল-পবনে গুঞ্জরিয়া উঠিতেছে—কল্লোলিনী সাগর সঙ্গমে ধাবমানা।

"(আমার) প্রাণের গানে সুধা ঢেলে,
প্রাণের ময়লা নীচে ফেলে,
বাঁধা ভেঙ্গে চুরে ঠেলে,—
কেমন করে যাচ্ছি চলে দেখনা তাই!"

ঠাকুর বাড়ীর কোন বিখ্যাত কবির একজন নিঠুর সমালোচক উক্ত কয়েক ছত্র দেখিবামাত্রই হয়ত বলিয়া উঠিবেন,—"ওঁরে বাঁধা বাঁধা ফিরে"। কিন্তু আমরা তাহা বলিনা। আমরা বলি উহা মুদ্রাকরের প্রমাদ। চন্দ্র স্থান ভ্রষ্ট হইয়া বিন্দুরূপে 'ব' এর শিরদেশে ভর করিয়াছেন। কবি লিখিয়াছিলেন, 'বাধা'।

"প্রলাপ" চিরদিনই প্রলাপ—তাহাতে নূতনত্ব নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবুর জীর্ণছায়া দেখিয়া কি মন উঠে?

আর অধিক কিছু কহিব না। 'বাণী' আমাদিগেরই। আমরা বাণীর কবিকে ভালবাসি বলিয়া তাঁহার বাণীকেও ভালবাসি। তাই এত কথা কহিলাম।

—:০:০—

স্বর্লোকগত সুরেশচন্দ্র সাহা প্রবর্ত্তিত।

উৎসাহ

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

১৩০৮

বর্ষ। ১৩০৯; ভাদ্র—কার্ত্তিক। ১০ম, ১১শ, ১২শ সংখ্যা।

সম্পাদক

ভক্তিবিনোদ

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল

উৎসাহপ্রেশ, রাজসাহী।

শ্রীমহিরুদ্দীন সরকার প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। এই তিন সংখ্যার মূল্য ॥৵

সূচীপত্র।

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
লজ্জাবতী	শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী	২৮
হেঁয়ালী	পণ্ডিত অনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থ	২৯
বিসর্জ্জন	... ...	২৯
মহাকাল	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন বি-এল	৩০
রঞ্জিনী (সমালোচনা)	„ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি-এ	৩১
তুমি	„ প্রমথনাথ রায় চৌধুরী	৩৩
মুসলমান প্রভৃতির ভারতাধিকারের হেতু	„ রজনীমোহন ঠাকুর	৩৪
মৃত্যুশয্যায়	„ কুমুদরঞ্জন মল্লিক	৩৫
বৎসরের দিন	„ সুরেশচন্দ্র ঘটক এম্, এ	৩৬
শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব	পণ্ডিত যোগীন্দ্রনাথ ভক্তিরত্ন	৩৭
আরতি (সমালোচনা)	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ	৩৮
আত্ম সমর্পন	„ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮
সংক্ষিপ্ত সাহিত্য সমালোচনা ...	... ...	৩৮
সঙ্গ-হারা	„ যতীন্দ্রমোহন বাগচী-বি-এ	৩৯
ইংরাজি শিক্ষিতের হস্তে বঙ্গসাহিত্য...শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ		৩৯
চাহিনা মরিতে	শ্রীযুক্ত ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৯

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

(উৎসাহ সম্পাদকের অনুমোদিত।)

এবার বহুবিলম্বে আমরা পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত হইলাম। ই
একমাত্র কারণ—প্রেসের গোলযোগ। মফঃস্বল হইতে কাগজ বাহির ক
যে কতদূর দুরূহ ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কাহারো কর
আসিতে পারে না। ১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণ হইতে ১৩০৯ সালের কা
পর্য্যন্ত এই সংখ্যায় আমরা পঞ্চম বর্ষ শেষ করিলাম। ১৩১০ সালের বৈ
হইতে উৎসাহের ষষ্ঠবর্ষ গণনা করা হইবে। বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ ক
আমাদের হিসাব নিকাশের ও গ্রাহকগণের কাগজ বাঁধাইয়া রাখিবার সু
হইবে বিবেচনায় এই পরিবর্ত্তন করিলাম। বৈশাখের উৎসাহ মু
হইতেছে। মাসের প্রথম সপ্তাহেই গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হইবে।

যে সকল মহোদয়গণ ৫ম বর্ষের মূল্য এখনো দেন নাই, তাঁহাদের নি
বিনীত প্রার্থনা অনুগ্রহ করিয়া টাকা দেড়টী পাঠাইয়া যেন বাধিত ক
আমরা অতিশয় ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছি।

ষষ্ঠ বর্ষের মূল্য জন্য আগামী সংখ্যা ভিঃপিঃতে পাঠান হইবে। যাঁ
আপত্তি আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পূর্ব্বেই যেন জানান।

বিনিত—'উৎসাহ' সত্বাধিকারী ও কার্য্যাধ্য
ঘোড়ামারা, রাজ

পরলোকগত সুরেশচন্দ্রসাহা প্রবর্ত্তিত।
শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত।

উৎসাহ।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

৫ম বর্ষ, { রাজসাহী, ভাদ্র, ১৩০৯। } ১০ম সংখ্যা।

লজ্জাবতী।

হৃদয়ের বিম্বখানি পড়েছে আঁখিতে
সেই আঁখি তুলে' তুমি দেখেছ আমায়;
বারেক চাহিয়া মুখে অমনি চকিতে
বল অয়ি আকুলিতা, পলালে কোথায় ?
সরমে জড়িত তব চঞ্চল চরণ,
লাজে আধ' গুঞ্জরিত দু'খানি নূপুর,
স্খলিত, শিথিল তব তনু-আবরণ,
অঙ্কিত রহিল চিত্তে অতি সুমধুর !
একাকী ছিলাম বসে' দগ্ধ দ্বিপ্রহরে
তটিনীর তটপ্রান্তে বকুল-তলায়;
কে জানিত সে বিজনে, সেই অবসরে
মানসী প্রতিমা তুমি,—দেখিব তোমায় !
কল্পনার প্রতিমূর্ত্তি তুমিগো কুমারি,
মিথ্যা ভয়ে পলাইলে চিত্ত-অধিকারি' !

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

হেঁয়ালী।

হেঁয়ালী বা প্রহেলিকা বাঙ্গালা ভাষায় কোন্ সময়ে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা নিশ্চিত রূপে বলিতে পারি না। হেঁয়ালী যে "জামাই ঠকান প্রশ্ন" বা সমস্যা পূরণাদি রূপে বহুকাল হইতেই বাঙ্গালায় রাজত্ব করিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এখনও কোন কোন সম্প্রদায়ের বিবাহ সভায় নানা প্রকার জটিল প্রহেলিকা প্রশ্ন পূর্ব্বের ন্যায় মীমাংসিত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর প্রাচীন বা আধুনিক প্রহেলিকা (জামাই ঠকান রূপী) বহু পরিমানে গ্রাম্যতা দোষ দুষ্ট। তবে মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি যে গভীর চিন্তাশীলতা ও প্রসংশনীয় রচনা চাতুর্য্যের পরিচয় প্রদান না করিতেছে, এমন নহে। প্রাচীন স্ত্রী সমাজেও এক প্রকারের প্রহেলিকা প্রচলিত ছিল। তাহার সাধারন নাম "শ্লোক ভাঙ্গান", তাহার মধ্যেও বহু সময়ে উক্তি-বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইত। উদাহরণ স্বরূপ একটি দৃষ্টান্ত এই স্থলে উদ্ধৃত হইল।

"এই আছে, এই নাই, তারা বলে বাঘ্ নাই" এই মেয়েলী হেঁয়ালীটীর উত্তর, বিড়াং।

এইরূপ অনেক প্রহেলিকাত্মক প্রমোদ-প্রশ্ন প্রাচীনা মহিলাগণের প্রসাদে জন্মলাভ করিয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় নব্য বঙ্গবধূগণের অযত্নে এখন তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত প্রায়। নবীনা বঙ্গরমণী সম্ভবতঃ হেঁয়ালীর আলোচনা লজ্জাজনক মনে করেন।

পূর্ব্বে ছাত্রবৃন্দের মধ্যে ও প্রহেলিকা প্রশ্ন বিশেষ ভাবে আলোচিত হইত। একে অন্যকে হেঁয়ালীর কূট তর্কে পরাভূত করিতে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তা শক্তির পরিচয় প্রদান করিত। আধুনিক ছাত্র সম্প্রদায়ও হেঁয়ালীকে ঘৃণার সহিত অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছে। এই রূপে নানা স্থান-বিকাড়িত প্রহেলিকা-সুন্দরী "বাঙ্গালা" ছাড়িতে বাধ্য হইতেছে।

কতিপয় বৎসর অতীত হইল, ৺ প্রমদাচরণ সেন মহাশয়ের যত্নে ও

উদ্যোগে "সখা" নামক একখানি শিশুপাঠ্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই মাসিকখানিতে প্রমদা বাবু "ধাঁধাঁ" নাম দিয়া অনেক রুচি মার্জ্জিত কৌতুহলোদ্দীপক প্রহেলিকা প্রকাশ করেন। তদবধি বাঙ্গালা ভাষার শিশুপাঠ্য মাসিক গুলিতে শিশুসেব্য হেঁয়ালী প্রচারিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়েও "অতিথি" "মুকুল" প্রভৃতি শিশুরঞ্জন মাসিকে হেঁয়ালী লিখিত হইতেছে। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি,—প্রমদা বাবু প্রবর্ত্তিত "সখা"তে প্রকাশিত মনোমদ সুখপাঠ্য হেঁয়ালীগুলি যেরূপ সর্ব্ব সাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, এখনকার 'ধাঁধাঁ' যেন সেইরূপ হইতেছে না। ইহা বলা সম্ভবতঃ অসঙ্গত হইবে না, প্রমদা বাবু প্রবর্ত্তিত প্রহেলিকার তরল জ্যোতিঃ আজিও বালক বালিকাগণের হৃদয় কন্দরে আনন্দ-আলোক বিকীর্ণ করিতেছে;—কারণ হেঁয়ালীর এই ক্ষীণ আলোচনা তাহারই অমৃতময়ী পরিণতি। এই স্থলে আর একটি কথাও উল্লেখ যোগ্য। অনেকে মনে করেন, বালক বালিকাদিগের চিত্ত বিনোদনের জন্যই প্রহেলিকার সৃষ্টি। যুবক বা বৃদ্ধের চিত্তরঞ্জন করিতে হেঁয়ালীর কোনই সামর্থ্য নাই।

এই কথা কি সত্য? শিশুদিগের মনস্তুষ্টির নিমিত্তই কি প্রহেলিকা জন্মলাভ করিয়াছে? ইহার কি অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই?

হেঁয়ালী নব্য বাঙ্গালায় শুধু শিশুগণেরই প্রিয় বস্তু হইতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে জানা যায়, প্রাচীন সুরসিক সুধামণ্ডলী বৈচিত্র্য-পূর্ণ প্রহেলিকা-আলোচনায় অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিতেন। কালিদাস বররুচি প্রভৃতি মহা কবিগণও যে সমস্যা পূরণাদি-প্রহেলিকায় যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিতেন,—তাহার ভূরি ভূরি সরস গল্প প্রচলিত রহিয়াছে। বড় বড় পণ্ডিত মহাশয়েরাও প্রহেলিকার কূট প্রশ্নোত্তরে আপনাদের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। অধিক কি, প্রহেলিকা এক সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল যে, দর্শন তত্ত্বজ্ঞ আলঙ্কারিকগণও ইহার নামোল্লেখ করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। দর্পনকার বিশ্বনাথ যদিও প্রহেলিকার অলঙ্কারত্ব স্বীকার করেন নাই, তথাপি যে ইহাতে উক্তি বৈচিত্র্য আছে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন

যুগের প্রহেলিকা বহু শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। কতকগুলিতে অক্ষর বাহুল্য, কতকগুলিতে অক্ষর চ্যুতি প্রভৃতি থাকিত। আর এক শ্রেণীর প্রহেলিকায় কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া সম্বোধন পদ প্রভৃতি এইরূপ চতুরতার সহিত সন্নিবেশিত হইত যে, তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া বহু সময়ে বহু ধীমান্ পণ্ডিতও মস্তিষ্ক বিলোড়ন পূর্ব্বক উপহাসাস্পদ হইয়া পড়িতেন। আবার আর এক জাতীয় প্রহেলিকা-শ্লোক পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত ছিল, যাহা পাঠ বা শ্রবণ করা মাত্র অসম্ভব অসঙ্গত ও পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য শূন্য বলিয়া প্রতীত হইত। এই শ্লিষ্ট শব্দ রচিত শ্লোকগুলির দুইটি অর্থ পরিজ্ঞাত হইলেই অর্থ প্রতীতির কোন ব্যাঘাত জন্মিত না। এই শ্রেণীর দ্ব্যর্থ ঘটিত প্রহেলিকা রচনায় অগাধ পাণ্ডিত্য ও রচনা চাতুর্য্য অভিব্যক্ত হইত। আমরা "উৎসাহ" পত্রিকার পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত কয়েকটী দৃষ্টান্ত এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

১। "মদমত্ত ময়ূরস্য গিরেঃ মাল্যবত স্তটে।
সীতা বিরহিতং রামং মুহুর্মুহু রমোহয়ৎ" এই শ্লোকটী পাঠ বা শ্রবণ করা মাত্র বুঝা যায়, যে পর্ব্বতে ময়ূরগণ মদমত্ত, সেই মাল্যবান্ পর্ব্বতের তটভূমিতে সীতা বিরহিত রামকে বার বার মোহিত করিয়াছিল। কে করিয়াছিল? কর্ত্তা কে? বিশেষ অভিনিবেশের সহিত পাঠ না করিলে কিছুতেই কর্ত্তাটীকে বাছিয়া বাহির করা যায় না। এই শ্লোকের 'গিরেঃ' পদটীই চতুরতার পরিচায়ক। এইটী গিরি শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে নিষ্পন্ন পদ নহে। ইহা একটি সন্ধি বিহিত পদ। গিরা+ইঃ সন্ধি করিলেই "গিরেঃ" হয়। গিরা শব্দের দ্বারা ইঃ কামদেব অর্থাৎ মদমত্ত ময়ূরের শব্দ দ্বারা কামদেব রামকে মোহিত করিয়াছিলেন। কেমন সুন্দর কর্ত্তাটীকে গোপনভাবে লুক্কায়িত করিয়া রাখা হইয়াছে।

২। "বটবৃক্ষো ময়া দৃষ্টঃ বারিবারণমস্তকে"। এই শ্লোকার্দ্ধে সম্বোধন পদটী গুপ্ত রহিয়াছে। ইহারও আপাততঃ এইরূপ অর্থই প্রতীত হয়, বারিবারণ মস্তকে অর্থাৎ তটভূমিতে আমাকর্ত্তৃক বটবৃক্ষ দৃষ্ট হইয়াছে। এই স্থলে 'বটবৃক্ষঃ' শব্দ নিপুণতার সহিত লিখিত। বটো+ঋক্ষঃ সন্ধি করিলেই 'বটবৃক্ষঃ' হয়। ইহার অর্থ হয়, 'হে "বটো" ব্রাহ্মণ বালক আমি

"ঋক্ষঃ" ভল্লুক দেখিয়াছি। এইরূপ ক্রিয়া কর্ম্ম প্রভৃতির গুপ্ত রচনাও আমোদ জনক।

৩। "কোজাগরী দিনে রাত্রৌ কোজাগর মহোৎসবে" এই বাক্যাংশে "কোজাগরী দিনে (লক্ষ্মীপূজার দিনে) কোজাগর মহোৎসবে (লক্ষ্মী পূজার উৎসবে) রাত্রিতে" এই পর্য্যন্ত অর্থই হঠাৎ বুঝা যায়। কিন্তু একটু চিন্তা করিলে দেখা যায়, এইটি একটি অসম্পূর্ণ বাক্যাংশ নহে, একটি ক্রিয়া পদ বিশিষ্ট সম্পূর্ণ বাক্য। "কো" কে "অজাগরীৎ", জাগিয়াছিল "ইনৌ", মহান্ কোজাগর উৎসবে? "অজাগরীৎ" ক্রিয়াটী কেমন সন্ধির পোষাক পরিয়া বহুরূপী সাজিয়াছে। কিছুতেই তাহাকে চিনিতে পারা যায় না। তারপর আর কতগুলি সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে;— যথা,—

৪। "যুধিষ্ঠিরস্য যা কন্যা নকুলেন বিবাহিতা।
পূজিতা সহদেবেন সা কন্যা বরদা ভবেৎ"।

এই শ্লোকটী শ্রবণ মাত্রেই আমরা বুঝি, "যুধিষ্ঠিরের যে কন্যা নকুল কর্ত্তৃক বিবাহিতা" ইত্যাদি। এই বিপরীত অর্থ বা বিরোধ ভঞ্জন করিতে হইলে শ্লোকস্থ দ্ব্যর্থ শব্দগুলির অন্য অর্থের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। তাহা এই, যুধিষ্ঠির হিমালয়, নকুল কুল হীন শিব (কারণ তিনি অনাদি) "সহ দেবেশ" দেবেন। শিবেন সহ অর্থাৎ শিবের সহিত, যিনি পূজিতা সেই গৌরী বরদাত্রী হউন। সংস্কৃত সাহিত্যে এই প্রকার বিরোধাভাস হেঁয়ালীর অভাব নাই, প্রবন্ধ বিস্তৃতি ভয়ে অধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব না। এখন সমস্যা পূরণাত্মক প্রহেলিকারও একটু নমুনা দেওয়া যাইতেছে—

"পিপীলিকা নৃত্যতি বহ্নিকুণ্ডে" এই শ্লোক পাদ বিষম বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিতেছে। পিঁপড়া আগুনের কুণ্ডে নৃত্য করিতেছে, এই প্রকার অর্থ কিছুতেই সঙ্গত হয় না। এই সমস্যাটী পূরণ করিতে আরও তিনটি 'পাদের' আবশ্যক। যেমন,—কো বেত্তি গুপ্তস্য রসস্য ভাণ্ডং? মধুরাদি রসের গুপ্ত ভাণ্ড অবগত হয় কে? উত্তর, পিপীলিকা। দ্বিতীয় প্রশ্ন, "ঘনাগমে কিং কুরুতে ময়ূরঃ" ময়ূরগণ মেঘোদয়ে কি করে?—নৃত্যতি। "সাধ্বাঃ স্ত্রিয়ঃ কুত্র তনূ ত্যজন্তি" সাধ্বী স্ত্রিরা কোথায় তনুত্যাগ করে? এই তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তর "বহ্নিকুণ্ডে"। এই রূপ "সিন্ধুরবিন্দু বিধুরা"

ললাটে", "ভাগীরথী তীর সমাশ্রিতানাং" প্রভৃতি পাদ পূরণাত্মক প্রহেলিকা গুলি বস্তুতঃই প্রীতিপ্রদ।

এই পাণ্ডিত্য পূর্ণ মনোমুগ্ধকর প্রহেলিকা গুলিকেও কেহ শিশুজনসেব্য বলিয়া ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিবেন কি? যে বৈচিত্র্যালঙ্কৃত প্রহেলিকা সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ হইয়াছে, যে প্রহেলিকার কূট রচনা বৃহস্পতিতুল্য পণ্ডিতদিগকেও মুগ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা বঙ্গসাহিত্যে স্থান পাইতে পারেনা কি? কেবল শিশুদের ভোগ্য বলিয়া হেঁয়ালীর প্রতি অনাদর প্রকাশ করা উচিত হইতেছে কি? আমাদের মতে সংস্কৃত প্রহেলিকার ন্যায় বাঙ্গালা প্রহেলিকাও যাহাতে উচ্চভাবে সৃষ্ট ও আলোচিত হইতে পারে, তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য।

এই স্থানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। সংস্কৃত সাহিত্যে আর এক প্রকার রচনা চাতুর্য্য নয়ন গোচর হয়। তাহা ঠিক প্রহেলিকা নহে, কিন্তু তজ্জাতীয়। একটি অষ্টদল পদ্ম প্রস্ফুটিত, তাহার প্রতি দলে অতি নিপুণতার সহিত শব্দ সন্নিবেশিত করা হয়, যাহা পাঠ করিলে সদর্থ বিশিষ্ট শ্লোক হইয়া দাঁড়ায়। এই "পদ্ম বন্ধ" কবিতার ন্যায় "খড়্গ বন্ধ" "সুরজ বন্ধ" প্রভৃতি বহু নিপুণ রচনা সংস্কৃত সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। বঙ্গ ভাষায় তাহা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না কি? এই প্রকার চিত্তা পূর্ণ রচনার সাহায্যে অবসর সময় বেশ সুখে অতিবাহিত করা যায়।

সংস্কৃত ভাষায় দ্বিতীয় উক্তি বৈচিত্র্য 'কাকু'তে প্রকটীকৃত। এই কাকু ও প্রহেলিকা নহে,—সমশ্রেণীর রচনা মাত্র। প্রশ্নকর্ত্তার মনোগত এক অর্থ ব্যঞ্জক প্রশ্নের উত্তর যদি উত্তরকারী কূটভাবে অন্য অর্থে প্রদান করে তবে তাহাকে 'কাকু' বলে। যথা,—কে যূয়ং? তোমরা কে? প্রশ্নকর্ত্তার উদ্দেশ্য পরিচয় জিজ্ঞাসা। উত্তরকারী কূটভাবে 'ক' শব্দের অর্থ জল ধরিয়া নিয়া বলিলেন, 'স্থলে এব বয়ং' আমরা স্থলেই আছি। প্রশ্নকর্ত্তা অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, আমার 'প্রশ্নঃ বিশেষাশ্রয়ঃ' প্রশ্ন বিশেষকে আশ্রয় করিতেছে, অর্থাৎ তোমরা যে ডেঙ্গায় আছ, তাহাত দেখিতে পাইতেছি, তোমরা কে, তোমাদের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। উত্তরকর্ত্তা হটিবার লোক নয়,

সে হাসিয়া বলিল, কিং ব্রুতে? বিহগোঽথবা ফণি পতিঃ যত্রাস্তে সুপ্তো হরিঃ। কি বলিতেছ, বিহগ গরুড় অথবা শেষ ফণি পতি অনন্ত? যে স্থানে শ্রীহরি অনন্ত শয়নে শায়িত? এই স্থলে বি শব্দের অর্থ বিহগ ও শেষ শব্দের অর্থ অনন্ত ধরিয়া উত্তরকারী কূটিল উত্তর প্রদান করিলেন। ইত্যাদি কাকুও অনেক সময়ে সুধীমণ্ডলীর চিত্তরঞ্জনে সমর্থ হয়। বঙ্গ-ভাষায় এই প্রকার 'কাকু' রচনাও কি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না? আমাদের বিশ্বাস, ভাষাতে যত নূতন নূতন বস্তু সন্নিবেশিত হইবে ততই ভাষার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত এবং পুষ্টি সাধিত হইবে।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র গুপ্ত কাব্যতীর্থ।

বিসর্জ্জন।

কেনারাম চক্রবর্ত্তী রেলীর বড় বাবু। আড়াই শত টাকা মাহিয়ানা পান। তা' ছাড়া চীনেবাজারে প্রকাণ্ড একটি দোকান—কারবারে প্রায় আশি হাজার টাকা খাটে। সহরের উপর সুবৃহৎ তিনটি বাড়ী। একটিতে নিজে বাস করেন, অপর দুইটি ভাড়া দেওয়া হয়। বাড়ী ভাড়া দিয়েও তিনি বেশ দু'পয়সা পান,—বার মাসে চব্বিশ শ।

কেনারাম বাবুর পৈতৃক কিছুই ছিল না, সকলি স্বোপার্জ্জিত। তিনি যখন রেলির বাড়ীতে কুড়ি টাকা মাহিয়ানার কেরাণী ছিলেন, সেই সময় হইতে তিনি 'ডারবি সুইপে' প্রতিবার পনর টাকা করিয়া দিয়া আসিতে-ছিলেন। দশ বৎসরকাল ধরিয়া ক্রমান্বয়ে অদৃষ্টের চঞ্চল লীলাখেলা ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়া অবশেষে তিনি পঁচাত্তর হাজার টাকা পান। সেই টাকার কতক দিয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন ও কতক দিয়া নিজের বাসের জন্য একটি ত্রিতল অট্টালিকা প্রস্তুত করেন। পরে ভাগ্যদেবীর শুভ দৃষ্টিতে পড়িয়া

ক্রমে ক্রমে উন্নতি করেন। আজ তিনি অক্লেশে কুড়ি লক্ষ টাকা বাহির করিতে পারেন।

কেনারাম বাবুর এক কন্যা বিমলা ব্যতীত কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। বিমলার বয়স এখন দ্বাদশ বৎসর। কিন্তু অপত্যস্নেহের একমাত্র কেন্দ্রস্থল বলিয়া কেনারাম বাবু আজ পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ দেন নাই। তাই বলিয়া তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া ছিলেন না। তিনি একটি ঘরজামাতার অন্বেষণ করিতেছিলেন। কিন্তু স্বনামেপুরুষোধন্য, পিতৃনামে মধ্যম, শ্বশুরের নামে অধম, শালার নামে অধমাধম—আজকালকার ছেলেরা এই শাশ্বতী নীতির অত্যন্ত মান্য করেন, তাহারা অধম বলিয়া পরিচয় দিতে একবারেই নারাজ। কাজেই ঘরজামাই পাইতে কেনারাম বাবুকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইল। যদি বা অনুসন্ধান করিয়া বাপে তাড়ান মায়ে খেদান গোছের দুই একটি ছেলে পাওয়া গেল, কিন্তু যেমন তেমন ছেলের হাতে প্রাণের বিমলাকে সমর্পণ করিতে চক্রবর্ত্তী দম্পতির মন উঠে না। শেষে ঘরজামাতার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহারা ভাল জামাই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

অল্পদিনেই বর জুটিল। যেমনটি খুঁজিতেছিলেন তেমনি একটি বর পাওয়া গেল। ডিমরার জমিদার গুরুচরণ রায়ের একমাত্র পুত্র অন্নদাচরণের সহিত বিমলার সম্বন্ধ স্থির হইল। গুরুচরণ বাবুর জমিদারীর আয় প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। চিরাচরিত নিয়মানুসারে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া সপরিবারে কলিকাতায় বাস করেন। অন্নদাচরণ এফ, এ ক্লাশে পড়ে। দেশে গুরুচরণ বাবুর খুব নাম ডাক, তাঁহার শাসনে ভেড়া বাঘ এক ঘাটে জল খায়।

গুরুচরণ বাবু বেশ একটি জমিদারী চাল চালিয়া শ্রেণীর বড় বাবুর আয়রণ চেষ্টের অর্দ্ধেক টসাইয়া পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিলেন। উচ্ছ্বসিত হর্ষ কোলাহল মিশ্রিত মঙ্গল বাদ্য বিনোদ; কামিনী কণ্ঠ বিনিঃসৃত উদ্দাম হুলুধ্বনি এবং বরপক্ষের হাস্য তরঙ্গের মধ্যে বিমলার সকরুণ অস্ফুট রোদন ধ্বনি, তাহার পিতৃগৃহ পরিত্যাগের কথা দশজনকে জানাইতে লাগিল। অশ্রুপূর্ণ লোচনে চক্রবর্ত্তী যুগল নিজের আঁধার ঘরের মাণিককে পরের ঘর আলো করিবার জন্য বিদায় দিলেন।

গুরুচরণ বাবুর বাড়ীতে স্ত্রী ব্যতীত কাঞ্চন নামে এক বিধবা পুত্র বধূ ও তাহার একটি ভ্রাতা ছিল। বধুর পিত্রালয়ের অবস্থা খারাপ, ছোট ভাইটি ব্যতীত আপনার কেহই নাই। বিধবা হইবার পূর্ব্বে সে ভ্রাতার প্রতিপালনের নিমিত্ত মাসে মাসে কিছু কিছু করিয়া তাহার নিকট পাঠাইয়া দিত। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ হওয়ার পর হইতে সে তাহাকে নিজের কাছেই রাখিত। বলা বাহুল্য গুরুচরণ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিবাহের অল্প দিবস পরেই মারা যায়।

তিন বৎসর হইল বিমলার বিবাহ হইয়াছে— এখন সে শ্বশুর বাড়ী। গুরুচরণ বাবু পুত্রবধূর গুণে একবারে মোহিত হইয়াছেন। তাহার বুদ্ধি বিবেচনা, ঘর গৃহস্থালীর সুবন্দোবস্তে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। সহরে এক রত্তি মেয়ে যে এত বিচক্ষণ, এত কর্ম্মপটু, এত বিলাসবাসনা শূন্য হইতে পারে তাহা তাঁহার পূর্ব্বে ধারণা ছিল না। পুত্রের বিবাহের পর তিনি ভাবিয়াছিলেন, এইবার হইতে ডাক্তারের ডিস্পেন্সরিতে, এসেন্সের দোকানে, কাটা কাপড়ের বিপণীতে তাঁহাকে আলাদা করিয়া হিসাব খুলিতে হইবে, কিন্তু বিমলা ঘরে আসার অল্পদিন পরেই তাঁহার সে ভ্রম অপনীত হইল। তিনি ছোট বৌমাকে এতই ভাল বাসেন, তাহার বুদ্ধি-বিচক্ষণতার উপর এতই নির্ভর করেন যে তিনি সময়ে সময়ে তাহার পরামর্শ গ্রহণে বৈষয়িক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

দিন যাইতে লাগিল, একরকম সুখেই কাটিতে লাগিল। অন্নদাচরণের কিন্তু লেখাপড়া হইল না। সে দুইবার এল, এ পরীক্ষায় ফেল হইয়া এসে পড়িল!

ছোট বৌর প্রতি শ্বশুরের অত্যধিক ভালবাসা দেখিয়া কাঞ্চনের ঈর্ষার বাতি জ্বলিয়া উঠিল। বিমলা তাহাকে বড় ভগিনীর ন্যায় ভয় ও ভক্তি করিত। তাহার আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে প্রতিপালন করিত, কোন দিনই তাহার প্রতি অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করে নাই, তবুও কাঞ্চন তাহার প্রতি নারাজ হইল। শ্বশুরঠাকুরের সমস্ত স্নেহটুকু অপহরণ করাতেই তাহার ঈর্ষা অঙ্কুরিত হয় কিন্তু তিন বৎসর পর যখন কাঞ্চন শুনিল যে ছোট বধু অন্তঃস্বত্ত্বা তখন তাহার সেই ঈর্ষা, সেই মরমকা...

পল্লবিত হইয়া উঠিল। সে ভাবিয়াছিল শ্বশুরের মৃত্যু হইলে বিষয় সম্পত্তির কিছু অংশ পাইবে। কিন্তু ছোট বৌয়ের সন্তান সম্ভাবনার কথা শ্রবণ করিয়া তাহার মাথায় যেন বজ্রপাত হইল! আজ যেন বৌ মাথা তুলিয়া তাহাকে কিছু বলে না, কিন্তু চিরকালই সে কি এমনি থাকিবে? ছোট কি চিরদিনই ছোট থাকিবে? যখন ঠাকুরপোর কর্তৃত্ব হইবে, তখন সেইবা কোথায় দাঁড়াইবে আর তাহার প্রাণের ভ্রাতাই বা কোথায় দাঁড়াইবে? এই সময় হইতেই কাঞ্চন বিমলার সর্ব্বনাশের উপায় দেখিতে লাগিল।

এতদিন কাঞ্চন তাহার শ্বশুরের নিকট বড় একটা ঘেঁসিত না। স্বীয় স্বার্থসাধন মানসে এখন হইতে সে তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল, যেন গুরু সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করিল। ছোট বৌকে তাঁহার নিকট বড় একটা আসিতে দেয় না। গুরুচরণ বাবুও বড় বধূর এতাদৃশ ভক্তি দেখিয়া ভাবিলেন, বিধবার গুরু সেবা ভিন্ন আর কি করনীয় আছে? বিশেষতঃ তিনি ভিন্ন তাহার আপনার বলিবার লোক এসংসারে কেহ নাই। এই প্রকারে সেবা শুশ্রূষা করিয়া কাঞ্চন বৃদ্ধ শ্বশুরের মন নরম করিয়া তুলিল, নিজের প্রতি স্নেহ-স্রোত ফিরাইয়া দিল। পূর্ব্বে গুরুচরণ বাবু ছোট পুত্রবধূর বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিতেন না, কেহ বলিতে গেলে তাহার প্রতি গরম হইয়া উঠিতেন। কাঞ্চন কতদিন এইজন্য তাঁহার নিকট লাঞ্ছিত হইয়াছে, এখন সে সেই অপমান মায় সুদ ওয়াশীল দিতে লাগিল। সে সময় পাইলেই শ্বশুরের নিকট বিমলার মিথ্যা অপবাদ করিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে তাঁহারও কান ভারি হইয়া উঠিল, ছোট পুত্রবধূর প্রতি তাঁহার স্নেহেরও ভাটা পড়িল। বিমলা কিন্তু ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না।

ভাদ্র মাস। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিমলা ও কাঞ্চন বসিয়া গল্প করিতেছে। কিছুক্ষণ পর কক্ষান্তরে যাইবার জন্য কাঞ্চন উঠিল। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে, চারিদিকে অন্ধকার। কাঞ্চন ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়াছে, এমন সময় তাহার যেন বোধ হইল, তথায় কেহ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া পলায়ন করিল। সে বিস্ময়ে কম্পিত দেহে গৃহে প্রবেশ

করিয়া বিমলাকে বলিল,—

"বৌ! ওখানে কে দাঁড়াইয়াছিল?"

বিমলা বলিল,—

"এমন ঘেরা বাড়ী, তা'তে দোতালা, এখানে আবার অন্য লোক কে আসিবে? কৈ চলত দেখিগে?" বিমলা একটি দীপ হস্তে বাহিরে আসিয়া সমস্ত বারান্দা অন্বেষণ করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ঠাট্টা করিয়া বলিল,—

"বুঝেছি দিদি, রসিক বাবু বোধ হয় তোমার সহিত দেখা করিতে এসেছিল।" রসিক অন্নদার বন্ধু। তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রণয় প্রযুক্ত রসিক বাড়ীর ভিতরও আসিত।

হায়! বিমলা, তোমার এই পরিহাসই কাল হইল! কাঞ্চন বিমলার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বরাবর শ্বশুরের নিকট উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ গুরুচরণ বাবু আফিংএর মৌতাত একটু চড়িয়ে দিয়ে এই বর্ষার দিনে ঝিমাইতেছিলেন। কাঞ্চন নিঃশব্দে তাঁহার শয্যায় বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। গায়ে হাত দিতেই গুরুচরণ বাবুর তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। কাঞ্চন তখন সালঙ্কারে প্রভূত মিথ্যাকথার ভেজাল দিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে, বিমলার স্বভাব খারাপ হইয়াছে। রসিক বাবুর সহিত তাহার গুপ্ত প্রণয় আছে। অনেক দিন হইতে সে রসিককে ধরিবে ঠিক করিয়াছিল। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। আজ বর্ষার দিন, তা'তে অন্নদার একটু অসুখ করেছে। রসিক আসিয়া বিমলার ঘরের দরজার পাশে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া চম্পট দিয়াছে।

বৃদ্ধ বড়বৌর কথা বেদবাক্য স্বরূপ বিশ্বাস করিলেন, অনুসন্ধান করিবার কোন প্রয়োজন বোধ করিলেন না। নানা প্রকার পরামর্শের পর স্থির হইল, কল্যই ছোট বৌকে জন্মশোধ বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, তাহার সদ্য প্রসূত পুত্রকেও রাখা হইবে না। দেখিয়া শুনিয়া পরে পুনরায় অন্নদার বিবাহ দেওয়া যাইবে।

রজনী প্রভাত হইয়াছে। অন্নদা বসিয়া চা পান করিতেছেন এমন সময় তাহার তলব হইল। অন্নদা পিতৃসদনে উপনীত হইলে, তিনি গত

রাত্রের কথা তাহার নিকট বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিলেন। কাঞ্চনও তথায় উপস্থিত ছিল, সেও দুই চারটা বুকুনি দিতে কসুর করিল না। অবশেষে বৃদ্ধ জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"দেখ অন্নদা, আমি স্থির করিয়াছি ওবেটীকে আর বাড়ীতে রাখিব না, আজই বিদায় করিয়া দিব। ইহাতে তোমার মত কি? তুমি ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত যাইতে পার, কিন্তু তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে না। আমি যে রকমেই পারি তোমাদের বিচ্ছেদ করিয়া দিব।" অন্নদা শুনিল,—নিশ্চল প্রস্তরের ন্যায় নির্ব্বাক নিস্পন্দ-দাঁড়াইয়া সব শুনিল। অনেকক্ষণ পর একবার পিতার ও ষড়বৌর মুখপানে তাকাইল,—সে দৃষ্টিতে অতৃপ্তি মোহ ও চাঞ্চল্য মাখান একটা ভাব নিপুণতার সহিত অঙ্কিত ছিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে ভবিষ্য সুখের শত চিহ্ন তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে অঙ্কিত হইল, কল্পনার কুসুম-কলিকা মনের প্রতিশাখায় ফুটিয়া উঠিল। কি ভাবিয়া অন্নদা বলিল,—"পত্নী ত্যাগ করিব।"

তখনই গাড়ী আনান হইল। এক ঝির সঙ্গে সরলা নিরপরাধিনী বিমলাকে গাড়ীতে উঠান হইল। হঠাৎ তাহাকে বাপের বাড়ী পাঠান হইতেছে কেন, বহুবার জিজ্ঞাসা করিয়াও সে তাহার উত্তর পাইল না। শেষে গাড়ীর মধ্যে ঝির মুখে শুনিল, তাহার চরিত্রে সন্দীহান হইয়া তাহাকে বিসর্জ্জন দেওয়া হইল। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিবা মাত্র সদ্য-মধুগর্ভ অনাঘ্রাত কুসুম-কলিকার ন্যায় বিমলা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। যখন তাহার সংজ্ঞা হইল, তখন দেখে যে, সে পিত্রালয়ে শয়ান। কুসুমচ্যুত, নিদাঘের রবিকর দগ্ধ লতিকার ন্যায় বিমলা তখন মলিন এবং বিষণ্ণ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। অন্নদা শয়নকক্ষের মুক্ত বাতায়ন পার্শ্বে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে, মুখ অপেক্ষাকৃত স্থিরতাব্যঞ্জক। এমন সময় নিকটস্থ এক বাড়ী হইতে কে গাহিয়া উঠিল,—

> "রয়ে রয়ে কেন তোর মুখ মনে পড়ে,
> সে চাঁদের সুধা বিনে চকোর যে প্রাণে মরে।"

পুনর্ব্বার নিষ্ঠুর স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, গানের সুরগুলি অতি কঠোরতার সহিত তাহার মর্ম্মে আঘাত করিল। গানটা কি থামিবে না? বিরহের

বৈশাখী বৈকালে যখন দর্শন পিপাসায় ছাতি ফাটিতে থাকে, হৃদয়ের বেলা ভূমে সংসার-বারিধির উর্ম্মিমালা আসিয়া যখন স্পর্শ করে, সুখ দুঃখ তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে যখন কল্লোল কোলাহল উত্থিত হয়, মানস-ক্ষেত্রে পৃথিবীর স্বার্থপরতা, দাম্ভিকতা, কপটতার নিত্য সংগ্রামে যখন শোণিতস্রাব হয়, তখন প্রথম মিলনের সেই স্মৃতি সুশীতল বারিবিন্দু রূপে হৃদয়কে শান্ত করে। আজ সেই সুখের স্মৃতি স্মৃতিপটে উদিত হওয়ায় পিঞ্জরাবদ্ধ বন্য পশুর ন্যায় অন্নদা অস্থির চিত্তে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে খোলা সেল্‌ফের প্রতি তাহার নজর পড়িল। পড়িবা মাত্র সে রোমাঞ্চিত হইল। ভাবিল এখনই সব ফুরাইবে! সে সেল্‌ফ হইতে একটা কৌটা পাড়িয়া সম্মুখে ধরিয়া বলিল,—

"এই কি পরিণাম? এত আশা, এত ভরসা, এত চেষ্টা, এত আকাঙ্ক্ষার কি এই পরিণাম? তা' বই আর কি? যাহাকে ভাল বাসিবার এসংসারে কেহই নাই, যাহার জন্য সহানুভূতির একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেও কেহ অগ্রসর হয় না, তাহার আর বাঁচিয়া থাকিয়া কি ফল? যাহাকে আমি তিনবৎসর ধরিয়া অতি যত্নে ও অতি আদরে হৃদয়-কারাগারে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম, আজ যখন সেই প্রাণের পাখী শিকল কাটিয়া হৃদয় ভগ্ন করিয়া উড়িয়া গেল, যে প্রভাকরের প্রসন্নবদন দর্শন করিয়া হৃদয়-কমল বিকসিত হইত, আজ যখন তাহা অস্তগত হইয়াছে, তখন একটা নীরস বিশীর্ণ জীবনের বহিরাবরণ ধারণ করিয়া কি হইবে?"

অনেক চিন্তা করিয়া অন্নদা কৌটা খুলিল। আবার কি ভাবিয়া বন্ধ করিয়া চেয়ারে বসিয়া একখানা পত্র লিখিতে বসিল। পত্রের স্থানে স্থানে চোখের জলে ভিজিয়া গেল, স্থানে স্থানে লেখা অস্পষ্ট হইল। বহুকষ্টে পত্রখানি সমাপ্ত করিয়া অন্নদা পড়িল,—

"প্রাণের বিমল, তোমার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস। আমি জানি তুমি সতী, সুপবিত্র। জানিয়া শুনিয়াও যে আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়াছি, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আজ চলিলাম। প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে আমার সহিত দেখা হইতে পারে। তবে বিদায়——অন্নদা।"

পত্রখানি তখনই ডাকে পাঠাইয়া দিয়া অন্নদা কৌটাটি মুখের নিকট

ধরিল। পরে দেওয়াল হইতে ফ্রেমে বাঁধান বিমলার ছবিখানা পাড়িয়া বক্ষের উপর ধরিল,—পূর্ণ মিলন হইল না, মধ্যে কাঁচখানি ব্যবধান রহিয়া গেল। তখনও চাঁদ ডুবেনাই, উদার আকাশপটে হাসিয়া হাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। অন্নদা অবসন্ন দেহে শয়ন করিল। এমন সময় আবার কে যেন গাহিল,—

"এমন মধুর মধু নিশি মাঝে
সে যদি গো কাছে থাকিত,
একবার সুধু সুধা হাসি হেসে
স্নেহে আঁখি তুলে চাহিত।"

* * * *

গায়ক একবার, দুইবার, তিনবার গাহিল। কিন্তু অন্নদা-হৃদয়ে বিষম আন্দোলনের মধ্যে একটি সুরও বাজ্‌ত হইল না। অবশেষে গান থামিল, তখন অন্নদার হৃদয়-তন্ত্রীও কর্ম্মশূন্য হইয়া গিয়াছে।

রাত্রি নয়টার সময় ডাক হরকরা একখানি পত্র কেনারাম বাবুর হাতে দিয়া গেল। পত্রের উপর বিমলার নাম লেখা। কন্যার চরিত্রের উপর দোষ আরোপিত হওয়ায় তিনি ম্রিয়মান হইয়াছিলেন, কাজেই পত্রের উপর তাঁহার তাদৃশ লক্ষ্য ছিল না, পুত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিতেও তাঁহার স্মরণ হইল না। সুতরাং পত্র পাইতে বিমলার বিলম্ব হইল। যখন সে পত্র পাইল তখন রাত্রি এগারটা। পত্র পাঠ করিয়াই সে বসিয়া পড়িল। এই পত্রই অন্নদার। রুদ্ধ শোকাবেগ প্রশমিত হইলে সে ভাবিল, রাত্রেই তাঁহার নিকট যাইব, তাঁহার চরণে ধরিয়া ক্ষমা চাহিব, তিনি রাখিতে হয় রাখিবেন, না রাখেন তাঁহারই চরণে প্রাণ বলি দিব।

বাড়ীর সকলেই শয়ন করিয়াছে, সকলেই ঘুমঘোরে অচেতন। বিমলা হাঁটিয়া স্বামী দর্শনে যাত্রা করিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে, পথে জন সমাগম নাই। যে দুই একটি লোক যাইতেছিল তাহারা কেহই তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করিল না, তাহার হৃদয়ের ব্যথা কেহ বুঝিল না।

অনেক পরিশ্রম করিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া বিমলা শ্বশুর বাড়ীর দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। ফটক অর্গলবদ্ধ। কাহারও সাড়া শব্দ

নাই। বিমলা একবার দুই হস্তে ফটক ধরিয়া টানিল। বৃথা চেষ্টা এক তিলও নড়াইতে পারিল না। কেবল ভিতর হইতে একটি কুক্কুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। বিমলা ক্লান্ত হইয়া তথায় উপবেশন করিল। অতিরিক্ত উত্তেজনায় তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে অঞ্চল বিছাইয়া দ্বারদেশে, তাহার হৃদয়-মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতার চরণপ্রান্তে শয়ন করিল। আর উঠিল না।

পরদিবস অন্নদা এবং বিমলা উভয়কে এক চিতায় তুলিয়া বিদায় দেওয়া হইল। কাঞ্চনের যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইল!!

—*—

মহাকাল।

প্রহেলিকাময় চিরন্তন!
নিত্যবুদ্ধ,—চির সুপ্ত;
স্বপ্রকাশ,—চিরলুপ্ত;
অবিজ্ঞেয়—অনুভূত; ভীম—নিরঞ্জন!
তোমারি প্রবাহ ধরি',
নিখিল বৈচিত্র্য-তরী
ভেসে যায়; কোথা যায় নাহি নিরূপন;
জীবন, মরণ, স্থিতি,
হর্ষ, প্রীতি, দুঃখ, ভীতি,
আনন্দ, উৎসব, গীতি, শোকের ক্রন্দন,—
হে অনন্ত, গরীয়ান্,
হে অখণ্ড, হে মহান্,
সকলিও নির্ব্বিকার বক্ষের স্পন্দন!
প্রহেলিকাময় চিরন্তন!

জ্ঞানময়, ওহে চিরন্তন !
অগণ্য গ্রহের মেলা,
কবে কি করিবে খেলা,
কোন্ পলে, কোন্ পথে করিবে ভ্রমণ;
কে কোথা পড়িবে বাঁধা,
কে কোথা পাইবে বাধা,
কোন্ কোন্ গ্রহে কোথা হবে সংঘর্ষণ;
কারণে হইবে কার্য্য,
বিধি লিপি অনিবার্য্য,
উর্ব্বরতা, অনাবৃষ্টি, ভূকম্প, প্লাবন;
চেয়ে আছ স্থিরলক্ষ্যে !
সকলি ও মুক্ত-চক্ষে
প্রতিভাত;—যেন শুভ্র নখর-দর্পন !
জ্ঞানময় তুমি চিরন্তন।

প্রাণময় ওহে চিরন্তন !
বিশ্ব-সজীবতা মাগি',
যে দিন উঠিলে জাগি'
অনন্তের প্রান্তে; লয়ে অনন্ত জীবন;—
সে হ'তে নিখিল ভবে,
অবিশ্রান্ত কলরবে,
অঙ্কুরি' উঠিছে প্রাণ মুহূর্ত্তে নূতন;
উজ্জ্বল সুষমা ভরা,
চির প্রাণ-ময়ী ধরা,
মধুরাস্তে মধুহাস্তে ভাসায় ভুবন;
আনন্দ, উৎসাহ, বল,
আশা, প্রীতি কোলাহল
লয়ে, নিরন্তর করে চরণ বন্দন;
প্রাণময় তুমি চিরন্তন !

মৃত্যুময় তুমি চিরন্তন !
ভবিষ্য-মুহূর্ত্তগুলি,
উৎকণ্ঠিত-নেত্রতুলি'
বর্ত্তমানে হয় লীন; কে করে বারণ ?
আঁখির পলকে, হায়,
বর্ত্তমান হ'য়ে যায়
অতীত, অপুনর্লভ্য, চির-অদর্শন !
কর্ম্মের সমীর-ভরে,
ওহে সিন্ধু ! বক্ষোপরে
জীবন-বুদ্বুদ শ্রেণী উঠে অগণন;
মুহূর্ত্তে অকূলে ভাসি',
মিলায় সে বিশ্ব রাশি
তববক্ষে; সর্ব্বগ্রাসি ওহে বিভীষণ !
মৃত্যুময় তুমি চিরন্তন !

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

রঞ্জিনী।*

সঙ্গিনী রচয়িত্রীর "রঞ্জিনী" নাম্নী কাব্যপুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাও বাহ্যবেশে সেই "সঙ্গিনীর" মতই কুসুমলোভনীয়া। "সঙ্গিনী"তে প্রখরা ও মুখরা দেখিয়া, আমরা সভয়ে সসঙ্কোচে তাহার সমালোচনায় অগ্রসর

* শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

হইয়াছিলাম। "রঞ্জিনী" সেরূপ মুখরা নহে;—কিছু অধীরা, কিন্তু মধুরা!

হে আমার মানস-রঞ্জিনী!
হাসিতে অশ্রুতে ডুবায়ে তুলিকা
ফুটায়ে তুলেছি স্বপন-কলিকা;
কোনটি ফুটেছে,
কোনটি টুটেছে
সরমে মরমে
যেন কলঙ্কিনী!

এই আত্মকাহিনী পাঠ করিবার পর, "রঞ্জিনীর" আদ্যন্ত পড়িয়া দেখিলাম,—ইহার সকল কথাই অকপট সত্য; এক বর্ণও অতিরঞ্জি নহে। আজ কাল বঙ্গসাহিত্যে এতদূর সত্যনিষ্ঠা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না; লোকে বিনয় দেখাইবার জন্যও বলিতে চাহে না,—আমার কবিতার

কোনটি ফুটেছে,
কোনটি টুটেছে
সরমে মরমে
যেন কলঙ্কিনী!

এ বিষয়ে মহিলালিখিত এই সরল কবিতা বর্ত্তমান বঙ্গকবিকুলতিলকবর্গের নিকটও আদর্শ বলিয়া উপস্থিত করা যাইতে পারে। "রঞ্জিনী" রচয়িত্রী যে সত্য সত্যই কাব্যশক্তির অধিকারিণী, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এখনও সে শক্তি আত্মবিকাশের উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। "সঙ্গিনী" রচনার সময়ে তাহা পথ পায় নাই; এবার পথ পাইয়াও, উপযুক্ত অবসর না পাইয়া, অনেক কবিতা ফুটিয়া, টুটিয়া, সরমে মরিয়া রহিয়াছে!

ছোটকে বড় করিয়া দেখায় দোষ থাকিলেও, কলঙ্ক নাই; বড়কে ছোট করিয়া দেখায় যেমন দোষ, তেমনই কলঙ্ক! এ কথা খুব ছোট হইলেও, অভিনব কবিকুল পুরুষ হইয়াই ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠেন না; মহিলাবর্গকে আর কি বলিব?

চেয়ে আছে মুগ্ধ কবি নিস্তব্ধ আকাশে;

হইয়াছে চন্দ্রোদয়, সারা বিশ্ব হাস্যময়,
কলধ্বনি বাজিছে বাতাসে;
নীল পাহাড়ের গায়, তারাগুলি হেসে চায়,
অতি দূর আশার মতন!
ফুলগন্ধে কুহুস্বরে পুলকিত স্বপ্নভরে
মুদে আসে কবির নয়ন!

এইখানে কবিলেখনী নিরস্ত হইলে বুঝিতাম,—বিশ্ব সৌন্দর্য্যে কবিহৃদয় মুগ্ধ হইয়া, অনন্তে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; তাই নয়ন মুদিয়া আসিতেছে। বাহিরের ছোট সৌন্দর্য্য কবিকে ভিতরের বড় সৌন্দর্য্যের সন্ধান দিয়া, ছোটকে বড় করিয়া, সসীমকে অসীমে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহার পরের শ্লোকেই পড়িলাম:—

আকুল হৃদয় খোঁজে মানস প্রতিমা;
কোথা শূন্যে জলেস্থলে বসি শূন্যে শতদলে,
বিরাজিছে সে মূর্ত্ত মহিমা!
অপরূপ রূপবতী হোক্‌না প্রকৃতি সতী
সে সৌন্দর্য্যে নাই মাদকতা,
ওযে শুধু ছায়া মায়া, নাই স্পর্শ, নাই কায়া,
—সেথা নাই কবির দেবতা!

ইহার সমালোচনা অনাবশ্যক। কবি নিজেই তাহা নিঃশেষে ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। স্পর্শ চাই, কায়া চাই; অসীমকে সসীমের গণ্ডীতে দৃঢ় বদ্ধ করিয়া, তাহাকে ফুলের মত চুলের খোঁপায় গুঁজিয়া রাখিতে না পারিলেই কবি বলিবেন,—

"সেথা নাই কবির দেবতা!"

দেখিবার দোষে সংসার কামগন্ধময়; দেখিবার গুণে তাহা নিত্যলীলার আনন্দ নিকেতন! বলিবার দোষে সে লীলানিকেতন সৌন্দর্য্য বিচ্যুত হইয়া পড়ে। কবির মতে, সেখানে কেবল নিরাশা, কেবল ক্রন্দন, কেবল অপূর্ণতা; সুতরাং তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্য কোথায়?

বসন্ত আসিল ওইসাজি ফলফুলে,

গাঁথিতে নবীন মালা আমি গেছি ভুলে;
চারিদিকে মুহু মুহু কুহু কুহু তান,
আমারি বীণার মাঝে নাহি আজ প্রাণ।
বসন্ত এনেছে সাথে মৃত সঞ্জীবনী,
আমারি হারায়ে গেছে আজ স্পর্শমণি;
চারিধারে হাসি-খেলা, উচ্ছ্বাসবিকাশ,
মেঘে ভরা আজ বুঝি আমারি আকাশ।
বসন্ত দিয়েছে আজ আগুন যৌবনে,
দীপ্তি নিভে গেছে শুধু আমারি ভবনে;
প্রাণে প্রাণে উঠিয়াছে তরঙ্গ তুফান,
সাড়া নাহি দেয় আজ আমারি পরাণ।
বসন্ত আসিল আজ পরি নববেশ,
আমারি সুধার পাত্র হয়েছে নিঃশেষ;
ফুলে ফুলে ভ্রমরের মধুমাখা স্তব,
আমারি নিকুঞ্জখানি নিঝুম নীরব।
হৃদয়-মন্দির মোর কে দিবে সাজায়ে,
অন্তরের রুদ্ধ যন্ত্র কে দিবে বাজায়ে;
হে বসন্ত, কণামাত্র দাও ও বৈভব,
অন্তরে বাহিরে হোক্ আনন্দ-উৎসব!

এই অতৃপ্তি অশান্তির উষ্ণ প্রস্রবণ;—তাহা ফুটিয়া, ছুটিয়া, ছিটকাইয়া যাহার গাত্রে পতিত হয়, তাহাকেই তীব্রজ্বালায় অভিভূত করে! এই অতৃপ্তি প্রকৃত কাব্য সৌন্দর্য্য-সম্ভোগের প্রবল অন্তরায়। ইহার কোলাহলে বিশ্ব সঙ্গীত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না। ইহা দূর হইলেই, বাতাসে যে কলধ্বনি বাজিবে, তাহা আর কবিচিত্তকে ছায়ার মধ্যে কায়া খুঁজিবার জন্য ব্যস্ত হইবার সময় দিতে সক্ষম হইবে না। তখন বাহিরের ক্ষুদ্র কায়া যতই ছায়ায় পরিণত হইবে, ততই কবিচিত্ত সসীম ছাড়িয়া অসীমে নিমগ্ন হইয়া পড়িবে। তখনও চাঁদ হাসিবে, কোকিল গাহিবে, ময়ূর নাচিবে; কিন্তু তাহাকে এমন করিয়া ধরিবার জন্য, ছুইবার

জন্য কবিচিত্ত কাঁদিয়া উঠিবে না। "রঙ্গিনীতে" ইহার আভাস ফুটিতে ফুটিতে ফুটিল না!

ফুটিবার আশা পাইয়াছি বলিয়াই, এত কথা বলিলাম। সুন্দর—অতি সুন্দর—অত্যন্ত সুন্দর—এইরূপ সমালোচনার বাঁধা বোল ভক্তবৃন্দের সাধাগলায় সমুত্থিত হইয়া, "রঙ্গিনী রচয়িত্রীকে" অভিনন্দন করিবার সম্ভাবনা আছে। আমরা তজ্জন্যই তাহাতে যোগদান করিলাম না। রচয়িত্রী "উৎসাহের" উৎসাহদাত্রী লেখিকা; আমাদের পক্ষে মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করা, আত্মশ্লাঘা কীর্ত্তনের কুটিল কৌশল বলিয়া নিন্দিত হইতে পারে। আমরা সুন্দরকে আরও সুন্দর দেখিবার জন্যই ভ্রমক্রটির উল্লেখ করিয়া, সমালোচনা সমাপ্ত করিতে বাধ্য। তবে কর্ত্তব্যের অনুরোধে অবশ্যই বলিতে হইবে,—সেবারের "রঙ্গিনী" অপেক্ষা, এবারের "রঙ্গিনীতে" কবিপ্রতিভা আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, হয়ত একদিন তাহার পরিমল-গর্ব্বে বঙ্গসাহিত্য মধুময় হইয়া উঠিবে।

সুরুচি সুরচনার পদাশ্রিতা দাসী; তাহার যত্নে, সেবায়, প্রসাধনে "রঙ্গিনী" চিত্তরঞ্জনের জন্য অনেক নূতন অলংকারে অলংকৃত হইয়াছে। এখনও যাহা কিছু কৃত্রিমতার আড়ম্বর লক্ষ্য করা যায়, কালে তাহাও ধীরে ধীরে নিরস্ত হইয়া, নিসর্গসুন্দরীকে যখন সাহিত্য মন্দিরে দেবীমূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবে, তখন কে না বলিবে—"কি মিব' হি মধুরানাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্"?

আধুনিক কবিকুলের মত "রঙ্গিনী" রচয়িত্রীরও অর্থালঙ্কার অপেক্ষা শব্দালঙ্কার প্রদর্শনের প্রলোভন অধিক বলিয়া বোধ হয়। শব্দঝঙ্কার কবিতার একটি সুপরিচিত অলংকার হইলেও, সে অলংকার অর্থহীন ভাবহীন কবিতাকঙ্কালকে অলংকৃত করিতে সক্ষম হয় না। ভাবই কবিতার কায়া, শব্দালঙ্কার তাহাকে প্রসাধনকৌশলে সুসজ্জিত করে। কায়া কদর্য্য হইলে, অলংকার যেন তাহার কুরূপকে অতিমাত্রায় বাড়াইয়া তোলে। সুতরাং মহিলাসুলভ অলঙ্কার সংগ্রহের প্রলোভন সুসংযত করিয়া, কবিতাকে ভাবে রসে সুন্দর করিবার জন্যই সমধিক চেষ্টা করা আবশ্যক। তাহাতে আন্তরিক তন্ময়ত্ব থাকিলে, অর্থগৌরবেই কাব্যসুন্দরী মনোমোহিনী

মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হইবে। তখন তাহার অঙ্গে সুসম্বন্ধ শব্দালঙ্কার আর অসঙ্গত ঝঙ্কার উৎপাদন করিয়া, কবিতাকে লজ্জাবনত করিবে না। সে দেখিতে না দেখিতে, অজ্ঞাতসারে, পাঠকচিত্তে প্রবেশলাভ করিবে। এখন তাহার ঝঙ্কার বাহুল্য পাঠককে—"ঐ আসিতেছে"—বলিয়া, আসিবার পূর্ব্বেই, সাবধান করিয়া দেয়। সুতরাং পাঠকচিত্ত সাবধান হইবার সুযোগ পাইয়া, সম্ভ্রমে সঙ্কোচে সুদূরে সরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করে!

তুমি।

(১)

তিমির বসনখানি উন্মোচিয়া ধীরে
রাঙা রবি উঠে যবে নীলাকাশ'পরে,
কলকণ্ঠ পাখিগণ ধরি মধুতান
নিদ্রালস বসুধার জাগায় পরাণ,—
তখনো তোমার চারু মূর্ত্তি সুকুমার
বিরাজে আনন্দে ক্ষুদ্র হৃদয়ে আমার!

(২)

প্রখর রৌদ্রের করে ক্লান্তা বসুন্ধরা
ভাবে যবে কোথা সন্ধ্যা শ্রান্তিক্লান্তি-হরা,
করি তব সুশীতল শান্তি-ছায়া দান
রক্ষা কর তাপিতা এ বসুধার প্রাণ,—
তখনো আমার এই ক্ষুদ্র হৃদিমাঝে
তোমার মধুর মূর্ত্তি আনন্দে বিরাজে!

(৩)

শ্রান্ত দিবাকর যবে অস্তাচলে যায়,
ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসে আকাশের গায়;
রাখাল গোপাল লয়ে গৃহপানে ফেরে
মুখরিয়া গ্রামপথ উচ্চ গীত স্বরে;
দিবসের কার্য্য সবে করি সমাপন
ক্লান্ত পাদক্ষেপে গৃহে করে আগমন;
রবিকর ডুবে যায় সুমধুর সাঁঝে,—
তখনো এ হৃদে তব চারু ছবি রাজে!

(৪)

সুখনিশা আসে যবে সন্ধ্যা অবসানে
সবাই বিশ্রামে রত আপন ভবনে;
পূর্ণচন্দ্র নিরখিয়া সুনীল আকাশে
সুন্দরী প্রকৃতি হাসে পুলকে হরষে,
স্ফীতবক্ষা কল্লোলিনী কুলু কুলু তানে
ছুটে যায় মত্ত হয়ে সাগরের পানে,
জগতের কোলাহল সব নিবে যায়,
যে যাহার মত সুপ্ত বিশ্রাম শয্যায়,—
তখনো তোমার প্রেম মূর্ত্তি সুকুমার,
বিরাজে আনন্দে ক্ষুদ্র হৃদয়ে আমার!

শ্রীপ্রমথনাথ রায়।

মুসলমান অর্থাৎ পাঠান, মোগল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ভারতাধিকারের হেতু।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ ব্যপদেশে, রাজপুত জাতিও যে প্রয়োজন মত ছল কৌশল অবলম্বনে বা বিশ্বাসঘাতকতায় পশ্চাৎপদ হইত না, মিবারের ভট্টগণের চাতুর্য্যময় বর্ণনার মধ্য হইতেও, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। চিতোরাক্রমণ সময়ে, আলাউদ্দিন খিলিজি, নাকি শঠতা পূর্ব্বক রাণার খুল্লতাত ভীম সিংহকে বন্দীভূত করেন। স্বামীর উদ্ধার সাধন মানসে, ভীম সিংহের পত্নী, রাজস্থানের তদানীন্তন প্রখ্যাত সুন্দরী পদ্মিনী, পিতৃব্য গোড়া এবং ভ্রাতা বাদলের সঙ্গে পরামর্শ করতঃ, আলার নিকট আত্ম সমর্পন ছলে, শিবিকাভ্যন্তরে স্ত্রীবেশে যোদ্ধ্‌ পুরুষদিগকে লইয়া, সতর্ক মুসলমান সম্প্রদায়ের চক্ষে ধূলি প্রক্ষেপ পুরঃসর যেরূপে কার্য্যোদ্ধার করেন, তাহাতেও রাজপুতজাতির প্রতারণাময় ব্যবহারের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। কাজে কাজেই বলা বাহুল্য যে হিন্দু পক্ষও প্রবঞ্চনায় মহম্মদীয়ান্ অপেক্ষা অনিপুণ ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহাদের অনুষ্ঠিত বিশ্বাসঘাতকতা গুলি, প্রায়ই প্রবলপক্ষ মুসলমান জাতির প্রভাবের নিকট অকার্য্যকর হইয়াছে, তাই তাহার বিবরণ প্রদান করিতে ভট্ট ও চারণগণ লজ্জা বোধ করিয়াছেন। যেখানে রাজপুত ছলনা ফল প্রসব করিয়াছে, সেখানে অবশ্যই নানা আড়ম্বরের সহিত তাহা ভট্ট গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। অধিকন্তু সে আচরণের প্রশংসাবাদ কীর্ত্তনেও কবি সঙ্কুচিত হন নাই।

আর এক কথা, মহম্মদীয়ান্ জাতি হিন্দু অপেক্ষা সভ্যতায় নিকৃষ্ট, পরন্তু একটু বেশী নির্দ্দয়, এ মীমাংসায় বোধকরি কোনও তর্ক নাই। অতএব সমাজ বিজ্ঞানের নিয়মানুসারেও তাহারা অপেক্ষাকৃত বেশী সভ্য রাজপুত জাতি অপেক্ষা ছল, কৌশল প্রয়োগে কম দক্ষ হইবে। কেননা সমাজ বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তই এই যে;—অসভ্য জাতি একদিকে সভ্যজাতির চেয়ে যেমন গোঁয়ার, রক্ত পিপাসু, নিষ্ঠুর হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে তেমনই সরল এবং সত্যবাদীও হইয়া থাকে।

রাজপুতনার ইতিবৃত্তে লিখিত হইয়াছে যে, স্থানেশ্বরের সংগ্রামে, মহম্মদঘোরী সন্ধি করিবার অছিলায় নিশ্চিন্ত রাখিয়া অসাবধান পৃথ্বি রায়কে আক্রমণ করিয়াছিলেন; ইহা একটি ভয়ানক বিশ্বাস ঘাতকতা। কিন্তু কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও, ইহাকে বিশ্বাসঘাতকতা আখ্যা দেওয়া সঙ্গত ও শোভন হয় না। রাজপুতসৈন্যের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া হয়তো ঘোরীর মনে তখন সন্ধি সংস্থাপনের ইচ্ছাই হইয়াছিল, তাই তিনি সে প্রস্তাবে অসম্মত হন নাই। কিন্তু শিয়রে শমন থাকা সত্ত্বেও আপোষের কথাবার্ত্তা চলিতে দেখিয়াই, হিন্দু পক্ষ নিশ্চিন্ত চিত্তে সমর ক্ষেত্রকে, প্রমোদক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি এ অবসর ছাড়িবেন কেন? ভারতের ধন সম্পদ গ্রহণ এবং হিন্দুদিগকে মোসলেম্ ধর্ম্মে দীক্ষিত করাইতো তাঁহার অভিযানের হেতু। সুতরাং সে উত্তম সুযোগ ত্যাগ করা সেই কার্য্য বীরের পক্ষে কখনই সুখ্যাতির কথা হইত না। তিনি সন্ধির প্রসঙ্গে মাত্র রাজি ছিলেন, হিন্দুদিগকে উৎসব ব্যসনে লিপ্ত হইতে পরামর্শ দেন নাই, অতএব বিশ্বাস হনন হইল কিসে?* মিবারের রাণা সমর সিংহকে, অভিলাষী,

* নৈশ আক্রমণ বা অপ্রস্তুত শত্রুকে আক্রমণ, সংগ্রাম বিধিতে, বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া নিন্দিত নহে। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতম জাতিরাও তদ্রূপ আচরণকে দূষ্য মনে করেন না। আর হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ কার্য্যের তীব্র অপ্রশংসা থাকিলেও,—রামায়ণে;—অন্তরালে থাকিয়া রামচন্দ্রের বালীবধ; লক্ষ্মণের অপ্রস্তুত ইন্দ্রজিৎকে হনন্; এবং মহাভারতে;—অশ্বত্থামার, নৈশ সময়ে পঞ্চ পাণ্ডবের পুত্র বিনাশ; ভীষ্মের সম্মুখে শিখণ্ডিকে রাখিয়া এবং দ্রোণকে শোক বিহ্বল করিয়া অস্ত্রহীন যোদ্ধাকে হত্যা করা; প্রভৃতি বর্ণনা দৃষ্টে হৃদয়ঙ্গম হয় যে প্রাচীন হিন্দু যোদ্ধাগণও, দরকারমত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানগুলিকে পদদলিত করিতেন। অপিচ ইদানীন্তন কালে অর্থাৎ রাজপুত জাতির ইতিবৃত্তেও এতদ্রূপ উদাহরণ বিরল নয়। বিখ্যাত রাণা প্রতাপসিংহ নিজ দুরবস্থার সময়ে, অল্প পরিমাণ মুসলমান সেনার সন্ধান পাইলেই, অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা বিধ্বস্ত করিতেন। লেখক

বুদ্ধিমান্, রাজনীতিজ্ঞ, কর্ম্মযোগী ও নিপুণ যোদ্ধা বলিয়া রাজপুত ইতিহাসে প্রশংসাবাদ করা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে তাদৃশ দক্ষ লোকের নেতৃত্বাধীনে অবস্থান করিয়াও হিন্দুগণ;—পরাক্রান্ত শত্রুর সম্মুখিনাবস্থাতেও আমোদ প্রমোদ ব্যপদেশে অসাবধান হইয়াছিল!! বস্তুতঃ এস্থলে রাজপুত জাতিরই চরিত্রদুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইতেছে; মহম্মদীয়ানদের কলঙ্কের কথা নাই।

রাজপুতজাতির সরলতা; তাহাদের পরাভবের আর একটি হেতু বলিয়া নির্ণীত হইয়া থাকে; কিন্তু এ সিদ্ধান্তটিও অপ্রামাণ্য। তাহাদের মধ্যেও কনোজরাজ জয়চন্দ্র, এবং সংগ্রাম সিংহের সহকারী তুয়ার শীলৈদীর তুল্য স্বজাতি দ্রোহী ছিল। সরলতা জাতীয় উপাদান হইলে তাহাতে কখনই স্বজাতি দ্রোহীর জন্মলাভ সম্ভবপর হইত না। আর যদি তর্কানুরোধে মানিয়া লওয়া যায় যে, স্থানেশ্বরের যুদ্ধে হিন্দু পক্ষের পরাস্ত হইবার কারণ কেবল সরল বিশ্বাস; তথাপি কনোজেশ্বরের পরাজয়ের হেতু নির্দ্দেশ হয় না। তিনি স্বয়ং বিশ্বাস হন্তা ছিলেন, সুতরাং অন্যের তাদৃশ চাতুরী বুঝিতে তাঁহার বুদ্ধি বৃত্তির অভাব ছিল না। তাহার পর স্থানেশ্বরের সংগ্রামে বিশ্বাস-ঘাতকতার অনুষ্ঠান হইয়া থাকিলে, তদ্বিবরণও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। অতএব লিখা অতিরিক্ত যে, বিশ্বাসঘাতকতার আয়োজন ব্যর্থ করিতে, তিনি সর্ব্বপ্রকারেই প্রস্তুত ছিলেন। অপরপক্ষে সৈনিক বলও তাঁহার ন্যূন ছিল না; তদানীন্তন সকলেই তাঁহাকে দিল্লীশ্বরের প্রবলতম প্রতিপক্ষ বলিয়া জানিত। কিন্তু ঘোরীসহ যুদ্ধে তাঁহার শোচনীয় পরাভবের কথা ইতিহাসেই বর্ণিত আছে। কাজে কাজেই, রাজপুত জাতির সারল্য ও মুসলমান পক্ষের বিশ্বাসঘাতকতাই যে ভারত বিজয়ের হেতু ইহা অপ্রমাণসিদ্ধ এবং অবিশ্বাস্য।

রাজপুত জাতির স্বজাতি দ্রোহ বা পারস্পরিক বিবাদ যে, মহম্মদীয়ান্ পক্ষে ভারতাধিকারে কিঞ্চিৎ অনুকূল হইয়াছিল, ইহা অবশ্য অস্বীকার করা চলে না। হিন্দুগণ বিবাদ বিসম্বাদ বিস্মৃত হইয়া, বিধর্ম্মী সংগ্রামে, যদ্যপি একযোগে, একপ্রাণতায় কার্য্যক্ষেত্রে ব্রতী হইত, তবে যে সংখ্যার আতিশয্যেও তাহারা কিছুদিন জয়লাভে সমর্থ হইত, তাহা কে, না বলিবে? কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে হয় যে,—ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রথার (অর্থাৎ

যে প্রথার বলে রাজসিংহাসন কোনও যথেচ্ছাচারী ব্যক্তি বিশেষের করায়ত্ত থাকে; প্রজা সাধারণ ভক্তি প্রীতিতে নহে, পরন্তু ভীতি বিহ্বল চিত্তে; সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তিকে সম্রাট বলিয়া মানিতে বাধ্য হয়।) এরূপ স্বজাতি দ্রোহ অনিবার্য্য। যেখানে "বার রাজপুতের তের চুল্লী", প্রবচনে তাহাদের কঠোর স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতেছে, এবং ধর্ম্ম বিশ্বাসে যেখানে কেহ শৈব, কেহ জৈন, কেহ বৈষ্ণব, কেহ গাণপত্য; সেখানেতো স্বজাতি দ্রোহ অবশ্যম্ভাবী হইবেই। কিন্তু যেখানে সেসব উৎপাত প্রবল ছিল না, সেখানেও ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রথায় কিরূপ অমঙ্গলের সূচনা করিয়াছিল, মুসলমান জাতির ইতিবৃত্তই তাহার জাজ্বল্যমান সাক্ষী;*

ধর্ম্মাচার্য্য মহম্মদের মৃত্যুর পর খলিফার পদ লইয়া সে সম্প্রদায় মধ্যে যে বিরোধের কালানল জ্বলিয়া উঠে, এ পর্য্যন্ত তার নিবৃত্তি ঘটে নাই। খলিফার পদ লইয়াই মহম্মদ জামতা আলির লোমহর্ষণ গুপ্ত হত্যা সাধিত হয়। আধিপত্য লইয়া কাটাকাটি রক্তারক্তি মুসলমান সমাজেও কম নহে। তাহারই ফলে আরবীয়ানদের অবনতি, এবং তাতারি বা তুর্কিদের অভ্যুদয় এবং তাহারই ফলে ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত মোগলহস্তে (বস্তুতঃ মুসলমানগণ মোগলদিগকে পরাহত করিয়া নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করে নাই। তাহারা-দিগকে পরাজিত করিবার সমকালে সম্ভবতঃ তাহারা বৌদ্ধ ছিল। মহম্মদীয়ানদিগকে পরাভূত করিয়া তাহাদের সংস্রবে থাকিতে থাকিতে বিজিত জাতির ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।) তুর্কি এবং অপরাপর মুসলমান জাতির পরাজয়। অধিচ তাহারই ফলে ভারতেও দাস, খিলিজি, লোদি-গণের সিংহাসনারোহণ এবং তাহারই কল্যাণে মোগল হস্তে পাঠানরাজ-গণের বিনাশ। ফলতঃ ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রথার, অর্থাৎ যথেচ্ছাচার শাসন প্রণালীর যুগে প্রত্যেক জাতির ইতিহাসেই এরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। সুতরাং এই ছিদ্রটিকে কোনও জাতির জয় পরাজয়ের একমাত্র হেতু বলা ভ্রম। যে মহম্মদঘোরী, স্থানেশ্বরের যুদ্ধে হিন্দু পক্ষকে বিধ্বস্ত করেন,

* অবশ্য মহম্মদীয় সমাজেও শিয়া সুন্নি প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরোধ বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু জাতিভেদ প্রথার বা ধর্ম্মমত বাহুল্যে, হিন্দুদের ন্যায় তাহাদের মধ্যে তত প্রখর ঈর্ষার সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

স্বদেশে গজনীর সিংহাসন হস্তগত করিতে এবং বশে রাখিতে তাঁহার কম উদ্বেগ সহ্য করিতে হয় নাই। স্বদেশে ও স্বজাতির মধ্যে তাঁহার বহুসংখ্যক শত্রু বিদ্যমান ছিল, সুবিধা পাইলে তাহারা তাঁহাকে মুকুট হীন করিতেও পশ্চাৎপদ হইত না। অতএব যদি বলা যায় যে, ভারতে হিন্দুজাতির পরস্পর বিসম্বাদ, তাঁহার পক্ষে আনুকূল্যের কারণ স্বরূপ হইয়াছিল, তবে সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করিতে হইবে যে, গজনী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের বৈরিগণ প্রতিযোগীতা দ্বারা তাঁহাকে বহুলাংশে দুর্ব্বল করিয়াছিল। আরবে সুলতান বাবর, দিল্লীর বাদসাহ ইব্রাহিম লোদী এবং চিতোরের রাণা সংগ্রাম সিংহকে পরাস্ত করেন, নিজ পৈত্রিক রাজ্য ফরগণা ও সমরখন্দ তিনি দীর্ঘকাল আয়ত্ত রাখিতে সমর্থ হন নাই। অরি পক্ষের সঙ্গে বহুযুদ্ধে তিনি একরূপ নিঃসম্বল এবং হীন শক্তি হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি কিন্তু তাঁহার সেই নিষ্প্রভ তেজঃ ও ভারতের পক্ষে, দাবাগ্নির কার্য্য করিয়াছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী রাণা সঙ্গ, হিন্দু পক্ষেরতো সহায়তা পাইয়াছিলেনই, অধিকন্তু দিল্লীর সিংহাসন চ্যুত পাঠান সম্রাট ইব্রাহিমলোদী তনয় হোসেন খাঁ লোদীও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া দলপুষ্ট করিয়াছিলেন। অতএব সংগ্রাম সিংহের সহকারী তুয়ার শীলৈদির স্বজাতি দ্রোহ যদিও রাজপুত পক্ষের দৌর্ব্বল্যের কারণ হইয়া থাকে, তবু ইব্রাহিমলোদীর পুত্র উক্ত প্রকারের স্বজাতি দ্রোহী হোসেন খাঁ লোদীর সাহায্যও সেই অনুপাতে বলবত্তার হেতু হইয়াছিল। কিন্তু বেশী অনুকূল অবস্থা সত্ত্বেও চরম ফল, হিন্দুর পরাজয়েই পর্য্যবসিত হইয়াছে!! সুতরাং এমীমাংসা অকাট্য সত্য যে, হিন্দু জাতির বিচ্ছিন্ন ভাব ভারতে মুসলমান বিজয়ের সামান্য সাহায্য করিয়া থাকিলেও, তাহা একমাত্র বা প্রধানতম কারণ নহে।

তবে সে হেতু কি? ভারতে মহম্মদীয়ান জাতির বিজয় পরম্পরার প্রধান কারণ, (১) হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান সম্প্রদায়ের শারীরিক বলাধিক্য। (২) কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং বিলাস বিদ্বেষ।

(১) বলাধিক্য ও কষ্ট সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে বঙ্গের ঐতিহাসিক শিরোভূষণ মান্যাস্পদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের মন্তব্য এস্থলে উদ্ধৃত হইল;—

"রাজপুতগণ অতিশয় সাহসী, * * * * * । সমস্ত

রাজপুত সৈন্য সংখ্যায় দশগুণ শত্রুর সহিত সম্মুখ রণে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, এরূপ ইতিহাসে বারবার পাঠ করা যায়। কিন্তু সাহসে অদ্বিতীয় হইলেও যুদ্ধ নিপুণতায় ও কষ্ট সহিষ্ণুতায় ও বলে বোধ হয় তাহারা মুসলমানদের সমকক্ষ ছিল না। এইজন্যই সমানযুদ্ধে প্রায়ই রাজপুতগণ পরাস্ত হইল এবং পর্ব্বত সঙ্কুল ও মরুভূমি রক্ষিত রাজস্থান এবং স্থানে স্থানে কয়েকটি পর্ব্বতদুর্গ ভিন্ন প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ, মুসলমানদিগের অধিকৃত হইল।"

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস। ১১৫ পৃষ্ঠা।

বাস্তবিক পক্ষেও দৈহিক বলের ন্যূনতা ভিন্ন তাহাদের সংগ্রাম করিবার উপযোগী অন্যান্য গুণের বড় বেশী অভাব ছিল না। তাহাদের স্বদেশানুরাগ ও স্বাধীনতা স্পৃহাও জগতের যে কোনও বীর্য্যবান্ জাতির সমকক্ষ ছিল। সমরযজ্ঞে তাহারা বহুবার জীবনাহুতি প্রদান করিয়াছে, তবু বৈরিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নাই, বা অধীনতা স্বীকারের কলঙ্কার্জ্জনে সম্মত হয় নাই। কিন্তু হায়! শারীরিক শক্তির অল্পতাই তাহাদের সমগ্র উদ্যোগ আয়োজন নিষ্ফল করিয়াছে। এই কারণে মহম্মদ গীন্ কাশীনের, সৈন্যাপেক্ষা, সিন্ধুরাজ দাহিরের, সৈন্য সংখ্যা ৮।৯ গুণ বেশী হইলেও (ক) পরিশেষে বিজয় লক্ষ্মী মুসলমান পক্ষেরই অঙ্কশায়িনী হইয়াছেন।

এই কারণে মহম্মদ ঘোরী অপেক্ষা দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরায়ের সৈন্য সংখ্যা প্রায় ত্রিগুণ হইলেও, (খ) তিনি জয়লাভে সমর্থ হন নাই। এই কারণে অনেক অতিরিক্ত সেনা লইয়াও রাণা সংগ্রাম সিংহ, সুলতান বাবরের হস্তে নির্জ্জীত হইয়াছিলেন; এবং এই হেতুতে এক সময়ে প্রায় সমুদয় ভারতভূমি মহম্মদীয়ানের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিল।

(ক) "এই যুদ্ধে মুসলমান পক্ষে ছয় সহস্র এবং হিন্দু পক্ষে পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য ছিল।"

রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস ৬৭।৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(খ) "এই সময়ে ঘোরী পক্ষে প্রায় ১২০০০০ অশ্বারোহী এবং পৃথ্বীরায়ের পক্ষে ন্যূনাধিক ৩০০০০০ অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক পদাতি প্রভৃতি ছিল।" মৌলবি আবদুল করিম্, বি. এ প্রণীত ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত। ৮২।৮৩ পৃষ্ঠা পঠিতব্য।

ভারতবর্ষের প্রচুর শস্যশালীতা ও ধনরত্নপূর্ণতা একপক্ষে যেমন তাঁহার সন্তানবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের হেতু, পক্ষান্তরে জল বায়ুর প্রতিকূলতা অর্থাৎ রোগ প্রবলতাও তদ্রূপ; হতভাগ্য সন্তানবর্গের দৈহিক দুর্ব্বলতা সুতরাং পরাধীনতা রূপ দুর্দ্দশার কারণ। বর্ত্তমান সময়েও ইহার প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। ভারতবাসী অপেক্ষা আরবীয়ান্, পারসিক, তাতার ও আফগানগণ চিরদিনই অতিরিক্ত বলশালী। অধুনা শিখগণ ভারতীয় সমগ্র সম্প্রদায় অপেক্ষা আকৃতিতে এবং দৈহিক শক্তিতে শ্রেষ্ট হইলেও, আফগানদের তুলনায় যে অনেক নিকৃষ্ট তাহা আমরা একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি। আফগান্, পারসিক, তুর্কি, মোগল প্রভৃতি জাতির বর্ত্তমান বংশধরগণের সঙ্গে, রাঠোর, চৌহান, ভট্টি, কচ্ছাবহ, শিশোদিয় ইত্যাদি রাজপুত গোত্রের অধস্তন পুরুষদের যে গঠন ও শক্তি বৈষম্য, ইদানীন্তন সময়ে প্রত্যক্ষ করা যায়, এ তারতম্য সেই দূরতম অতীত কালেও বিদ্যমান ছিল। তাই মুষ্টি সঙ্কল্প করিয়া এবং পরিমাণে অত্যধিক হইয়াও রাজপুত সম্প্রদায়, সেই দুর্দ্দমনীয় জাতিকে অপসারিত করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ মাতা ভারতভূমির গর্ভে, উদ্ভিজ্জ যেরূপ সুস্থ সতেজ হইয়া জন্মে এবং রসরূপ স্তন্য পানে বর্দ্ধিত ও সবল হয়, দুর্ভাগ্য বশতঃ মনুষ্য সেরূপ হয় না। তিনি বড়ই কৃশ ও দুর্ব্বল সন্তান প্রসব করিয়া থাকেন, পরন্তু তাঁহার পালনী শক্তিও সেই মানব সন্তানবর্গের স্বাস্থ্য বর্দ্ধন পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল নয়। সেই জন্যই চিরকাল মধ্যআসিয়া, পারস্য, গ্রীস্, এসিয়ামাইনর প্রভৃতি বীর জননীর অমিততেজা সন্তানগণ, ভারত মাতার ম্যালেরিয়া জনিত বর্দ্ধিত প্লীহা যকৃৎক্রান্ত তনয়দের গলদেশে, পরাধীনতার কঠিন শৃঙ্খল পরাইতে ক্ষমবান্ হইয়াছে ও সমর্থ হইয়াছে।

অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে; মাতার গর্ভে পুরুষানুক্রমে জাত এবং তাঁহার অপুষ্টিকর স্তন্যে লালিত পালিত পুত্র সমুদয় তো স্বাভাবিক কারণেই হ্রস্বাঙ্গ এবং দুর্ব্বল হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত নানাস্থানের যে সমস্ত দুর্দ্দমনীয় সন্তানবর্গ তেজঃ বীর্য্যের জন্য একদিন জগতে প্রখ্যাত ছিল; তাহারাও এই অবীর্য্যবতী মাতার অঙ্কে আশ্রয় লইবার পর, ধীরে ধীরে কেমন অবনতির অতল গর্ভে ডুবিয়াছে, পাঠান এবং মোগল জাতিই তাহার

প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যতদিন পাঠান ও তুর্কিগণ ভারতে বাসস্থান নির্দ্ধারিত না করিয়া, কেবল ধনরত্ন লুণ্ঠনেই সন্তুষ্ট ছিল; ততদিন তাহাদের সেই প্রচণ্ড উদ্যমের নিকট কোনও হিন্দু শক্তিই কার্য্যকর হয় নাই। বহ্নি-উদরে নিক্ষিপ্ত কাষ্ঠ, তৃণের ন্যায় হিন্দুগণ তাহাদের বীর্য্যাগ্নিতে দগ্ধই হইয়াছে। কিন্তু কুক্ষণে তাহারা ভারত মাতার অভিশপ্ত ক্রোড়ে স্থান লইয়াছিল। তাই উত্তরোত্তর বল, বিক্রম হারাইয়া, হিন্দু জাতিরই সহোদর ভ্রাতার ন্যায় ক্ষীণাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। তন্নিমিত্তই, মিবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের ভয়ে ও দিল্লীর শেষ পাঠান সম্রাট ইব্রাহিম লোদীকে সশঙ্ক থাকিতে হইয়াছিল। এবং তদ্ধেতুই ভারতের বাহির হইতে আগত মোগল সুলতান বাবর অত্যল্প সংখ্যক সেনাবল লইয়া, ইব্রাহিমলোদীর বহু পরিমাণ সৈনিককে ধ্বংস পথের পথিক করিয়াছিলেন।*

আবার মোগলদের পরিণামও পাঠানের ন্যায়ই শোচনীয় হইয়াছে। ভারতের প্রতিকূল নৈসর্গিক অবস্থা, তাহাদের যে কয়েক পুরুষের শরীরে ভয়ঙ্কর অনিষ্টোৎপাদনে কৃতকার্য্য হয় নাই, মোগলের সৌভাগ্য ততদিনই দেদীপ্যমান ছিল। কিন্তু যে হইতে এ দেশের জল, বায়ুর ক্রিয়াশীলতা তাহাদের দেহের উপর সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে, সেই হইতে তাহাদের উন্নতির স্রোতও প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। তাই দেখিতে পাই, সম্রাট আরঙ্গজীবের সময়ই দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্রীয় এবং রাজস্থানের রাজপুতগণ, মোগলের প্রতিযোগীতায় বহুলাংশে সফল মনোরথ হইয়াছে। পরন্তু আরঙ্গজীবের পরবর্ত্তী মোগলশক্তি আর মহারাষ্ট্রীয় প্রতাপের নিকট অগ্রসর হইতেই সাহস পায় নাই। পক্ষান্তরে সেই বীর্য্যহীনতার অবসরে, বিদেশীয় পারসিক নাদির সাহ, এবং আফগান আমেদ সাহ দুরানী, অল্পদিন অগ্র

* অবশ্য বাবর সত্বের ভারত বিজয়ের অন্য একটু বিশেষ কারণ বিদ্যমান ছিল। তিনি যুদ্ধে "কামান" প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সুতরাং সে সংগ্রাম বৈজ্ঞানিক প্রণালীর;—কেবল শারীরিক ক্ষমতার নহে। তথাপি তাঁহার সৈনিক সম্প্রদায়ের দৈহিক বল যে, এদেশীয় যোদ্ধৃবর্গাপেক্ষা বেশী ছিল, তুল্য যুদ্ধোপকরণ সমন্বিত অন্যান্য সমর বৃত্তান্ত দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। লেখক

পশ্চাৎ ক্রমে মোগল শক্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। আবার সে মহারাষ্ট্রীয় ক্ষমতা,— ভারত মাতার কুক্ষিতে পুষ্টজন্ম দুর্ব্বল ও কৃশাঙ্গ মোগল প্রভাবের পক্ষে, কালাগ্নির স্বরূপ হইয়াছিল। আফগানিস্থানের সবল, সতেজ সন্তান, আহম্মদ সাহ আব্দালীর দুর্দ্ধর্ষ বিক্রমের নিকট, তাহা ঝঞ্ঝাবাত তাড়িত শুষ্ক পর্ণের ন্যায় কিরূপে উড়িয়া গিয়াছে,—১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারীতে সংঘটিত পাণিপথের রণাঙ্গনই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আজও ভারতে পাঠান এবং মোগলের অধস্তন বংশধরগণ অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদের আকৃতিগত দৃঢ়তা এবং বলবত্তা বৈদেশিক মোগল, পাঠানের তুলনানুপাতে কোন্ স্থানীয়, অনায়াসেই তাহা বুঝা যায়। ভারত মাতার জননেন্দ্রিয়ের এই দৌর্ব্বল্য (অবশ্য হতভাগ্য মানব সন্তান সম্বন্ধে।) এবং স্তন্যের অপুষ্টিকারিতাই, তাঁহার সন্তানগণের শারীরিক শৌর্য্যনাশের হেতু এবং সেই হেতুই যথাক্রমে, পাঠান, মোগল প্রভৃতি মহম্মদীয়ান্ জাতির ভারতাধিকারের প্রধানতম কারণ।

(২) মানুষের অন্তর স্বভাবতঃই সুখ প্রবণ। ধন সম্পদের প্রাচুর্য্য উপস্থিত হইলেই, মনুষ্য আত্ম সুখ কল্পে, বিলাস স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়। এই জন্যই ভারতীয় হিন্দু এবং পরবর্ত্তী মুসলমানগণ, বৈদেশিক মহম্মদীয়ান্ অপেক্ষা সমধিক বিলাস পরায়ণ ছিল, এবং এই জন্যই তাহারা বৈদেশিক জাতির ন্যায় কষ্ট সহিষ্ণুতাও অভ্যাস করে নাই। যে সমুদয় বিদেশী পাঠান ও মোগল সম্রাটগণ ভারতে অভিযান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সৈন্যগণের ন্যায় এদেশী হিন্দু এবং মুসলমানগণ যে বিলাসশূন্য ও কষ্ট সহিষ্ণু ছিল না, তাহার প্রমাণও ইতিহাস অন্বেষণ করিলেই পাওয়া যায়। মহম্মদ ঘোরীর দ্বিতীয় রণোদ্যোগের বিবরণ অবগত হইয়াও পৃথ্বীরায় অন্তঃপুরে আমোদ প্রমোদ লইয়াই মত্ত ছিলেন। উপযুক্ত সময়ে সংগ্রামের আয়োজন করেন নাই। অধিকন্তু বহু বিলম্বে সমরাঙ্গনে গমন করিলেও শত্রুর নিকট হইতে সন্ধির প্রস্তাবমাত্র পাইয়াই, সসৈন্যে বিলাস ব্যসনের স্রোতে সন্তরণ দিয়াছিলেন। কিন্তু পাঠান পক্ষের অবস্থা ইহার বিপরীত। মহম্মদঘোরী যেদেশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, প্রকৃতির বিধানে সেদেশ রত্ন প্রসবিনী নহে। তথাকার সিংহাসন করায়ত্ত রাখা শঙ্কট জনক হইলেও তাহাতে

বিলাস, ব্যসন পরিতৃপ্তির উপযোগী অর্থলাভের সম্ভাবনা ছিল না। ভারতের ধনরত্ন হস্তগত করিতে পারিলে, কথঞ্চিৎ বিলাসিতা করা যাইত বটে, কিন্তু অলস থাকিলে এবং অকষ্ট সহিষ্ণু হইলে, সে কার্য্যে সিদ্ধকাম হইবার ভরসাও ছিল না। তন্নিমিত্ত কতকটা দেশের দারিদ্র্যে, কতকটা বহুদূরবর্ত্তী স্থানের ধন সম্পদ লুণ্ঠন জন্য অভিযানে লিপ্ত থাকায়, সেদেশের অধিবাসীদের সর্ব্বদা কার্য্যময় জীবন যাপন করিতে হইত এবং আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্লেশসহনশীলতাও অভ্যাস করিতে হইত। সেই জন্য সর্ব্বদা সতর্কাবস্থান করিয়া, হিন্দু পক্ষের আলস্যের সুযোগে, মহম্মদ ঘোরীই অগ্রে আক্রমণ করিতে এবং পরিশেষে জয় লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিয়ানা সন্নিহিত কানুয়ার সমরে, রাণা সঙ্গ ও প্রতিদ্বন্দ্বী সুলতান বাবরের সৈন্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও সেই সত্যই প্রতিপন্ন হয়। পরাজয়ের একটু সম্ভাবনা দেখিয়াই, বাবর মদ্য পান সঙ্কল্প পরিহার করিয়াছিলেন, এবং সৈনিক মণ্ডলীতেও তাঁহার চরিত্র বল সংক্রামিত হইয়াছিল। কিন্তু সেরূপ শঙ্কটাবস্থাতেও, রাজপুতগণ আলস্যবর্দ্ধক ভাং ও অহিফেন সেবন ছাড়িতে পারে নাই, প্রত্যুত তাহার সর্ব্বনাশকর শক্তির মোহে উৎসাহশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। অপর পক্ষে অর্থের অসচ্ছলতা নিবন্ধন, যে পাঠান ও মোগল জাতির আদি পুরুষবর্গ স্বদেশে অবস্থানের সময়, নিরলস, ক্লেশসহকারী ও কার্য্য প্রবণ ছিল, ভারতে বাস করিবার সময়, তাহাদেরই নিম্নতন পুরুষগণ বিলাস ব্যসন ও অমিতাচারে, সংগ্রামকার্য্যে অশক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ফলতঃ কষ্টসহিষ্ণুতার অভাব ও ব্যসন বিলাসও যে ভারতীয় কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে, বৈদেশিক মহম্মদীয়ানের হাতে পরাভবের অন্যতর কারণ স্বরূপ হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

উপসংহারে বিখ্যাত, অবিখ্যাত হিন্দু ঐতিহাসিকদের একটি দোষের কথা উল্লেখ না করিয়া নিরস্ত থাকা যায় না। যেখানেই হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষ বা মুসলমান দ্বারা হিন্দুদেবালয়াদির উৎসাদন, অথবা মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুর ধনরত্নাদি অপহরণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছে; সেই খানেই তাঁহারা পক্ষপাত কলুষিত চিত্তে এবং অসঙ্গত ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া,—

দস্যু, তস্কর, পাষণ্ড, নর পিশাচ, বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি রূপ অসংযত ভাষায় মহম্মদীয়ানদিগকে ভৎর্সনা করিয়াছেন।* প্রাচীন হিন্দু ইতিবৃত্তবিদ্‌গণও শত্রুপক্ষকে এরূপ সুমিষ্ট আখ্যায় অভিহিত করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের পদানুসরণ বর্ত্তমান সময়ের ঐতিহাসিকদের পক্ষে অনুচিত এবং ঈর্ষাবর্দ্ধক বলিয়া সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। পুরাতন মুসলমান ইতিহাসবিদ্‌গণও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, সুতরাং তাঁহারা যে পরধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্তদিগকে গালাগালি দিতে ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা নহে। তখন বিভিন্ন সম্প্রদায়মধ্যে বিরোধের কারণ সততই বিদ্যমান ছিল, অহরহ মারামারি কাটাকাটি হইত। কোনও সম্প্রদায় উপদ্রব করিত, আবার কোনও সম্প্রদায় নিরুপায় ভাবে সেই অত্যাচার সহ্য করিত। সেই জন্য উত্তেজনার হেতু বর্ত্তমান থাকায় তাহারা যে পৃথক মতাবলম্বী ও পৃথক সম্প্রদায়ভুক্তদিগকে অজস্র গালাগালি দিয়া, নিজের দলের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছে, তাহা স্বাভাবিক হেতুতেই ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ হিন্দুপক্ষ মুসলমান কর্ত্তৃক নির্জ্জিত ও হৃত সর্ব্বস্ব হইয়াছিল, অতএব তাহারা যে অতিরিক্ত কটুক্তি বর্ষণ দ্বারা মনের ক্ষোভ মিটাইয়া লইয়াছে তাহা অনৈসর্গিক হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি, হিন্দুর সহিত মুসলমানের সেরূপ স্থূল অথবা সূক্ষ্ম কারণে সংঘর্ষ ঘটিবার কোনও সূত্রই উপস্থিত নাই। এখন একই রাজার অধীনে তুল্য রাজনৈতিক অবস্থায় উভয় সম্প্রদায় অবস্থিত। ইদানীং সকারণে বা নিষ্কারণে কোনও সম্প্রদায়ই কোনও সম্প্রদায়ের অহিত করিতে সমর্থ নহে। সুতরাং আপাততঃ এক মাতার সন্তান বলিয়া, পরস্পরের মধ্যে সৌভ্রাত্র ভাবই বৃদ্ধি পাওয়া বাঞ্ছনীয়। বৈরিভাবকে পুনরালয়নের চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের পক্ষে ঘোরতর অসঙ্গত। বিশেষতঃ কি বিদ্যালয়ে কি অন্তঃস্থানে, বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত সমুদয় পুস্তক প্রবন্ধই, হিন্দু, মুসলমান নির্ব্বিশেষে পঠিত হইয়া থাকে। অতএব লিখা বাহুল্য যে তাহাতে উদারতা ও সংযমের

* নব্যভ্যুদত বঙ্গীয় ঐতিহাসিকগণ, মুসলমানদিগকে আক্রমণের দোষ স্পৃষ্ট নহেন। কিন্তু তন্মধ্যে কেহ কেহ আবার মুসলমান পক্ষের ওকালতি গ্রহণ করিয়া, ইংরেজদিগকে প্রকারান্তরে তথাবিধ বিশেষণে আপ্যায়িত করিয়া স্বয়ং বিখ্যাত ও ধন্য হইয়াছেন। লেখক।

ভাব থাকাই অত্যাবশ্যক। মাননীয় শ্রীযুক্ত মৌলভি আবদুল করিম বি, এ সঙ্কলিত, "ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত", নামধেয় গ্রন্থখানি, ভাষা সংযমের একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ। লেখক মুসলমান, তদুপরি গ্রন্থসঙ্কলনে তিনি মহম্মদীয়ান ইতিবৃত্তকারদেরই অধিক অনুসরণ করিয়াছেন। ইচ্ছা ও রুচি থাকিলে অবশ্যই এ সুযোগে হিন্দু পক্ষের প্রতি কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ দ্বারা প্রতিশোধ লইতে পারিতেন। কিন্তু তজ্জন্য না করায় তাঁহার মহত্বই প্রকাশ পাইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকখানিও নির্দ্দোষ পাঠ্য হইয়াছে। দুঃখের ও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমরা বহু পূর্ব্বের সেই পরাজয়াপমান জনিত যন্ত্রণা এখনও ভুলিতে পারি নাই। তাই অন্যায় কটূক্তি দ্বারা মর্ম্মন্তুদ জ্বালার নিবৃত্তি করিতে প্রয়াস পাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য করি, এ নিষ্কারণ আক্রোশ ও নিরর্থক ভৎর্সনা কেন? মুসলমানগণের অপরাধ কি? তাহারা কোনও নূতন পন্থা আবিষ্কার পূর্ব্বক তাহাতে তো পদার্পণ করে নাই। যাহা চিরাচরিত, তাহারা সেই কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছেমাত্র। সংসারে প্রেম প্রীতির অপ্রতুলতা নাই সত্য, কিন্তু ইহা একটি প্রকাণ্ড এবং ভয়ঙ্কর সংগ্রাম ক্ষেত্র। এখানে দুর্ব্বলের পরাজয় এবং বলবানের উন্নতি ও পুষ্টি অহরহ ঘটিতেছে। অপিচ দুর্ব্বলকে ধ্বংস করিয়া সবল নিজ অস্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ী করিয়া লইতেছে। ইহাই নির্ম্মম প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। এ রীতির অনুবর্ত্তন দুর্ব্বলের পক্ষে যতই পীড়াদায়ক হউক, কিন্তু তাহা গুরুতর অপরাধের কার্য্য নয়। আদিম কালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদের ভক্তি ভাজন আর্য্য পিতৃপুরুষদের কার্য্য কলাপ আলোচনা করিলেও, সেই প্রাকৃতিক নিয়মের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতাই দেখা যাইবে। অপেক্ষাকৃত প্রবল প্রতিপক্ষ প্রাচীন পারসিকদের আস্ফালনে, যখন হিন্দু আর্য্যদের অস্তিত্ব লোপের আশঙ্কা জন্মিয়াছিল; তখন তাঁহারা নিজ জীবনের স্থিতি তথা উন্নতি বিধানের নিমিত্ত, ভারতে অভিযান করিয়া, দুর্ব্বল অধিবাসীদের জীবন, রাজ ভবন ও ধর্ম্ম প্রণালীকে বাষ্পাকারে উড়াইয়া দিয়াছিলেন। ভারতের সেই আদিম বাসিন্দাদের প্রতি, আমাদের আর্য্য পিতৃপুরুষগণও অল্প অত্যাচার করেন নাই। যাহাদের অন্তরে স্বাধীনতা স্পৃহা বলবতী ছিল, তাহাদিগকে উচ্চ পর্ব্বতে এবং গভীর অরণ্যে তাড়িত

করিয়াছিলেন। যাহারা স্বাধীনতা অপেক্ষা শান্তি পছন্দ করিত, কঠোর অনুশাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া, তাহাদিগকে দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া পরোপকারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। পরন্তু যাহারা স্বাধীনতা রক্ষার্থ পলায়ন করিতে, বা জীবন রক্ষার জন্য চিরদিন খাটিয়া দিতে রাজি হয় নাই, তাহাদের জীবন পঞ্চভূতে মিশাইয়াছিলেন। সে জন্য আর্য্য পিতৃপুরুষদের যদি কোনও দোষ না দেখি, তবে তুল্যাপরাধে অপরাধী মুসলমান সম্প্রদায়কে ভৎর্সনা করিবার কি অধিকার আছে? প্রাচীনকালের কথা ত্যাগ করিলে, মহম্মদীয়ানদের অভিযানের সমকালে এবং পরেই বা আমাদের হিন্দু পক্ষের কিরূপ আচরণ প্রত্যক্ষ করা যায়? শিশোদীয়, রাঠোর, চৌহান, প্রমার, কুশাবহ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব এতই প্রবল ছিল যে, পরস্পর পরস্পরের বিনাশের নিমিত্ত সতত ব্যগ্র থাকিত। কোনও সম্প্রদায়ের একটু প্রভাব বৃদ্ধি পাইলেই তাহারা অন্য সম্প্রদায়ের ধ্বংশ সাধনে চেষ্টা পাইত। এই জন্য হিন্দুদের মধ্যেও এক দলের সঙ্গে অন্য দলের কখনই সদ্ভাব স্থাপিত হয় নাই। জাতীয় বৈরি মুসলমানপক্ষ উপস্থিত থাকিতেও তাহারা দুর্ব্বল সম্প্রদায়ের রাজ্য গ্রহণের উদ্যমে ক্ষান্ত হইতে পারে নাই। লোভের আকর্ষণে এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে, যে কার্য্য আর্য্য হিন্দু পিতৃপুরুষগণ করিয়াছিলেন, পৃথিবীর সাবদীয় সভ্যাসভ্য জাতি যাহা পুরাকালে করিত এবং এখনও করিয়া থাকে, অপিচ পরবর্ত্তী হিন্দুগণও যাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই;—'সেই পরধ্বংস দ্বারা আত্মপুষ্টি';—মুসলমানেরও মূলমন্ত্র ছিল। আর সেই মূলমন্ত্র বলেই তাহারা ভারত বিজয় করিয়াছিল। অতএব দোষ হইল কিসে? বস্তুতঃ বসুন্ধরা বীর বা যোগ্যতমের উপভোগ্যা। বীরের সমরায়োজনের প্রতি কুটিল কটাক্ষপাত কদাচ ন্যায়ানুমোদিত নহে।

কিন্তু এখানে একটি কথা আছে। কৈফিয়ৎ ছলে কেহ বলিতে পারেন; গালাগালি দেওয়া আমাদের জাতীয় অভ্যাস, সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করা দুষ্কর। আমাদের আদিম পিতৃপুরুষগণ পরাস্থ হইয়া, পারসিকদিগকে অসুর বলিয়া ভৎর্সনা করিতেন, এবং তাঁহাদের চরিত্রে প্রচুর কলঙ্ক

কালিমার প্রলেপ দিয়াছিলেন। পরন্তু ভারতের আদিম বাসিন্দাদের বংশাবশিষ্ট বংশধরগণ, যদি সুযোগ মত তাঁহাদের উপর আপতিত হইয়া প্রতিশোধ লইবার যোগাড় দেখিত, তাহা হইলে তাহাদিগকে দানব, দস্যু, রাক্ষস ইত্যাদি মুখরোচক সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেন, এবং তাহাদের স্বভাবে দোষ বাহুল্য বর্ণন করিয়া দেবতার কোপ উৎপাদনের চেষ্টা পাইতেন।* (বৈদিক মন্ত্রগুলি ইহার প্রমাণ।) সেই সনাতন পন্থা আমরা ছাড়িব কেন?

কিন্তু সেই একই উত্তর। আপাততঃ পূর্ব্বানুরূপ উত্তেজনার কারণাভাব। সুতরাং উদার অন্তরে চরিত্র সমালোচনার সময় আসিয়াছে, কটূক্তি দ্বারা হিংসা, দ্বেষ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই।†

শ্রীরজনীমোহন ঠাকুর।

---

* সৌভাগ্যের বিষয়, প্রাচীন ভারতের আদিম অধিবাসীগণের বর্ত্তমান বংশধর, কোল, ভীল, সাঁওতাল, কুকি, নাগা, খাসিয়া, গারো, টোডা ইত্যাদির ইতিহাস নাই। থাকিলে আমাদের আদিপুরুষদের চরিত্র, সুন্দর রকমে চিত্রিত থাকিত। এবং তদ্দৃষ্টে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিতাম যে অধুনিক মহম্মদীয়ান অপেক্ষা তাঁহারা পরাহতের প্রতি অত্যাচার পরায়ণতায় কম দক্ষ ছিলেন না। এবং তাঁহাদের দয়া বৃত্তি ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যাখ্যার মত বলবতী ছিল না। পরন্তু সেরূপ ঘটিলে, মুসলমানদের উপর অন্যায় অভিযোগকারী, আমাদের সম্মানাস্পদ হিন্দু ঐতিহাসিকবর্গও সঙ্গত কারণেই ভাষা সংযত করিতে বাধ্য হইতেন। লেখক।

† লেখকের মতের সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। তিনি সর্ব্বত্র যুক্তিতর্কের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। সকল বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করিয়া প্রতিবাদ করিলে ভাল হইত।—উৎসাহ-সম্পাদক।

মৃত্যুশয্যায়।

—•—

সরম কি তায় বসো বসো সখা
আজি যদি হেতা এলে।
বল প্রিয়তম সেদেশ কেমন
তুমি ত সুখেতে ছিলে ?
বিদায়ের দিনে আজি শেষ দেখা
বসনে কেন হে ও বদন ঢাকা
রাখি হাতখানি ভাঙ্গাবুকে সখা
চাহহে নয়ন তুলে,
সরম কি তায় বসো বসো কাছে
আজি যদি হেতা এলে।
জীবন কুসুম তোমারি আশায়
যতনে রেখেছি তুলে,
দাঁড়াও ক্ষণেক আঁখি জলে ধুয়ে
দিই হে চরণ মূলে।
তোমার লাগিয়া দগধ পরাণ
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হয়েছে পাষাণ
আজি বুঝি সখা পাইতে সে ত্রাণ
ও পদ এ দেহ ছুঁলে
সরম কি তায় বসো বসো সখা
আজি যদি হেতা এলে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

পরলোকগত সুরেশচন্দ্রসাহা প্রবর্ত্তিত।
শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত।

উৎসাহ।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

৫ম বর্ষ, { রাজসাহী, আশ্বিন, ১৩০৯। } ১১শ সংখ্যা।

বিজয়াদশমী।—"বৎসরের দিন"।

আজ "বৎসরের দিনে"
মুছে ফেল আঁখিজল।
অধরে ডাকিয়ে হাসি
হৃদয়েতে ধর বল॥

আজ আনন্দের দিনে
স্নেহ প্রতিদানে লও

ভুলেযাও ঘৃণা ক্রোধ,
বৈরিতার পরিশোধ।

হেলায় সেদিন যারে
"বৎসরের দিনে" আজ,

গিয়েছিলে পায়েঠেলি,
লও তারে বুকে তুলি।

হৃদয়ে প্রীতির উৎস,
অতীতে বিস্মৃতি ঢালি,

মুখেতে সরল হাসি,
সবারে সম্ভাষ আসি।

নূতন বন্ধনে বাঁধি
নবীন পথেতে চল,—

চারি দিকে দেখ যারে—
নবীন জীবন ভরে।

আজিকার আলিঙ্গনে মলিনতা লেশ নাই,
আজ "বৎসরের দিনে" হের সবে ভাই ভাই!

কে তুমি কাঁদিছ মাগো আজ এ আনন্দ দিনে,
কাঁপায়ে গগন তল স্মরি গত প্রিয়জনে।

হৃদয়ে জাগিছে শেল,— তাই বুঝি আঁখি ঝরে।
ছি ছি হ'বে অমঙ্গল,— মুছ' আঁখি তারি' তরে!

অপাঙ্গে মুছিয়ে অশ্রু, হাতে নিয়ে তৃণ ধান,—
তাহারি মঙ্গলতরে, (আজ) বিতর আশীস্ দান!

আজ "বৎসরের দিনে"
হৃদয়েতে ধর বল।
অধরে জাগায়ে হাসি,
মুছে ফেল আঁখিজল!

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক।

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব।

দেখিতে দেখিতে সম্বৎসর অতিবাহিত হইল—আবার সেই সুখের শরৎ সমাগম, সাধের আশ্বিনে আবার সেই শারদীয়া পূজার শুভ আয়োজন, বহু দিন পরে ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালী আবার উদ্বোধিত হইয়া মহামায়ার পূজার জন্য লালায়িত। চিরকাল এই সময়ে—এই সুখের শরৎ সমাগমে বঙ্গবাসী পুর পুরেষ মাতা দেবী জগজ্জননী, আনন্দময়ীর পূজার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহা বাঙ্গালীর চিরাভ্যস্থ। এ বিশ্বব্যাপী আনন্দে তাহারা চিরকাল সমান

ভাবে যোগদান করিয়া আসিতেছে, মাতৃ পূজার আনন্দ তাহাদের শিরায় শিরায় সংবদ্ধ—তাই আবাল বৃদ্ধ বণিতা আপনহারা হইয়া বিশ্বজননীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে; চির তৃষিত বাঙ্গালী উৎকণ্ঠিত ভাবে আশাপথ চাহিয়া আছে—আজ সন্তান বৎসলা জননী বঙ্গভবনে আসিতেছেন।

বর্ষার ঘন ঘটাচ্ছন্ন অন্ধকারময় আকাশ মেঘ বিনির্মুক্ত হইয়া অতি রমণীয় পবিত্রাদপি পবিত্র ভাবে সুসজ্জিভূত হইয়াছে, গম্ভীরাবর্ত্তময়ী ভীষণ তরঙ্গ-সঙ্কুল কলনাদিনী স্রোতস্বতীর আর সে রণ-রঙ্গিনী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না; ঘোররবা বীচিমালা আর দুর্দ্দমনীয় বেগে দুকুল ভাঙ্গিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিতে ছুটিতেছে না। শরৎ সমাগমে স্রোতস্বিনী সলিলের আর সে মালিন্য নাই, সেই ভীমা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি এখন প্রশমিত হইয়া প্রশান্ত কোমল ভাবে ধীরে ধীরে প্রবাহিত। দীনা মলিনা প্রকৃতি সতী আবার রাজরাণী হইয়াছেন, নয়ন মনোহর সুমধুর সাজে সজ্জিতা হইয়া মানবমনে অপার আনন্দ ঢালিয়া দিতেছে। শরতের শ্যামল শস্য পূর্ণ বসুন্ধরা, সুনির্ম্মল অনন্ত নীলাকাশ-জগতে জগদম্বার আগমন ঘোষণা করিতেছে। শরচ্চন্দ্রের সুনির্ম্মল জ্যোৎস্নারাশি সহস্রধারে সুধা বিতরণ করিয়া মহিমাময়ীর মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। শরদ-শিশির সিক্ত কুসুমাবলী কান্তারে প্রস্ফুটিত হইয়া অতুলনীয় শোভা বিকিরণ করিতেছে।

প্রকৃতির এমন শোভা, এরূপ অকৃত্রিম আনন্দময় ভাব এই সাধের আশ্বিনে সুখের শরৎকাল ব্যতীত আর কোন কালে থাকা সম্ভব?

শরতে প্রকৃতির অনুপম অনন্ত শোভারাশি, বিশ্বরচয়িতার এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য; আনন্দময়ীর আগমনে নিরানন্দ বঙ্গগৃহের এ অসীম আনন্দ বর্ণনাতীত। এখন যে দিকে যাও, যে দিকে চাও, সকল স্থানেই সুখের উত্তাল তরঙ্গ রঙ্গভঙ্গে ছুটিয়াছে, গীতবাদ্য আনন্দধ্বনী পরিপ্লুত হইয়া বঙ্গবাসী উৎসবামোদে মত্ত হইয়াছে, এই কয়দিনের জন্য নিরানন্দময় বঙ্গভুবন আনন্দময় হইয়াছে; আনন্দময়ীর শুভ পদার্পণে নিরানন্দ যেন বঙ্গদেশ ছাড়িয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে। সদানন্দের আনন্দদায়িনী বিশ্বেশ্বরীর আগমনে আর কোথাও নিরানন্দের লেশমাত্র নাই জগৎ আজ শোভাময় আনন্দময়।

আজ বাঙ্গালীর সামান্য দরিদ্রের গৃহে বালক বালিকাগণ সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া, গৃহিনী বহু দিনের পর কুন্তল গুচ্ছ তৈলাক্ত করিয়া, সীমন্তে সিন্দূর বিন্দু সুশোভিত করিয়া যেরূপ আনন্দ অনুভব করিতেছে তাহার শতগুণ হৃদয়-কন্দরে যে আনন্দের অনন্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতেছে হে বিশ্ববিজয়ী সম্রাট! তোমার সসাগরা সাম্রাজ্যের বিনিময়ে সে বিমল আনন্দ পাওয়া যায় কি? তোমার সাগর তুল্য ধনাগারে সে আনন্দের কণিকা আছে কি? ধনে এ আনন্দ পাওয়া যায় না—এ আনন্দ মনে, ধর্ম্ম প্রাণ বাঙ্গালী মা আসিবেন—মায়ের রাতুল চরণ পূজা করিয়া পুঞ্জ পুঞ্জ পাপরাশি হইতে পরিমুক্ত হইবে ভবের সকল ভাবনা সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবে বলিয়াই তাহারা ভবভাবিনী ভবারাধ্যা জননীর পূজা করিয়া এত আনন্দ লাভ করে। ঐ দেখ আজ মাতৃভক্ত বঙ্গবাসী মায়ের দর্শন লালসায় আত্মহারা হইয়া পূজায় ব্রতী হইয়াছে; মা মা রবে ডাকিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। বালক বালিকাগণ নব বসনে সজ্জিত হইয়া মায়ের পূণ্যময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিতে পূজা বাড়ী গমন করিতেছে?

আজ আশ্বিন মাসের দ্বাবিংশতি দিবস—দুর্গা সপ্তমীর শুভ বাসর সমুপস্থিত,—মহামায়ার মহাপূজার মহতী ঘটা, চিরদুঃখী বাঙ্গালীর জীর্ণ মণ্ডপে আজ স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হইয়াছে, তাই অন্নহীন ভারত-ক্ষেত্রে আজ অন্নের ছড়াছড়ি। বহুদিনের পর আবার জগদম্বার অকৃতি সন্তানগণকে মনে পড়িয়াছে তাহারা আজ সকল কষ্ট, সকল দুঃখ ভুলিয়া একপ্রাণে মাতৃ সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছে। পরিশ্রান্ত ক্লান্ত বঙ্গবাসী সম্বৎসরের অধীনতা শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া আজ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতেছে।

বহুদিন হইতে বাঙ্গালী বিশ্বেশ্বরীর বিশ্বরচনার গাম্ভীর্য্য সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতে শিখিয়াছে; বহুদিন হইতে বুঝিয়াছে একমাত্র অনাদ্যা আদ্যাশক্তি হইতেই সমস্ত উৎপত্তি হইয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্গালী সেই শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে জননী বলিয়া জানে। মা আছেন ইহা তাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস, এই বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া তাহারা চিন্ময়ী মায়ের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি রচনা করিয়া পূজা করে; জগজ্জননী অভয়ার

স্নেহময়ী মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভক্তিভরে মা মা বলিয়া ডাকে; তপ্ত দেহ মন প্রাণ মায়ের দেবারাধ্য সুশীতল চরণে অর্পণ করিয়া কয়দিনের জন্য জুড়াইতে পারে বলিয়াই মাতৃপূজায় তাহাদের এত আনন্দ ও এত উৎসব।

আজ তাহাদের সেই সাধ পূর্ণ হইয়াছে। সন্তান বৎসলা জননী আজ সন্তানের কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করিয়া তাহাদের মনোবাসনা চরিতার্থ করিতে পর্ণ কুটিরে শুভাসীন হইয়াছেন। চির বিজিত বাঙ্গালীর দুর্ব্বল হৃদয়ে বলের সঞ্চার হইয়াছে; তাই আজ সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা মায়ের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। কর, বাঙ্গালী! যুগে যুগে সেই সর্ব্বমঙ্গলা আদ্যাশক্তির মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা কর; মঙ্গলময়ীর কৃপায় তোমাদের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।

মা শক্তি স্বরূপিনি! মানবের নিজের সম্পত্তি কিছুই নাই, আছ মাত্র তুমি। তাই আজ তোমার অকৃতি সন্তানগণ তোমার জন্য ব্যাকুল। আজ উদরে অন্ন নাই; পরণে বস্ত্র নাই শক্তিহীন হৃদয়ে শক্তি নাই তথাপি মা তোমার আগমনে আমরা নববলে বলীয়ান হইয়াছি, তোমার মুক্তিমূলাধার পাদপদ্ম দর্শন করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। এস মা ভবরাণি! ভবভবনে আসিয়া দরিদ্রের ভবন পবিত্র কর; তোমার পদস্পর্শে দরিদ্রের অন্ধকার গৃহ আলোকিত হউক; স্বর্গের সোভারাশি চারিদিকে বিরাজ করুক। এস মা এস জগত পালিনি এস ভাই পবিত্র-চিত্ত সাধু বঙ্গবাসী মাতৃপূজার শুভলগ্ন সমুপস্থিত; অবহেলায় এ অমূল্য সময় এ দুর্লভ সময় অতিবাহিত করিও না। আজ আমরা ত্রিলোকের আরাধ্য ধন মায়ের অভয় চরণ লাভ করিয়াছি এ অমূল্য সময় দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাইবে। তাই বলি এস আজ যুগ্ম করে, তার স্বরে ভক্তি গদগদ চিত্তে তন্ময় হইয়া জননীর মঙ্গলমূলাধার পদে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া মানবজন্ম সফল করি। এস ভাই! হিংসা, দ্বেষ, শত্রুতা ভুলিয়া মনের সাধে আজ বিশ্বদলে মায়ের পূজা করিয়া কৃতার্থ হই, এস, পবিত্র হৃদয়ে কৈলাশেশ্বরী বিশ্বকর্ত্রীর অভয় চরণ শিরে স্পর্শ করিয়া বিহ্বল চিত্তে বলি:—

ধন্যোহং কৃতকৃত্যোহহং সফলং জীবিতং মম,
আগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরী মদাশ্রয়ং।

মা! আমরা তোমাকে কি দিয়া পূজা করিব? আমরা অকিঞ্চন দীনহীন সন্তান আমাদের কি আছে দেবী, আমরা মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন ভক্তি বিহীন, মা প্রসন্নময়ি তুমি নিজে প্রসন্ন না হইলে ত্রিলোকীতলে এমন কি জিনিষ আছে—যদ্বারা তোমার প্রসন্নতা লাভ করা যায়। তবে তুমি নাকি সন্তানবৎসলা, ধনী সন্তানের অমূল্য রত্ন রাজিতে তুমি যাদৃশ সন্তুষ্ট না হও, অকিঞ্চন ভক্তের সামান্য দূর্ব্বাদলেও নাকি তাহাপেক্ষা সহস্রগুণে সন্তুষ্ট হও, এই জন্যই মা! আজ আমরা তোমার পূজা করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। ত্রিলোকেশ্বরি! তুমি যার প্রতি প্রসন্ন নেত্রে একবার কটাক্ষপাত কর এই ত্রিলোকে তাহার সকল অসম্ভব, সম্ভব হইয়া যায় তাই আজ আমরা সামান্য হইয়াও তোমার দর্শন লাভ করিয়াছি। এমন দিন ত আর হইবে না—এ সুসময় দেখিতে দেখিতে ফুরাইবে। অতএব এস শাক্ত, শৈব; গাণপত্য বৈষ্ণব প্রভৃতি ভক্তগণ! আজ দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা এবং আমাদের "আমিত্ব" রূপ অহংজ্ঞান মায়ের রাজীব চরণে অর্পণ করিয়া ধন্য হই এবং মাতৃপদে শরণ লইয়া বলি:—

শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে,
সর্ব্বদাত্রী হরে দেবী নারায়ণী নমোহস্তুতে।

মা! আমরা ভব ঘোরে ঘুরে ঘুরে দিশাহারা, জ্ঞান হারা, আত্মহারা; তাই তোমাকে ভুলিয়া অসার সংসারে আমার আমার করিয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছি। অজ্ঞান নাশিনী জ্ঞানময়ি! তোমার এই অভাগা সংসার জ্বালাভিভূত সন্তানগণকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিয়া কৃতার্থ কর। যেন আমাদিগকে বার বার আর ভবের এই যাতায়াত যন্ত্রনা ভোগ করিতে না হয়।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আরতি।

(সমালোচনা।)

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত।

প্রমথ বাবু বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। "পদ্মা" ও "গীতিকা" লিখিয়া তিনি আবাল বৃদ্ধের নিকট যশঃ সম্মান লাভ করিয়াছেন। আজ তাঁহার "আরতি"তে কবিতা রাণীর শেষ বন্দনা বাজিয়া উঠিল। যে সুমধুর নিক্কণে তিনি আরতি বাজাইয়াছেন তাহার ঝঙ্কনা সমস্ত ভাবুক হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইবে তাহা আর বিচিত্র কি?

"আরতি কাব্য জগতে একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ" বলিলে বোধ হয় কিছুই বলা হইল না। কেননা গ্রন্থ মাত্রেরই সমালোচনায় এইরূপ কথা সাধারণতঃ শুনিতে পাই। বাস্তবিক সমালোচ্য গ্রন্থের যদি কোন বিশেষত্বই না থাকিল, তবে অনর্থক কেন তাহার জন্য বকিয়া মরিব! আরতির জন্য যাহা বলিব তাহা নিতান্ত প্রলাপ উক্তি হইবে না ভরসা রাখি। যদি বলিতে জানিতাম, আরও কতকি বলিতাম। কিন্তু কঠোর-কর্ত্তব্যপূর্ণ মানব জীবনে সেরূপ অবসর কই? সাহিত্য মহারথীদিগের অমৃত-লেখনী—সংক্ষুব্ধ মাসিক পত্রিকার ক্ষুদ্র কলেবরে সেরূপ স্থান কই?

বহিঃ সৌন্দর্য্যে ও অন্তঃ সৌন্দর্য্যে আরতি অতুলনীয়া। আরতির বাহ্যাবরণ দেখিয়া আমার একজন সহাধ্যায়ী বন্ধু উহার চিক্কণ, চাকচিক্য পূর্ণ গাত্রাবরণে ছেলেদের একটা কিছু হয় কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রগল্‌ভতায় আমি বলিয়াছিলাম, যদি শালগ্রাম-শিলার আম-পাড়া চলিতে পারে তাহা হইলে এই সুশ্রী বস্ত্রাবরণে ছেলেদের কেন, ছেলেদের পিতারও একটা কিছু অবশ্যই হইতে পারে। সে আজ অনেক দিনের কথা। অতঃপর তাঁহাকে 'আরতি'র অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছি; আরতির স্বরূপ দেখিয়া তিনি যে মুগ্ধ ও পূর্ব্ব প্রগল্‌ভতার জন্য পরিতপ্ত হইয়াছেন, ইহা সাহিত্য-সেবীদিগের আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই।

তোমার আমার নীরস গদ্যময় জীবনে বৈচিত্র্যতা বড় ঘটিয়া উঠে না।

দৈনিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ লইয়াই আমাদের জীবন-সূত্র গ্রথিত। তবে যদি একটা ঘটনা একটু বৃহদাকার ধারণ করে, একটী সুখ অথবা দুঃখ যদি চিরাভ্যস্ত সীমানা ছাড়াইয়া উঠে, তাহা হইলে উহা হৃদয়-পটে চিরাঙ্কিত হইয়া থাকে। তাই এমনি প্রাবৃট প্রারম্ভে সজল জলদাচ্ছাদিত ত্রয়োদশীর অর্দ্ধ-বিকসিত চন্দ্র কিরণে যে সাদৃশ্যতা, অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা, সুন্দরীকে বর্ষ-সপ্ত হইল দেখিয়াছিলাম, আজিও কই তাহাকে ভুলিতে পারি নাই। তাই সে দিন যখন নবনীরদ-মণ্ডিত সান্ধ্যগগণের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া কঠোর কর্ত্তব্য পূর্ণ সংসারকে একটুখানি ভুলিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, ঠিক্ সেই সময়ে শ্রদ্ধেয় বন্ধু উৎসাহ সম্পাদক "আরতি দেখিবে" বলিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। মনে করিলাম সন্নিহিত ঠাকুর বাড়ীর সান্ধ্য বন্দনা শুনিবার জন্যই এই প্রীতি আহ্বান। কিন্তু একি! লালিকারা, সর্ব্বাভরণভূষিতা, প্রমথ বাবুর মানস কন্যা আরতি। বহিঃ সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া উন্মত্তের ন্যায় আরতির কুসুম-সুকুমার অঙ্গ বাহু যুগলে বদ্ধ করিলাম। আনন্দের আতিশয্যে ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া আরতির অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে মুগ্ধ হইলাম; ক্ষণিকের জন্য পার্থিব জগত দূরে রাখিয়া কল্পনার এক অভিনব রাজ্যে বিচরণ করিলাম। সেখানে হিংসা, দ্বেষ নাই, কুটিল স্বার্থ নাই; সুধু প্রেম—অনন্ত প্রেমের উৎস। স্বামী স্ত্রীর, পিতা পুত্রের, তোমার আমার হৃদয়ে যে প্রেমের প্রস্রবণ ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহারই পূতঃ সলিলে কিছুক্ষণের জন্য নিমজ্জিত রহিলাম। কুণ্ঠী আমার আপনার হইল। পুত্রের অকুণ্ঠনীয় আত্ম বলিদানে সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলীকে মহিমান্বিত বোধ করিলাম, মরণের পরপারে জীবন-সঙ্গীদের সহিত পুনর্ম্মিলনের আশায় বুক বাঁধিলাম। বলিতে কি এই দুঃখময় জীবনের দুঃখের সীমানা কবি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। যদি আঁধার হইতে দিব্যালোকে লইয়া যাওয়া কবি প্রতিভার কার্য্য হয়, তাহা হইলে আরতি-কর্ত্তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

আরতির সহিত পরিচয় আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনের আর একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা হইয়া রহিল। বহিরাবয়ব সম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও মত ভেদ হইবে না এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, নয়নানন্দ, সুখস্পর্শ কবিতা পুস্তক এ

দেশে ইতিপূর্ব্বে আর দেখি নাই। গ্রন্থের বহিরাংশের উৎকৃষ্টতা গ্রন্থ কর্ত্তার সুরুচির ও সৌন্দর্য্যানুভব শক্তির প্রকাশক। ইহা যিনি বাজে খরচ বলিবেন, আমি তাহাকে বাজে লোকের মধ্যে গণ্য করিতে বাধ্য হইব। তবে সাধারণের জন্য যে একখানি সাধারণ সংস্করণ অনাবশ্যক তাহা বলি না।

মুখ বন্ধে কেন এতকথা বলিলাম আরতি পাঠ করিয়া যদি প্রবৃত্তি হয় জিজ্ঞাসা করিতে পার। হ্যামলেট-জননীর ন্যায় হ্যামলেটের দীর্ঘ উপক্রমণিকায় বিস্মিত হইলে তুমি তাঁহারই ন্যায় হ্যামলেটের আভ্যন্তরিন অবস্থা বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিতে হইবে। বাস্তবিক আরতির প্রতি পংক্তিতে যে কি মধু মাখান রহিয়াছে তাহা স্বয়ং উপভোগ না করিলে অন্যের উপদেশে অনুভূত হওয়া কঠিন। গ্রন্থ বোধে সাহায্য করা, গ্রন্থকর্ত্তার তাৎপর্য্য বুঝাইতে ও গ্রন্থের গুপ্ত সৌন্দর্য্য পাঠক মাত্রেরই অনায়াস-ভোগ্য করিতে চেষ্টা করা আধুনিক পাশ্চাত্য সমালোচনার উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। এতদ্দেশে ভাষার ভুল ধরা ও ভাবের অভাব নির্দ্দেশ করাই যেন সমালোচকের কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। গত চৈত্রের "উৎসাহে" খগেন্দ্র বাবু প্রমথ বাবুর 'দীপালী' সমালোচনায় সাধারণ কবিতা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিলেও 'দীপালী' সম্বন্ধে বড় কিছু বলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে যাহা না বলিলেও চলিত এমনি দুই এক কথা বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হইয়াছেন।

'আরতির' অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের যথাসাধ্য বিকাশ ও অব্যক্ত অথবা অর্দ্ধব্যক্ত ভাবের সম্যক্ পরিস্ফুটন করিতে চেষ্টা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে; ও তদুদ্দেশ্য সাধন সৌকর্য্যার্থে প্রত্যেক কবিতাই পৃথক রূপে আলোচিত হইবে।

আরতি—

'আরতি' আরতিতেই আরম্ভ। 'পরায়' প্রভাত গাহিয়া, 'গীতিকা'র মধ্যাহ্ন গীতি সমাপ্ত করিয়া, 'দীপালীতে' সাঁঝের দীপ জ্বালিয়া, 'আরতি'তে কবি ভারতীর শেষ আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।—

জাগিয়া উঠিছে এদীন ভক্ত
করিবে তোমার আরতি,

নূতন বরষে নূতন হরষে
বস' হৃদাসনে, ভারতী!
তৃষিত ব্যাকুল এদীন ভক্ত
করিবে তোমার আরতি!

আজন্ম ভারতী সেবায় নিযুক্ত কবি আজিও সঙ্কুচিত, সন্দিগ্ধচিত্ত, তাই গাহিতেছেন—

দুয়ারে তোমার কাঙ্গালের মত
ফিরিব বিফল ভ্রমণে?
মেলি স্নেহ আঁখি নিবেনা কি ডাকি
পূজার গোপন ভবনে?
কুসুম অর্ঘ্য উঠিছে শুকায়ে
অশ্রু কাঁপিছে নয়নে।

কবির এই আত্ম-অবিশ্বাসে বাস্তবিকই আমাদের হাসি পায়, সুরভি-কল্পিত-কুসুমে মালা গাঁথিয়া প্রতিভা-পরাগে রঞ্জিত করিয়া ভারতীর পদে কবি যে প্রীতি-অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন তাহার সুবাস সুদূরে ছড়াইয়া পড়িবে ইহাই আমাদিগের ধ্রুব ধারণা।

কিন্তু মধুসূদনের মত আত্ম-বিশ্বাস না থাকিলেও কবি গাহিবেন। তোমার আমার ব্যক্তিগত, বিষয়গত গান নহে; যে সঙ্গীতের সুর-গৌরবে ভুবন ভরিয়া যায়, যে সঙ্গীতের অপ্রতিহত গতি চন্দ্রে সূর্য্যে, ব্যোমে, নৈশাকাশে, সমস্ত বিশ্বে প্রধাবিত হয় যে সঙ্গীত ব্যক্তিগত ভাব বিস্মৃত হইয়া সর্ব্ব জীবে ছড়াইয়া পড়ে, এ সেই সঙ্গীত—

সেইত সে গান, জ্বালা আছে যার,
বেদনা বাহি যার বুকে;
কোলাহল তুলি বাহিরি'সে আসে
মদ মত্ত গতি সুখে!
লক্ষ্য হয় তার, সুনীল আকাশ,
সুকুমার তনুরুচি
বিশাল বিশ্বের ঊর্দ্ধপানে চায়ে
তার আঁখিধারা মুছি!

রহস্যের অভ্র বিঁধে দিয়ে আসে
আপনার আরাধনা,
মরণের লৌহ কবাটে আঘাতি'
তুলে' আসে ঝন্‌ঝনা।

দেখিতে দেখিতে, ছড়ায়ে সে পড়ে
লোক লোকান্তর ময়;
সে যে কভু ছিল একেলার গান,
কার সাধ্য চিনে লয়?

এক দিন জগতের আদি মহাকবি সঙ্গীত-সুর-লহরীতে ভুবন ভরিয়াছিলেন:—

স্বর্গের সংস্কার ভুলেনি তখনো
মর্ত্ত্য পদে পদে ভুগে;

সে দিনে মহাকবির সেই সঙ্গীত-সুধা পান করিবার জন্য জগতের প্রাণে যে দারুণ তৃষা জাগিয়াছিল

ধ্যান মগ্ন কবি আপনার মাঝে
করিলেন অনুভব
নিখিলের সেই নাড়ীর কম্পন,
আশার সে কলরব!

তখন অপূর্ব্ব-তান-লয়ে কবি যে গান গাহিয়া উঠিলেন—

—সেকি সুধু তাঁর গান?
সকলে মিলিয়া যোগাইল তাঁরে
সঙ্গীতের উপাদান!

কিন্তু আজি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, পাশ্চাত্য-সভ্যতা-বিড়ম্বিত দেশে, আরতির কবির সে সৌভাগ্য কই?

আদি অকৃত্রিম সে সাহস কই
এবে সঙ্গীতের মাঝে?
স্ফীত বক্ষ পুটে উড়ে সে যখন
সভ্যতা-শৃঙ্খল বাজে?

তাই আজ কবির এই আত্ম অবিশ্বাস সভ্যতার অপ্রকৃত আঙ্গরাখার মধ্য হইতে কবিতার প্রকৃত রশ্মি ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন কিনা এই সন্দেহ। কিন্তু এই সন্দেহ সত্ত্বেও কবি গাহিয়াছেন, ভয়ে ভয়ে, তোমার আমার মুখের দিকে চাহিয়া কবি দুই একটি তান ধরিয়াছেন। আজ সাহিত্য জগতের এই অরাজকতার দিনে আরতির কবির হৃদয়ে যে তার বাজিয়া উঠিয়াছে তাহার ঝঙ্কার সমস্ত বিশ্বে প্রবাহিত হইবে।

ছন্দৈশ্বর্য্যেও 'আরতি'র * অভিনবত্ব। কবি আরতিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া ত্রিবিধ ছন্দে উহা রচনা করিয়াছেন। আরতির বাজনা যেরূপ মৃদু হইতে স্পষ্ট, স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠে, ও পরিশেষে শঙ্খের গাম্ভীর্য্যে ভক্তের হৃদয়ে মহৎ ঝন্ ঝনার সৃষ্টি করে, সেইরূপ আরতির প্রথম অতিমাত্র কোমল ছন্দে রচিত হইয়া, মধ্য ও শেষ ভাগে বিচিত্র রচনা কৌশলে ছন্দ শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা ভাবিবার, বলিবার বিষয় নহে।

"বর্ষ মঙ্গল।"

বর্ষারম্ভে কবিমাত্রেরই কবি-প্রতিভা মুখরিত হইয়া উঠে। নানা দেশে নানা ভাষায় নববর্ষের মঙ্গলগীতি গীত হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গের নূতন কবি আজ যে মহৎ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নববর্ষকে আহ্বান করিয়াছেন সমস্ত বঙ্গসাহিত্যে তাহার তুলনা কোথায়?

আশা ভালবাসা, উৎসাহ উদ্যম লইয়া নববর্ষের শিশুরবি উদয়াচলে উদিত হইয়াছেন। যারা বিশ্বে কি এক মঙ্গল স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। সেই স্রোতে অতীতের অশুভরাশি ভাসিয়া যাইতেছে নববর্ষের মঙ্গল তুরী গম্ভীর নির্ঘোষে ঘরে ঘরে ডাকিয়া ফিরিতেছে—

ডাকি' ফিরে তুরী!—
কি দুশ্চর পুণ্যব্রতে, কীর্ত্তির দুর্গম পথে!—
ডাকে ধ্বনি ঘরে ঘরে ঘুরি!—

* পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সমগ্র কবিতা পুস্তক ও 'আরতি' শীর্ষক কবিতার মধ্যের প্রভেদ বিবেচনা করিবেন।

কোন মহা রণাঙ্গনে, যুঝিবারে প্রাণপনে,
ফলাফল দিতে বিসর্জ্জন;
কোন্ দীর্ঘ পরীক্ষায় ত্যাগে, তপে, তিতিক্ষায়
ধর্ম্মধন করিতে রক্ষণ!—
উত্তরিতে কোন্ পারে মরণের সিংহ দ্বারে,
বিপদের কোন তুঙ্গ চূড়ে!
—উঠুক তুরীর তান, ছুটুক চেতায়ে প্রাণ
তাপিত পতিত বিশ্ব জুড়ে'!

কিন্তু আশার এই সংমোহন গীতে অকস্মাৎ নৈরাশ্য ফুটিয়া উঠিল। বর্ষের পর বর্ষ চলিয়া গিয়াছে, পুরাতনের পর নূতন আসিয়াছে, কিন্তু হতভাগ্য অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতির হৃদয় সজীব করিতে পারে নাই, তাহাদিগকে ত্যাগ, তিতিক্ষা শিক্ষা দিতে পারে নাই, সংসার সমরাঙ্গনে প্রাণপণে যুঝিবার শক্তি তাহাদিগকে দিতে পারে নাই। হয়ত আজ নববর্ষের নূতন প্রভাতে—

স্বর্গের ধিক্কার চুপে, কাল বৈশাখীর রূপে,
সাজিতেছে করি ঘোর ঘটা!

কবি তবুও আশায় বুক বাঁধিতেছেন, নববর্ষের অভ্যর্থনার আয়োজন করিতেছেন। কে জানে আজ নববর্ষারম্ভে জগদ্ব্যাপী কি মঙ্গলের সূচনা না হইতেছে। প্রীতি প্রফুল্লিতচিত্তে কবি তাই গাহিতেছেন—

এ যদিগো, সেই হয়, যার আশে বিশ্বময়
প্রতীক্ষা জাগিছে প্রাণে প্রাণে!

আজ ভারতের কি দুর্দ্দিন। চারি দিকে অশান্তির কোলাহল; হিংসা, দ্বেষ, আত্ম কলহে সোণার ভারত ছারখারে যাইতে বসিয়াছে। ভারতের এই ঘোর দুর্দ্দিনে কবিরও আত্ম বিস্মৃতি ঘটিয়াছে—

কবিরো বীণায় উঠে, শোণিতের সুর ফুটে;
রক্ত পিয়ে মাতাল সবাই!

কিন্তু নূতন কি অতীতের এই অমঙ্গল রাশি দূর করিবে না? কবি-হৃদয়ের ব্যাকুলতা কবির ভাষায় কি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে—

হে নূতন তব সনে জাগুক সবার মনে

অতীতের প্রকাণ্ড প্রমাদ;
শান্তিতে পড়ুক ঢাকা দু'দিনের রক্ত মাখা
ধরণীর কলঙ্ক-সম্বাদ!

অতীতের অশুভ রাশি ভুলিয়া আজ শেষ বিদায়ের দিনে অনুতপ্ত হৃদয়ে কবি গাহিতেছেন—

অশুভ দিয়েছ যত, সয়েছি যে ব্যথা ক্ষত,
স্মৃতি হ'তে যেতেছে সরিয়া;
আজ শুধু তব তরে নব অনুরাগ ভরে
আঁখি দু'টি উঠিছে ভরিয়া!
"দুঃখের সীমানা।"

নাম শুনিয়া চম্‌কিয়া উঠিও না। দুঃখময় জীবনের দুঃখের সীমানা নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা তোমার মনে এইরূপ ধারণা হইতে পারে, কিন্তু তোমার মনোভাব লইয়া কবি এই কবিতা রচনা করেন নাই। কবি তর্কজাল বিস্তার করিয়া দুঃখের অনস্তিত্ব প্রতিপাদন করেন নাই; সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে ব্যথিত, ক্লিষ্ট মানব হৃদয়ে ভগবৎভক্তি রূপ যে শুভ্রালোকের সঞ্চার হয় কবি তাহাকেই দুঃখরূপ অন্ধকারের বিনাশক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একদিন এমন ছিল যখন—

ভাবিতাম আমাদেরি চাহি
ফুটে ফুল, নভে উঠে তারা
বায়ু বহে নাচায়ে পরাণ,
শিরে জ্যোৎস্না ঢালে স্নিগ্ধ ধারা।

তখন জগৎ স্রষ্টাকে দয়ার আধার, করুনার নিদান মনে করিতাম। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন নিতান্ত আপনার একজনকে হারাইয়া বিশ্বাস অবিশ্বাসে পরিণত হইল। মর্ম্মবেদনায় কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলাম—

—এই তব দয়া?
হে নির্দ্দয়, নাই, তুমি নাই!
ঝঞ্ঝা সম এসেছে জগৎ
দিশাহারা অন্ধকার হ'তে,

ছুটিয়াছে উন্মাদের মত
আপনারি নিপাতের পথে!
পাপ-পুণ্য-মিছে কোলাহল,
দুর্ব্বলের মানস বিকার
পরকালে মূর্খের স্বপন,
ইহকাল দুঃখের আধার!

কিন্তু কে তুমি হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া জ্ঞানালোক প্রদানে কৃতার্থ করিলে! জগতের ঘাত প্রতিঘাতের, অশুভ রাশির মরণ কোলাহলের মধ্যে মঙ্গল উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত দেখিতে শিখাইলে? আজ শত সহস্র মরণের মধ্যেও তোমার মঙ্গল-নিদেশ অনুভব করিতেছি—

কিন্তু কি বিধান!—যে নিয়মে
ভ্রাম্যমান্ গ্রহ তারা কূল
কেহ কারে নাহি দেয় বাধা,
কোন দিন নাহি করে ভূল;—

সেই সত্য, শান্ত, ধ্রুব শুভ
নিখিলের শৃঙ্খলা নিচয়।
এত ঘাত-প্রতিঘাত সহি
লক্ষ হ'তে ভ্রষ্ট নাহি হয়।

আবর্ত্তনে বিবর্ত্তনে ঠেকি',
বিপ্লবে বিগ্রহে উঠি' পড়ি',
শৃঙ্খলাই হ'তেছে সুদৃঢ়
নব নব শুভ সূত্র ধরি'।

আমাদের মরণেও আগে
লাগে সবি প্রহেলিকাবৎ;
স্থির ইহা, ক্রমোন্নতি পথে
উঠিতেছে অপূর্ণ জগৎ।

তাই মনে হয়—

এপারে আঁধারে রহি যেন
ওপারের দেখেছি নিশানা;
অকূল অনন্তে সন্তরিয়া
পেয়েছি বা দুঃখের সীমানা!

"সিন্ধুর প্রতি"।

প্রমথ বাবু কবিতারাণীর সান্ধ্য অর্চ্চনার জন্য যে হার গাথিয়াছেন, তাহার সমস্ত ফুল গুলিই স্বর্গীয় সৌরভে সৌরভময়। প্রত্যেকটীর বিষয় পৃথকভাবে বলিতে গেলে প্রকাণ্ড একখানি গ্রন্থ হয়। তাই আর দুই একটির বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।

বাস্তবিক প্রমথ বাবুর "সিন্ধুর প্রতি" কবিতাটি পাঠ করিয়া যুগপৎ মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছি। কেন মুগ্ধ হইলাম? কবিতাটি মনঃ সংযোগ পূর্ব্বক বারম্বার পাঠ করিয়া নিতান্ত আপনার না করিলে বুঝিতে পারিবে না। এরূপ তেজস্বিনী অথচ বিনয়নম্র, উদার অথচ অর্থ পূর্ণ ভাষা বাঙ্গলা সাহিত্যে আমার চক্ষুগোচর হয় নাই। যেমন শব্দ বিন্যাস চাতুর্য্য, তেমনি বর্ণনার বাহাদুরী; বর্ণনা কৌশলে সাগরের জীবন্ত ছবিখানি আমাদের সম্মুখে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। সহস্র যোজন দূরে থাকিয়াও সাগরের গভীর নির্ঘোষ, মর্ম্মভেদী হুহুঙ্কার শুনিতে পাই। আরতির প্রত্যেক কবিতাতেই ভাষা ভাবের ও ছন্দ বিষয়ের অনুগামী। "সিন্ধু" শীর্ষক কবিতায় তাহার চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া যায়।

আর ভাষা! আধুনিক কবি হৃদয় যে এরূপ সহৎভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারে ইহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। অতি দুঃখে কবি গাহিয়াছেন—

বিদ্যার তরণী,
—পল্লব গ্রাহিতা,— বিদ্যা আজ;
জ্ঞানের অরণী,
—জ্ঞান আজ 'মুখস্থে' বিরাজ।

আজ এই "পল্লব গ্রাহিতার" এই "মুখস্থের" দিনে আরতির কবির হৃদয়ে মৌলিক বিদ্যার স্রোত বহিয়া গিয়াছে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই কি?

এই বিশ্বকাণ্ডে বিশাল বারিধির বিস্তৃত বক্ষে বিষম বিপ্লবের ন্যায় বিরাট ব্যাপার বোধ হয় আর কিছুই নাই! বাত্যাহত তরঙ্গমালার ভীম উল্লম্ফণ, ভৈরব ভ্রুকুটীভঙ্গি, তোমার আমার মনে ভীতির সঞ্চার করিতে পারে, কিন্তু আরতির কবির হৃদয়ে কি নির্ভিক ভাবের, কি উচ্চ আশার উদ্দীপনা করিয়াছিল—

তিষ্ঠ তিষ্ঠ, হে বারিধি, কি করিতে চাহ বসুধারে?
নখে দন্তে নিপীড়িয়া উৎপাটিয়া নিবে যেন তারে!
এ নহে বিশ্বাসঘাতী নদীর ভাঙ্গন,—ক্ষুদ্র দ্বেষ!—
—হয়ত, এ দ্বন্দ্বে আছে তব রুক্ষ মঙ্গল নিদেশ!

আমরা অনেকে সাগর দেখিয়াছি, কিন্তু সাগর সঙ্গমে আমাদের হৃদয়ে এমন উদার ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে কি? আমরা কি ভীতি বিকম্পিত চিত্তে সমুদ্র তটে দণ্ডায়মান হইয়া উর্ম্মিমালার অপূর্ব্ব খেলা অবলোকন করিয়া সাগরকে কেবল মাত্র সংহারকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করি নাই? কিন্তু সাগরের এই তরঙ্গভঙ্গ এই ঘোর অশনিনির্ঘোষ কবিহৃদয়ে সুধা ধারা ঢালিয়া দিতেছে, কবি অপূর্ব্ব আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন—

ঢাল' ঢাল সুধা ধারা, আমি তব ভক্ত মাতোয়ারা,
বসিয়া তোমার কূলে উল্লাসে উচ্ছ্বাসে দিশাহারা,
শুধু চেয়ে আছি, রূপোন্মাদ, শুধু মত্ত আছে পানে,
অলৌকিক বাণী তার পশিতেছে লুব্ধ মুগ্ধ কাণে;

সমুদ্রের ভীষণ সংহারদৃশ্য কবির প্রাণে কি এক অভিনব মহত্তার সঞ্চার করিয়াছে। সাগর-প্রেমে মাতোয়ারা কবি মনুষ্য ভাগ্যে বীতশ্রদ্ধ—

মোরা কোথাকার জীব? কে জানে সে আদিম আবাস?
এ ধরাত আমাদের দু'দিনের মধুর প্রবাস!

তাই কবি ধবল উষ্ণীষধারী উর্ম্মি-মল্লগণের সৌভাগ্যে সুখানুভব করিয়াছেন—

ধবল উষ্ণীষধারী বল, তব উর্ম্মিমল্লগণ
কোন্ পুণ্যে অহোরাত্র রঙ্গ ভূমে করে বিচরণ?
তাদের কি তৃপ্তি নাই? শয্যা নাই শীতল তলে?
সুখী তারা; ধূলার দুলাল মোরা কোন্ কর্ম্ম ফলে,

সৌভাগ্যেরে প্রাণ ভ'রে সম্ভোগ করিতে মনে ধাই,
মৃত্যু যদি ছাড়ে, তবু আগে শ্রান্তি, তৃপ্তির বালাই!

অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া সমস্তের সৌন্দর্য্য অনুভব করাণ অসম্ভব। কবির হৃদয় কি বিমল, স্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত, কবি ভাব-রাজ্যের কি উচ্চস্তরে বিচরণ করিতেছেন, তাহা কথায় বলিবার নহে। ভাবে ভাষায়, ছন্দে বন্ধে 'সিন্ধু' শীর্ষক কবিতা কাব্যজগতের একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সুধু এই কবিতাটী যাঁহার লেখনী হইতে নিসৃত হইয়াছে, তিনি সাহিত্য জগতে অমর হইয়া রহিলেন সন্দেহ নাই।

"আভীর দম্পতী" শীর্ষক কবিতাটী কবির সহৃদয়তা ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচায়ক। এই কবিতার দুই এক ছত্রে কবি যে সতী চরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন "বিধবার" তাহার সম্পূর্ণ পরিণতি ঘটিয়াছে। অনুতপ্ত আভীর-পতি মর্ম্মস্পর্শীনি ভাষায় যে করুণ গীতি গাহিয়াছেন তাহা অনেকের শিক্ষার স্থল হইয়া রহিল। "ভীষ্ম" কবিতা অনন্ত সাধারণকবি প্রতিভার আর একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। মহাভারতে, কাব্যে, নাটকে ভীষ্ম চরিত্র অনেকবার পাঠ করিয়াছি, কিন্তু পুত্রের পিতৃভক্তিরূপ প্রতিমার উদ্দেশে অকাতরে আত্ম বলিদান এমন উজ্জ্বল বর্ণে আর কোথাও চিত্রিত দেখি নাই। "গৌরাঙ্গ" সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। উপক্রমণিকায় এই কবিতা সম্বন্ধে কবি স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন তাহাই ইহার প্রকৃষ্ট সমালোচনা। তবে এ কথা বলিতে হইবে যে ভাষার উপর প্রমথ বাবু সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। তিনি যে বিষয়ে যে ভাবে ভাষাকে নিয়োজিত করিয়াছেন, রচনা কৌশলে তাহাই মধুর হইয়া উঠিয়াছে। গৌরাঙ্গের স্থানে স্থানে ভাষা ও ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে এক অপূর্ব্ব তুফানের সৃষ্টি হইয়াছে। পাঠক মাত্রেই তাহা অনুভব করিবেন ভরসা রাখি। "সমালোচনার সমালোচন" সমালোচক বিশেষের পল্লব গ্রাহিতার প্রতি তীব্রকটাক্ষ মাত্র। আরতিতে ইহার স্থান না হইলেই ভাল হইত।

এ কথা সত্য যে সমালোচনায় সমালোচ্য বিষয়ের দোষগুণ দুয়েরই উল্লেখ করিতে হয়। আরতি যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ তাহা বলি না। মাত্রা ও যতির অসম বায় হেতু স্থানে স্থানে ছন্দ ভগ্ন হইয়া থাকিতে পারে। কচিৎ

দুই এক স্থানে ভাষারও ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু জগতের মহা কবিদিগের কাব্যেও এবম্প্রকার ভ্রম দুর্ল্লভ নহে। বিশেষতঃ ভাষার ভ্রম প্রমাদ উল্লেখ করা অর্থকারের কার্য্য, সমালোচকের নহে। দেখিতে হইবে যে কাব্য পাঠে হৃদয়ে অভিনব আনন্দের উৎপত্তি হয় কিনা; আমাদের হৃদয়ের বৃত্তিগুলি কবির কবিতায় সম্পূর্ণ পরিস্ফুট দেখিতে পাই কিনা; ক্ষণিকের জন্যও আমরা জ্বালাময় জগতের ক্ষুদ্র স্বার্থ দূরে রাখিয়া এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব, অনাবিল আনন্দের রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারি কিনা; অপনাহারা হইয়া বিশ্বস্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলিয়া যাই কিনা। ইহাই যদি প্রকৃত কাব্যের লক্ষণ হয় তাহা হইলে 'আরতি' কাব্য ক্ষেত্রে উচ্চ স্থান কেন অধিকার না করিবে? তবে দেখিতে হইবে কবি বাস্তব অগ্রাহ্য করিয়া কল্পনার কুহেলিকায় আমাদের ভ্রম জন্মাইতেছেন কিনা। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণা হয় যে 'আরতি'র প্রত্যেক কবিতাই বাস্তব ও কল্পনার সুন্দর সমাবেশ হেতু এত সুমধুর হইয়া উঠিয়াছে। কবি পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন কিনা, কাব্য ক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষত্ব আছে কিনা, নিরপেক্ষ পাঠকগণ ইহার বিচার করিবেন।

আর দুই একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়াও যে প্রমথ বাবু সাহিত্য সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন ইহা আমাদের সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। সাধারণের মত তিনি সাংসারিক ব্যাপারে বিব্রত নহেন, তাই ভরসা রাখি নিত্য নব কুসুমে তিনি ভারতীর পদে ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করিতে থাকিবেন। আমরা তাঁহার আরতির অলৌকিক স্বর্গীয় সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়াছি। আশা থাকিল তাঁহার প্রাণোন্মাদক সুকোমল গীতি স্তব্ধ নিশীথের সুদূর বীণাধ্বনীর ন্যায় প্রস্ফুট ও সুমধুর তানে বাজিয়া উঠিবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আত্মসমর্পন।

ও গো! কি গান গাহিছ তুমি,
কোথায় বা যেতেছ জননী—
কেবল কুল কুল করিয়ে?
প্রেমে তোর উথলিছে অঙ্গ,
ও গো! আশে কাহারই সঙ্গ
যেতেছিস এমন করিয়ে।

তুমি শোন না কারও কথা,
কারেও বল না মন কথা;—
পুষেছ গো যে ব্যথা হৃদয়ে।
চলিছ কি অনন্তের পথে,
চলিবে কি সারাটী জীবন
শুধুই দুঃখ গান গাহিয়ে।

মাগো! তোর ও গান শুনিয়ে,
হৃদয় উঠিতেছে কাঁদিয়ে,
আমি ও যাইব তোর সাথে।
তোরই মত গাহিব গান,
তোরই মত আমিও প্রাণ,
সঁপিব অনন্তের হাতে।

(তোর) স্নেহময় কোলেতে বসিয়া,
যাইব গো নাচিয়া নাচিয়া
সুদূর অনন্তেরই পানে।
(তোর) ওই গলাতে গলা মিশিয়ে,
আমি ও সুরে তালে গাহিয়ে
মাতাব ব্যোম করুণ তানে।

সংসারে কত দুঃখ পাইয়া,
সবে স্বার্থের দাস দেখিয়া
এরে ত্যজিতে করেছি মন।
ও মা! তোমা ছাড়া আর কারে,
আমি দেখিনি এমন ক'রে
মোর দুঃখে জানাতে বেদন।

ওগো! দুইজনে এক তানে,
মোরা, মিশাইয়া প্রাণে প্রাণে,
গাহিব মোদের দুঃখ গাথা।
দুজনেতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
নয়নের জলেতে মুছিয়া,
ফেলে দিব হৃদয়ের ব্যথা।

আমরা আমোদে ভাসিয়া,
নাচিয়া নাচিয়া নাচিয়া,
সঁপিব জীবন অনন্তের পায়।
অনন্তের কোলে শুইয়া,
অনন্তের গান গাহিয়া
এদুঃখ জীবন মিশাইব তায়।

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সাহিত্য-সমালোচনা।

১। উত্থান,—শ্রীকাব্যানন্দ প্রণীত। সুন্দর ছাপা, উৎকৃষ্ট কাগজ, মূল্য তিন আনা। উত্থান অভিষেক উপলক্ষে রচিত ও ইতিমধ্যে অনেক স্থানে অভিনীত হইয়াছে। শিশুরা যেমন পিতার নিকট আব্দার জানায়, উত্থান বা "Appeal to the Emperor" সেই ভাবের মূল লইয়া সৃষ্ট। দুর্ভিক্ষ মহামারী, অন্ন পাশ প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া কাব্যানন্দ সম্রাটের করুণা প্রার্থনা,

করিয়াছেন। কাব্যানন্দের কবিত্ব শক্তি যথেষ্ট পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার পদ্য অতি সুন্দর ও লালিত্বময়। একটি স্থান মাত্র উদ্ধৃত করিলাম,—

"——অথবা তুমি কহ নৃপ কহ,
দুঃসহ পীড়নে সারা মর্ত্ত্যে অহরহ
উঠিয়াছে মর্ম্মান্তিক আর্ত্ত কোলাহল,—
তুমি যদি অপারগ নিশ্চেষ্ট অটল
শাসিতে ধরণী ধরি' দৃঢ় ন্যায়দণ্ড,—
রহমুক, রঙ্গে মত্ত প্রায় অপোগণ্ড,
বিলাসে বিহ্বল শুষি' মর্ত্ত্য-রক্ত ধারা
ঐশ্বর্য্য বিকারে পুনঃ নিত্য আত্মহারা,—
বিস্মৃত কর্ত্তব্য নৃপ, নিরুদ্ধ শ্রবণে
পশেনা সে আর্ত্তধ্বনি, অশনি ধারণে
বিকল ও বাহু যদি, দেহ আজ্ঞা তবে,
একদ্র ত্রিশূল সম প্রচণ্ড আহবে
আনিবে ত্রিদিব মর্ত্ত্যে একাকার করি',
সপ্তসর্গ রসাতল চকিতে শিহরি'
উঠিবে গর্জ্জিয়া যেন অযুত জীমূত
করাল ভয়াল! রুদ্রতেজে অদ্ভুত—
দণ্ডে দণ্ডে দৈত্য দলে দহি' দাবানলে
দাঁড়াবে বিক্রমে আসি' হাসি' খল্‌খলে
বৈজয়িক! স্তব্ধ, ক্ষুব্ধ, হবে কম্পমান
আস্তম্ভ সে ব্রহ্ম—মর্ত্ত্য লভিবে উত্থান!!"

কল্পনা এক দিকে যেমন মাধুর্য্যময়ী অন্য দিকে তেমনি ওজস্বিনী ও শক্তি শালিনী।

২। তাপস কুমার,—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, ঐতিহাসিক উপন্যাস। পড়িয়া সুখী হইলাম। গ্রন্থকার চরিত্র চিত্রনে সুদক্ষ।

৩। প্রসূনাঞ্জলি, 'স্নেহলতা', 'প্রেমলতা' প্রভৃতি রচয়িত্রী প্রণীত। আমরা ইতিপূর্ব্বে কোন মহিলার এমন গবেষণাপূর্ণ ধর্ম্মভাবপ্রবণ রচনা পাঠ করি নাই।

৪।৫।৬। যুগল প্রদীপ, কোহিনুর, অমৃত পুলিন,—শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত।

৭।৮। প্রেমলতা, শান্তিলতা।—এই পুস্তকগুলির সমালোচনা বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

—০—

পরলোকগত সুরেশচন্দ্রসাহা প্রবর্ত্তিত।
শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত।

উৎসাহ।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

৫ম বর্ষ; { রাজসাহী, কার্ত্তিক, ১৩০৯। } ১২শ সংখ্যা।

সঙ্গ-হারা।

আমি ভেবেছিনু যাব তোমার সঙ্গে জীবন পারে,
এক সাথে খেয়া করিব বন্দ ভব কিনারে।
কই আর সখা হ'ল তাহা বল,
আমি কোথা চলি, তুমি কোথা চল,
তোমাতে আমাতে এত ছাড়াছাড়ি গৃহের (ই) ধারে,
কেমনে চলিব তোমার সঙ্গে জীবন পারে,
এই আঁধারে?

কখন্ যে কাল মেঘ করে' এল গগণ ছেয়ে!
তোমার সঙ্গে কেমন চলিব তরণী বেয়ে?
কাজ নাই সখা আমার লাগিয়া,
কত আর বল রহিবে জাগিয়া,
বারবার কত পড়িবে পিছায়ে আমারে চেয়ে?
ঐ দেখ মেঘে প্রলয়-ঝঞ্ঝা আসিছে ধেয়ে।
গগণ ছেয়ে!

প্রাণপণে তাই ছোট ভাই ছোট প্রাণের তরে,
কেন ফিরে আর চাহিতেছ মোর নয়ন'পরে?
ক্ষুদ্র এ তরি যেতে কিগো পারে,
তোমার সঙ্গে জীবনের পারে,
অবসাদ আসে অঙ্গ ঘেরিয়া শ্রান্তি ভরে'
বিশ্ব জগৎ আঁধারিয়া আসে আঁখির' পরে,
সুচির তরে।

মাঝখানে এসে তরণী আমার ডুবিল শেষে,
তোমাতে আমাতে চির দেখাশুনা এক নিমেষে।
এতদিন যা'রে বহু সমাদরে
এনেছিলে সখা চোখে চোখে ক'রে
আজি তোরে ছেড়ে ডুবিনু কিম্বা চলিনু ভেসে।
হয় যদি দেখা, হবে পুন সেই মিলন-দেশে,
অখিল শেষে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

ইংরাজি শিক্ষিতের হস্তে বঙ্গসাহিত্য।*

এখন অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে ইংরাজি শিক্ষিতের হস্তে বঙ্গ সাহিত্যের ভার অর্পিত হওয়ায় সাহিত্যের অনেকটা দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু আমাদের বোধ হয় এরূপ সমালোচনার কোন মূল্য নাই। কারণ ইংরাজি শিক্ষিতের সাহিত্যে প্রেম, ভক্তি দয়া, সমতা প্রভৃতির যে সুন্দর বিকাশ হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সাহিত্য ও পূর্ব্ব সাহিত্যের আলোচনা করিলেই সত্য তথ্য অনেকটা পরিস্ফুট হইবে।

* এই প্রবন্ধ রচনায় 'নির্ম্মাল্য' পত্রিকার সাহায্য লইয়াছি। লেখক।

চণ্ডীদাস আমাদিগের আদি বঙ্গীয় কবি—তিনিই সর্ব্বপ্রথমে প্রেমের কবিতা, বিরহের গীত রচনা করিয়া তাঁহার মাতৃভাষার সেবা করিয়াছেন। আমরা চণ্ডীদাস হইতে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া, রাধাকে ভুলিয়া মথুরার রাজা হইয়াছেন। তখন ব্রজধামে বসন্ত সমাগম হইয়াছে। রাধিকার তখন বিরহাবস্থা। বিরহ বিধুরা রাধিকা কহিতেছেন :—

"কালি বলি কালা গেল মধুপুরে
সেকালের কত বাকি।
যৌবন সায়রে সরিতেছে ভাঁটা
তাহারে কেমনে রাখি॥

* * *

জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব
যৌবন মিলন ভার॥
"আমার মাথার কেশ সুচারু অঙ্গের বেশ
পিয়া যদি মথুরা রহল।
ইহ নবযৌবন পরশ রতন ধন
কাচের সমান ভেল॥"

ইত্যাদি!

জীবন থাকিলে "বঁধু" আবার মিলিবে, কিন্তু যৌবনের জোয়ার চলিয়া গেলে আর আসিবে না—তাই রাধিকার বড় আক্ষেপ হইয়াছে। যদি এমন সরস বসন্তে, কোকিলকূজনমুখরিত কেলীকুঞ্জে "পিয়ার" সহিত মিলনই না হইল, তাহা হইলে এচারুবেশে, এচিকুর কেশে, এনবযৌবনে, এ বেণীবন্ধনে আর কি প্রয়োজন?

শ্রীকৃষ্ণের এত দীর্ঘকাল দূরে অবস্থান দেখিয়া রাধিকার মনে একটা দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, বুঝি 'বঁধু' আমার আর কাহারও প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন—বুঝি আর কোন গুণবতী আমার সেই লুব্ধ কালো ভ্রমরকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। তাই তিনি সখীদিগকে কহিতেছেন—

"কোন সে নগরে নাগর রহল
নাগরী পাইয়া ভোর।
কোন্ গুণবতী গুণেতে বেঁধেছে
সুবধ ভ্রমর মোর॥"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকার এত অবিশ্বাস! এই কি পতিগতপ্রাণা শ্রীরাধিকার উপযুক্ত? চণ্ডীদাসের বর্ণনা পাঠ করিয়া শ্রীরাধিকাকে কামাতুরা বলিব কি প্রেমকাতরা বলিব তাহা বুঝিতে পারি না।

কিন্তু ইংরাজি শিক্ষিত কবি মাইকেল মধুসূদন আবার রাধার বিরহ বর্ণনা করিতেছেন:—

"হায়, কেনে ব্রজে আজি ভ্রমিছ হে তুমি
মন্দ-সমীরণ?
যাও সরসীর কোলে, দোলাও মৃদুহিল্লোলে,
সুপ্রফুল্ল নলিনীরে—প্রেমানন্দময়।
ব্রজ-প্রভাকর যিনি, ব্রজ আজি ত্যজি তিনি,
বিরাজেন অস্তাচলে—নন্দের নন্দন!
সৌরভ রতন দানে তুষিবে তোমারে
আদরে নলিনী;
তবতুল্য উপহার, কি আজি আছে রাধার?
এনিকুঞ্জে কাঁদে আজি রাধা বিরহিনী!
তবে যদি হে সুভগ, অভাগীর দুঃখে
দুঃখী তুমি মনে,
যাও আশু, আশুগতি! যথা ব্রজ কুলপতি—
যাও যথা পাবে, দেব! ব্রজের রতনে।
রাধার রোদন-ধ্বনি, বহ যথা শ্যাম মণি—
কহ তারে মরে রাধা শ্যামের বিহনে।
* * * *
উতরিবে যবে যথা রাধিকারমণ,
মোর দূত হয়ে,

কহিও গোকুল কাঁদে, হারাইয়া শ্যাম চাঁদে—
রাধার রোদন-ধ্বনি দিও তাঁরে লয়ে;
আর কথা আমি নারী, সরমে কহিতে নারি—
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে! আমি দিব কয়ে।"

ব্রজাঙ্গনা কাব্য।

মধুসূদনের রাধিকার রোদনই জীবন সম্বল। এখানে যৌবন গেল রূপ গেল বলিয়া আক্ষেপ নাই—কৃষ্ণের প্রতি সেই নিষ্ঠুর অবিশ্বাস নাই। রাধিকা আপনার দুঃখে আপনি বিভোরা। তিনি যৌবনের তৃষা মিটাইবার জন্য কৃষ্ণকে চাহেন না—প্রেমের জন্য তাঁহার ভিখারিণী। তাই বসন্তসমাগম দেখিয়া তিনি কহিতেছেন—হে মলয়ানিল! তুমি আর আজ কেন ব্রজে আসিয়াছ? ব্রজের প্রভাকর আজ অস্তাচলে। সেই নন্দ-নন্দনের বিরহে আজ ব্রজ অন্ধকার। সরসীর ক্রোড়ে যেখানে বিকশিতা নলিনী প্রেমানন্দে প্রস্ফুটিতা তুমি সেই খানে যাও। নলিনী তোমার আদর করিবে। আমি বিরহ বিকলা অভাগিনী—শ্যামপরশমণি হারাইয়া দুঃখিনী—তুমি এখানে কেন আসিয়াছ? আমার শ্যাম যখন কাছে নাই, তখন তোমাকেও আমি চাহি না। ইত্যাদি।

আবার অন্যত্র দেখুন:—

ময়ূরী দর্শনে শ্রীরাধিকা কহিতেছেন,

"আয় পাখি! আমরা দুজনে
গলা ধরাধরি করি ভাবিলো নীরবে;
নবীন নীরদে প্রাণ, তুই করেছিস্ দান—
সেকি তোর হবে?
আর কি পাইরে রাধা রাধিকারঞ্জনে?
তুই ভাব্ মনে, ধনি! আমি শ্রীমাধবে। ইত্যাদি

ব্রজাঙ্গনা কাব্য।

চণ্ডীদাস ইংরাজি অনভিজ্ঞ, আর মধুসূদন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে মাতৃপদ বন্দনা করিতে গিয়াছেন—

"মন্দোদরী বলে আমি পূজে গঙ্গাধরে।
সেই পুণ্যফলে পুত্র পেয়েছি তোমারে ॥
পরদার মহাপাপ করে তোর বাপ।
সেই অপরাধে এত পাই মনস্তাপ ॥ ইত্যাদি

কৃত্তিবাস। রামায়ণ।

ইন্দ্রজিৎ কহিতেছেন—

স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে যত দেবগণ।
পরদার নাহি করে কোন্ মহাজন ॥
কোন্ জন নাহি করে হেন কদাচার।
মিছে কেন দেহ দোষ পিতাকে আমার ॥ ইত্যাদি

কৃত্তিবাস। রামায়ণ।

মন্দোদরীর মুখে এইরূপ পতিনিন্দা এবং ইন্দ্রজিতের মুখে পিতার পাপ সমর্থনার্থ দেবনিন্দা ও মাতাপুত্রে এইরূপ কথোপকথন বড়ই কুরুচিপূর্ণ। ইহাতে যে উভয়েরই চরিত্র দূষিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই সঙ্গে কবির সমসাময়িক বঙ্গীয় সমাজের একখানি চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। সে চিত্রখানিও দূষিত!

কিন্তু ইংরাজি শিক্ষিত কবি মাইকেলের "মেঘনাদ" বলিতেছেন :—

"দেবি, আশীষ দাসেরে
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে!
দেহ পদধূলি মাতঃ!"

কাঁদিয়া মন্দোদরী কহিতেছেন—

"কেমনে বিদায় তোরে করিরে বাছনি!
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণশশী আমার।

* * *

যাইবিরে যদি—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে
রক্ষুণ এ কাল রণে! এই ভিক্ষা

করি তাঁর পদযুগে আমি। ইত্যাদি।

পঞ্চবটী বনে কৃত্তিবাসের সূর্পনখা

"সত্যজ্ঞানে নিশাচরী লক্ষ্মণেরে বলে ॥
তুমি যুবা হইয়া একেলা বঞ্চরাতি।
রস ক্রীড়া কর তুমি আমার সংহতি ॥"

কিন্তু মধুসূদনের সূর্পনখা রামানুজের মোহনরূপে বিমোহিতা হইয়া তাঁহাকে যে পত্র লিখিতেছেন সে পত্রের ছত্রে ছত্রে গভীর প্রণয়ের উদ্দাম চঞ্চল তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইতেছে। ইচ্ছা হয় পাঠকের সম্মুখে সেই দীর্ঘ পত্রখানি তুলিয়া ধরি, কিন্তু অত স্থান আমার নাই। তাই বাধ্য হইয়া কয়েকছত্র মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

" * * * প্রেমমন্ত্র দিও কর্ণ মূলে,
গুরু দক্ষিণা-রূপে, প্রেম-গুরুপদে
দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতূহলে।"

আবার অন্যত্র—

* * * যতক্ষণ তুমি
থাকিতে বসিয়া নাথ! থাকিত দাঁড়ায়ে
প্রেমের নিগড়ে বদ্ধা এ তোমার দাসী।
গেলে তুমি শূন্যাসনে বসিতাম কাঁদি।
হায়রে, লইয়া ধূলা, সে স্থল হইতে
যথায় রাখিতে পদ, মাখিতাম ভালে,
হব্য-ভস্ম তপস্বিনী মাখে ভালে যথা।"

বীরাঙ্গনা কাব্য।

করুণ রসের উদ্রেক করিতেও ইংরাজি শিক্ষিত কবি সিদ্ধহস্ত। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ গমন করিবেন। বুঝি ভ্রাতৃবৎসল রামের হৃদয়ের রক্ত, দেহের জীবন চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইতেছে। আর বুঝি লক্ষ্মণকে ফিরিয়া পাইবেন না। তাই তিনি কাতর হইয়া বিভীষণকে বলিতেছেন—

"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম!
আকুল পরাণ কাঁদে! কেমনে ফেলির

এ ভ্রাতৃরতনে আমি এ অতল-জলে ?"

তারপর লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম বর্ণনা করিতে করিতে সেই সুখশান্তির সহস্র স্মৃতি বিজড়িত অযোধ্যা পরিত্যাগের কথা স্মরণ করিয়া বাষ্পাকুল লোচনে রাম কহিতেছেন—

" * * উচ্চৈ অবরোধে
কাঁদিলা উর্ম্মিলা বধূ; পৌরজন যত—
* * *
কহিলা সুমিত্রা মাতা-'নয়নের মণি
আমার, হরিলি তুই রাঘব! কেজানে
কেজানে কি কুহক বলে তুই ভুলালি বাছারে!
সঁপিনু এধন তোরে। রাখিস্ যতনে
এগোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি।'
নাহি কাজ মিত্রবর! সীতায় উদ্ধারি।
ফিরি যাই বনবাসে।"
* * *

কিন্তু অবশেষে সেই লক্ষ্মণকে ছাড়িয়া দিতে হইল। বীরকেশরী সুমিত্রা নন্দন ভ্রাতৃপদবন্দনা করিয়া ইন্দ্রজিৎ নিধন মানসে বিভীষণের সহিত যাত্রা করিতেছেন। আকুল হৃদয়ে রামচন্দ্র কহিলেন—

"সাবধানে যাও, মিত্র! অমূল্য রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,
রথিবর! নাহি কাজ বৃথা বাক্য ব্যয়ে,—
জীবন, মরণ সম আজি তব হাতে।" মেঘনাদবধ।

কিন্তু কৃত্তিবাসের রাম বিভীষণকে কহিতেছেন—

"কেমনে সঙ্কটে আমি পাঠাই লক্ষ্মণে
একে ইন্দ্রজিৎ সেই দুষ্ট নিশাচর।
তাহাতে সঙ্কটপুরী লঙ্কার ভিতর॥
বালক লক্ষ্মণ হয় সহজে কাতর।
মনোদুঃখে ফলাহারে শীর্ণ কলেবর॥

কষ্টপেয়ে বলহীন ভাবি তাই মনে।
কিরূপে করিবে যুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ সনে॥"
কৃত্তিবাস। রামায়ণ।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে—

"শ্রীরাম বলেন ভাই দাণ্ডাও মম আগে,
বিভীষণের ভাল মন্দ তোমার যে লাগে।"
কৃত্তিবাস। রামায়ণ।

উদাহরণ দিবার জন্য আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দেখিনা। রাজকন্যা বিদ্যার গুপ্ত প্রেমলীলা প্রকাশিত হইলে সুন্দর কারারুদ্ধ হইলেন। সেই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া বিদ্যার খেদ

"হায়রে বিধাতা নিদারুণ
কোন্ দোষে হইলি বিগুণ।
আগে দিয়া মনোদুখ মধ্যে দিনকত সুখ
শেষে দুঃখ বাড়ালি দ্বিগুণ॥
রমণীর রমণ পরাণ
তাহা বিনা কেবা আছে আন।
সে পরাণ ছাড়া হয়ে যে রহে পরাণ লয়ে
ধিক ধিক তাহার পরাণ॥"
বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্র। ইত্যাদি।

শুনিতে বেশ শ্রুতি সুখকর বটে—কিন্তু ইহাতে প্রাণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে না—অন্তরে বিষাদের একটা দাগ বসে না।

নবীন বাবুর "পলাসীর যুদ্ধে" সিরাজদ্দৌলার কারারুদ্ধা পত্নী পতির জন্য শোকে মুহ্যমানা। তিনি স্বামীর জন্য যেরূপ ভাবে বিলাপ করিতেছেন তাহা পাঠ করিলে সকলেরই চক্ষে জল আসে। বর্ণনা পাঠে বিদ্যার খেদ কৃত্রিম, আর বেগমের খেদ অকৃত্রিম—এই রূপই প্রতীয়মান হয়।

তিলোত্তমা লইয়া সুন্দ এবং উপসুন্দের ভিতর বড়ই বিবাদ হইতেছে। উভয় ভ্রাতাই তিলোত্তমার প্রার্থী। বিবাদ করিতে করিতে পরস্পর ক্রোধান্ধ হইয়া কটুক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিল। ক্রোধোন্মত্ত জ্ঞান শূন্য

সুন্দ, ভ্রাতা উপসুন্দের কথার উত্তরে বলিল ঃ—

"ভেবেছিস্ তুই নিবি এ রূপসী বালা,
নে দেখি কেমনে নিবি আয় দেখি শালা।"
প্রভাকর—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

কিন্তু মধুসূদনের "তিলোত্তমা-সম্ভব" কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় ক্রোধান্ধ জ্যেষ্ঠভ্রাতা কনিষ্ঠকে কহিতেছে—

"কি কহিলি পামর? অধর্ম্মাচারী আমি?
কুলাঙ্গার ধিক্ তোরে, ধিক্ দুষ্ট মতি!"

এই পর্য্যন্তই ভাল। ইহার অধিক উঠিলেই তাহা কুরুচিসম্পন্ন হইয়া পড়ে।

বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পর্য্যন্ত আমরা কোন জাতীয় উদ্দীপনার উন্মেষ দেখিতে পাই না। তখন 'পূর্ব্বরাগ' ও 'মান ভঞ্জনের' যুগ—স্বদেশানুরাগের সময় নহে। তখন যাত্রায় 'মানভঞ্জন', কবিতে 'মানভঞ্জন' পাঁচালীতে 'মানভঞ্জন' টপ্পায় 'মানভঞ্জন'। তখন বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতা 'মাস মাথুরের' ভাবে বিহ্বল। তখন গরু চরাইতে চরাইতে রাখাল বালক মাঠে দাঁড়াইয়া মনোহর সাই সুরে "রাধে গো" "রাধে গো" বলিয়া রাগিণী ধরিত। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হইবার পর হইতেই সে ভাবের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

যখন বঙ্গীয় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'মানভঞ্জনের' তরল স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে গাহিতেছিলেন

"মানময়ী তোলো মুখ কহিছে খঞ্জন,
দেখিব কেমন তোর নয়ন রঞ্জন।
এখনি করিব সব বিবাদ ভঞ্জন
কালো কোরে রাখিয়াছ মাখিয়া অঞ্জন। ইত্যাদি।

যখন "এই খঞ্জন গঞ্জন অঞ্জন মাখা নয়ন রঞ্জন মানভঞ্জনে এবং কুরঙ্গের কুরঙ্গ ভঙ্গকারী সুরঙ্গের তরঙ্গ রঙ্গে" বঙ্গদেশ প্লাবিতা সেই সময় মধুসূদন হিন্দু স্কুলে শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন। সেই সময়েই তাঁহার কবিতার বিষয় স্বদেশানুরাগ—স্বদেশের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া প্রাণস্পর্শী বেদনার কাতরোচ্ছ্বাস। তখনই ইংরাজি কবিতায় মধুসূদন আক্ষেপ করিতেছেন ঃ—

"And where art thou fair freedom! thou
once goddess of Ind's sunny clime!" ইত্যাদি।

সেই 'মানভঞ্জনের' যুগে লোকের মনোভাব ও রুচি এক প্রকার ছিল। তখন ভারত চন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" ও "রসমঞ্জরী" এবং মদন মোহনের "বাসবদত্তা" ও "রসতরঙ্গিনী"র চঞ্চল তরল স্রোতে বঙ্গভূমি ভাসিয়া যাইতেছিল। তখনকার পাঠকের হৃদয় তরল—মন তরল—চিন্তা তরল ছিল। তখনকার লেখকের মনে স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি কঠিন ভাব সকল স্থান পাইত না। এই সময়ে রামমোহনের জন্ম হয়। তিনিই এই তরল দেশের স্রোত ফিরাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন এবং আংশিক কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। রামমোহনের পর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত, ও পূজ্যপাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশের সুশিক্ষা, সমাজ সংস্কার, স্বজনপ্রিয়তা ও স্বদেশানুরাগের খরস্রোতে 'মানভঞ্জনের' তরল স্রোতকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতেই লোকের রুচির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল—চিন্তার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, সুতরাং সাহিত্যও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

সুতরাং পূর্ব্বকালের ইংরাজি অনভিজ্ঞ কবিদিগের বঙ্গসাহিত্যের তুলনায় বর্ত্তমান যুগের ইংরাজি শিক্ষিতের বঙ্গসাহিত্যে যে প্রেম, ভক্তি, দয়া মমতা, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি উচ্চ মানসিক ভাবগুলি আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে সে বিষয় আর সন্দেহ নাই। ইংরাজি শিক্ষিতের বঙ্গসাহিত্য পূর্ব্বকালের বঙ্গসাহিত্য অপেক্ষা উন্নতি ও সুরুচি সম্পন্ন। এখন হেম, রবি, নবীনের কথা দূরে থাকুক বাঙ্গলার রমণী কবিও সাহস করিয়া গাহিয়া থাকেন—

"সেই দিন ওচরণে ডালি দিনু এজীবন,
হাসি, অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জ্জন
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুখিনী জনমভূমি—মা আমার মা আমার।"
"মরিব তোমারি কাজে বাঁচিব তোমারি তরে
নহিলে বিষাদ ময় এ জীবন কেবা ধরে!
যতদিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্ক ভার
থাক প্রাণ থাক প্রাণ মা আমার মা আমার।"

ইংরাজি শিক্ষিতের সাহিত্য যদিও এখন খুব উন্নত কিন্তু মনস্বী বঙ্কিমের সময় পর্য্যন্তই সেই উন্নতির বেগ গিরিনদীর মত খর প্রবাহিতা ছিল। বর্ত্তমান সময়ে উন্নতির বেগ মন্দীভূত হইয়াছে। হারাণ বাবুর কথায় বলিতে গেলে "সাহিত্যের আবর্জ্জনা"ই তাহার কারণ। "সাহিত্যে ভাণ"ই এই সকল আবর্জ্জনার সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং ভাণ সর্ব্বথা পরিহার্য্য—জীবনে যেমন সাহিত্যেও তেমনি।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

চাহিনা মরিতে।

শুনিয়াছি যমালয়, ভীষণ তামসময়,
চারিদিকে শুধু নাকি অনন্ত আঁধার!
হায় রে জীবন শেষে যেতে হবে সেই দেশে
ছাড়িয়ে অবনী ধাম সুখের সংসার! ১

অই যে প্রভাত রবি, তরুণ অরুণ ছবি
আলো করি দশদিক উঠিল ধরায়,
হাস্যমুখী উষা আসি, জাগাইল মর্ত্তবাসী,
দেখিতে পাবনা আর যাইলে তথায়! ২

নাহি তথা ফুলদল, প্রীতিমাখা পরিমল,
নাহি সেথা বিহগের ললিত কূজন;
নাহিরে গগন তলে, কৌমুদীর হার গলে
রজনীর শশীসনে প্রেম আলিঙ্গন! ৩

পুলকে আকুল করি, দিগন্ত সৌরভে ভরি,
অই যে বসন্ত ঋতু দিল দরশন,
হেরিয়া মোহন হাসি, চারু অঙ্গে রূপরাশী
রতির চরণ তলে লুটাল মদন; ৪

ছুটিল প্রেমের ধারা, নরনারী দিশাহারা
উঠিল আকাশ ভেদি ললিত ঝঙ্কার,
কোথায় এ দৃশ্য রবে, যমপুরে যাব যবে?
যমের আলয়ে নাকি শুধু অন্ধকার। ৫

আহা! একিরে আবার, কি সুন্দর অন্ধকার,
আঁধার গগণ পরে বিজলীর হার!
গম্ভীর মৃদঙ্গধ্বনি, করিছে অসংখ্য মণি,
কিমধুর রবে!—হায়, সুন্দর আঁধার! ৬

বরষার বারিধারা, তমোরাশি মনোহরা,
দেখিতে কি পাব আর ফুরালে জীবন?
নিশার ললিত গান সেথা কি জুড়াবে প্রাণ
যমপুরে অন্ধকার নিস্তব্ধ ভীষণ! ৭

ওই যে অবনীতলে, সোনার প্রদীপ জ্বলে,
নরলোকে নাম যার রমণী রতন!
দশদিক আলো করি, মোহিনী মূরতি ধরি
ধরাতলে সুরনারী ভুলাতে ভুবন! ৮

লুকায়ে হৃদয় তলে, পূর্ণ করি পরিমলে
মানস-সরসী-নীরে প্রেম শতদল,
পাপতাপ পরিহরি, ধরাতলে সুরেশ্বরী
বরষিতে ধরাতলে সুধা নিরমল! ৯

অঙ্কতলে শিশু তার, হায়! হেররে আবার
শশী-ক্রোড় হ'তে বুঝি পড়েছে ধরায়!
মরি কি মধুর হাসি আধকথা সুধারাশি
বরষে অমৃত প্রাণে নয়ন জুড়ায়। ১০

শুনিয়াছি শাস্ত্রে বলে, নরনারী পুণ্যফলে
যেতে পারে একদেশে স্বর্গ নাম তার;
মানিলাম তাই হবে, জীবন ফুরাবে যবে,
মানবের তরে তথা আনন্দ অপার। ১১

কিন্তু সে অদৃশ্য দেশে, শোভে কি মোহন বেশে,
প্রকৃতির চারু ছবি এত মনোহর?
শিশুর অমিয় হাসি, নিরমল সুধারাশি,
আছে কিরে স্বর্গধামে এমন সুন্দর? ১২

হায়রে মরিব যবে, এসব কোথায় রবে—
ওই চারু রঙ্গভূমি পাবনা দেখিতে?
এমন আনন্দ মেলা, এ হেন সুখের লীলা,
সাঙ্গ হবে সব, হায়,—চাহিনা মরিতে। ১৩

চাহিনা বাঁচিতে।

হায় কতদিনে আর, সহিব এ পাপ ভার,—
কে বলিবে বাকি আছে কতদিন আর?
সেদিন আসিবে কবে, পাপ তাপ দূরে রবে
মায়ার পিঞ্জর ভাঙ্গি ত্যজিব সংসার! ১

রোগ জরা শোক তাপ, পাপের উপরে পাপ,
দেখ চেয়ে চারিদিকে কি দৃশ্য ভীষণ!
পলাইব ভাবি মনে, কিন্তু পলাব কেমনে?
ঘেরিয়াছে মরীচিকা পাপ-প্রলোভন! ২

প্রবঞ্চনা প্রতারণা, শুধু স্বার্থ উপাসনা,
সংসারের প্রিয় অতি কণ্ঠ আভরণ!
হৃদয়ে গরল রাশি, মুখে মৃদু মধু হাসি
এই কিরে মানবের সুখের জীবন? ৩

ওই যে মোহন বেশে, পতির নিকটে এসে
ভুলাইছে কত ছলে পতির অন্তর;
সরলা অবলা অতি, ভাবিয়া অবোধ পতি
ঢালিয়া দিতেছে তারে প্রাণের আদর। ৪

মূঢ় নর কি করিলে, কারে প্রাণ বিতরিলে?
নহে ওই কুহকিনী নহেরে তোমার;
ফুলমালা মনে করি, সোহাগে হৃদয়ে ধরি
পরিয়াছ প্রেমাদরে ফণিনীর হার। ৫

সাহিত্যে সমতা হেথা, কেবল সুখের কথা
পরদুঃখে কাতরতা, কৈতব বচন;
হেথায় ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়
কবির কল্পনা শুধু অলীক স্বপন! ৬

হেথা পরের পীড়নে, আর পর-নির্য্যাতনে
মানব-হৃদয় মাঝে আনন্দ অপার,
কলুষিত চারিধার ঘোরতর পাপাচার
হায়! এই ধরাধাম পিশাচ-আগার ৭

শুনরে ভৈরব রবে, আকুল করিয়া সবে
ভীষণ যমের ভেরী বাজিছে আবার
কে জানে কখন ধরে, যমদূত ভীম করে,
উঠিতেছে চারিদিকে ঘোর হাহাকার ৮

ওই দরিদ্রের ঘরে, বারিহীন সরোবরে
কোথা হতে ফুটিল এ কলঙ্কের ফুল?

চাঁদমুখে মধু হাসি, মরি কি সুষমা রাশি
কথা কয় খেলা করে ননির পুতুল! ৯

অকস্মাৎ একি হ'ল? সুধারাশি শুখাইল,
হায়! হায়! ফুরাইল শিশুর জীবন!
ওরে রে নিষ্ঠুর বিধি, এ হেন অমূল্য নিধি
কি দোষে কেনরে হায়, করিলি হরণ? ১০

আর না দেখিতে হবে, জীবন ফুরাবে যবে,
এই ঘোর তমোরাশি এদৃশ্য ভীষণ
শোক তাপ দূরে রবে, পাপলীলা সাঙ্গ হবে
জীবনের যবনিকা পড়িবে যখন। ১১

কিন্তু এ সুখের তৃষা, এত সাধ এত আশা,
ফুরাইয়া যাবে কিরে জীবনের সনে?
ওই যে রে ক্ষীণপ্রভা, প্রাণ মাঝে মৃদু আভা
আঁধারে বিলীন হবে আঁধার জীবনে? ১২

নাহি কিরে দিব্যলোক, পূর্ণ যথা এ আলোক
হায়, যবে লভিব রে নূতন জীবন।
চাহিনা দেখিতে আর অবনীর অন্ধকার
আয় তবে মৃত্যু! তোরে করি আলিঙ্গন! ১৩

সেই জ্যোতি নিরমল, সুধারাশি অবিরল
পাবনা অবনী ধামে জীবন থাকিতে;
আবার প্রভাত হবে, তমোরাশি দূরে রবে,
জ্যোতির্ময় সে প্রভাত!—চাহিনা বাঁচিতে! ১৪

শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।